ভাব–সম্প্রসারণ

১. ইচ্ছা থাকলে উপায় হয়।

মূলভাব: প্রবল ইচ্ছাশক্তিই কোনো কাজকে সমাধানের পথে এগিয়ে নিয়ে যায়। এ পৃথিবী কর্মক্ষেত্র। প্রতিটি সংসারী জীবের কাজ করতে হয়। নিষ্ঠার সঙ্গে কর্মসম্পাদন ব্যতীত জীবনে সফলতা লাভ করা যায় না।

সম্প্রসারিত ভাব: কাজ করার জন্য অনুপ্রেরণা, উৎসাহ ও উদ্যম প্রয়োজন। এগুলোর উৎস হলো মানুষের বলিষ্ঠ ইচ্ছা। যে কাজ যত বেশি কল্যাণকর, সে কাজ সম্পাদনে আমাদেরকে তত বেশি বাধার সম্মুখীন হতে হয়। মহৎ কোনো কিছুই পৃথিবীতে সহজলভ্য নয়। কিন্তু ঐকান্তিক ইচ্ছাশক্তির প্রভাবে মানুষ নতুন উপায় উদ্ভাবনে সফলকাম হয়। তখন সমস্যা যতই কঠিন হোক না কেন সহজেই তার সমাধান খুঁজে বের করা যায়। কোনো কর্মসম্পাদনের জন্য আমরা যদি মনের দিক থেকে সম্পূর্ণরূপে প্রস্তুত হতে না পারি, তাহলে সফলকাম হওয়া যায় না। সব সমাজে ছোটো–বড়ো অসংখ্য দৃষ্টান্তের মধ্য দিয়ে এর যথার্থতা উপলব্ধি করা যায়। যেসব ব্যক্তি জীবনে দুঃখকে ভয় করে, কষ্টকে এড়াতে চায়, পরিশ্রম করতে কুণ্ঠিত হয়, সুখ ও আনন্দ থেকে তারা চিরকাল বঞ্চিত থাকে।

মন্তব্য: মানুষের সকল কাজের মূল হচ্ছে ইচ্ছাশক্তি। আজকের পৃথিবীর সকল সুন্দর সৃষ্টিই মানুষের ইচ্ছাশক্তির ফল।

২. ইটের পর ইট মাঝে মানুষ কীট।

মূলভাব : নগরসভ্যতা মানুষের জীবনকে যান্ত্রিক ও দুর্বিষহ করে তুলেছে। মানুষ তার স্বাভাবিক প্রবৃত্তি হারিয়ে ক্রমান্বয়ে ক্ষুদ্র কীটে পরিণত হয়েছে।

সম্প্রসারিত ভাব: নদী–নালা, খাল–বিল, পাহাড়–অরণ্য প্রকৃতির স্বতঃস্ফূর্ত দান। কিন্তু মানুষ সবসময়ই আধিপত্যবাদী। সে প্রকৃতির ওপর ক্ষমতা প্রয়োগ করে ইটের পরে ইট গেঁথে একটার পর একটা দালান তৈরি করে নগর সৃষ্টি করেছে। ফলে ব্যাহত হচ্ছে প্রকৃতির প্রত্যাশিত বিকাশ। হারিয়ে যাচ্ছে ছায়া–সুনিবিড় শান্তির নীড়, সুমিষ্ট বায়ুপ্রবাহ, নদীর কলকলধ্বনি। সেই মমতাময় ও স্বাস্থ্যকর পরিস্থিতিকে দখল করে নিয়েছে এখন বড়ো বড়ো অট্টালিকা, বায়ু ও শব্দদূষণ, তীব্র যানজট ও কোলাহল। মানুষ এখানে স্বাভাবিকভাবে শ্বাসগ্রহণ করতে পারে না। শহরে গ্রামের সেই মিলনোন্মুখ সৌহার্দপূর্ণ পরিবেশ নেই, তার বিপরীতে আছে পরস্পরের মধ্যে তীব্র প্রতিযোগিতা ও স্বার্থের দ্বন্দ্ব। এখানে কেউ কারও সুখ–দুঃখের অংশীদার হয় না। প্রত্যেকেই এখানে বিচ্ছিন্ন দ্বীপের মতো বসবাস করে। ফলে আরণ্যক ভূমিকে ধ্বংস করে মানুষ যতই যন্ত্রসভ্যতার বড়াই করুক না কেন, প্রকৃতপক্ষে মানুষ নগরসভ্যতার জাঁতাকলে পড়ে ভেতরে–বাইরে নিঃস্ব হয়ে কীটে পরিণত হচ্ছে। জীবনের স্বাভাবিক স্ফূর্তি বিনষ্ট হয়ে যাচ্ছে। তাই জ্ঞান–বিজ্ঞানের শিখরে উঠেও মানুষ আজ ক্লান্ত, অবসন্ন। প্রকৃতি ধ্বংস করার কারণে মানুষ এখন প্রতিমুহূর্তে প্রাকৃতিক দুর্যোগের ভয়ে শঙ্কিত থাকে। সে আজ মুক্ত পরিবেশের জন্য ব্যতিব্যস্ত। সে একটু নির্মল বাতাস সেবন করতে চায়, বুকভরে নিশ্বাস নিতে চায়, প্রাণ খুলে কথা বলতে চায়, সহমর্মী হতে চায় একে অন্যের। তাই আবার সে ফিরে পেতে চায় সেই প্রসন্ন, সুন্দর, স্নিগ্ধ গ্রাম।

মন্তব্য : নগর মানুষের ব্যাবহারিক জীবনকে কিছুটা সহজ করলেও তার স্বাচ্ছন্দ্যকে নষ্ট করে দিয়েছে। নগর মানুষের জীবনের স্বাভাবিক বিকাশের অন্তরায়।

৩. তরুলতা সহজেই তরুলতা, পশুপাখি সহজেই পশুপাখি
কিন্তু মানুষ প্রাণপণ চেষ্টায় তবে মানুষ। *[য. বো. '০৫]*

মূলভাব: মনুষ্যগৃহে জন্মগ্রহণ করলেই মনুষ্যত্বের অধিকারী হওয়া যায় না। প্রকৃত মানুষ হতে হলে প্রচুর ত্যাগ–তিতিক্ষা, দৃঢ় মনোবল, ঐকান্তিক নিষ্ঠা, অক্লান্ত পরিশ্রম এবং মানবিক গুণাবলি অর্জন করা একান্তভাবে আবশ্যক। মানবজীবন তরুলতা ও পশুপাখির জীবনের মতো নয়। তাই মনুষ্যত্বের পরিচর্যার মধ্য দিয়েই মানুষ প্রকৃত অর্থে মানুষ হিসেবে মর্যাদা লাভ করে।

সম্প্রসারিত ভাব : মনুষ্য জীবন হলো শ্রেষ্ঠ জীবন। তাই সৃষ্টির সেরা জীব হিসেবে মানুষ পরিচিত। কিন্তু মানুষের এ শ্রেষ্ঠত্ব জন্মমাত্রই অর্জিত হয় না। জন্মের সময় মানবশিশুর সঙ্গে ইতরপ্রাণীর কোনো পার্থক্য থাকে না। জীবনের বেড়ে ওঠার প্রক্রিয়ায় সামাজিকীকরণ ও মনুষ্যত্ব অর্জনের মাধ্যমে মানুষ যথার্থরূপে মানুষ হয়ে ওঠে। তরুলতা ও পশুপাখির বিবেক ও বুদ্ধি নেই।

এজন্য তাদের বিবেচনা ও বুদ্ধির বিকাশও নেই। কিন্তু মানুষের বিবেক ও বুদ্ধি উভয়ই বিদ্যমান। ফলে জ্ঞান আহরণ, সংস্কৃতিচর্চা ইত্যাদির মাধ্যমে মানুষ নিজের বিবেক ও বুদ্ধিকে বিকশিত করে তুলতে পারে। যা অন্য কোনো প্রাণী বা বৃক্ষলতার পক্ষে সম্ভব নয়। জন্মের পরে তাদের শুধু দৈহিক বৃদ্ধি হয়, কিন্তু মনের বিকাশ সাধিত হয় না। পক্ষান্তরে, মানুষ জন্ম–পরবর্তী সময়ে শিক্ষা ও অভিজ্ঞতা অর্জন করে মানবিক গুণসম্পন্ন হয়ে ওঠে। এ মানবিক গুণই মানুষকে তরুলতা ও পশুপাখি থেকে স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত করে। আবার, জীবনের প্রয়োজনে মানুষকে একে একে অনেক কিছু আবিষ্কার করতে হয়, যা তরুলতা বা পশুপাখির বেলায় কল্পনাও করা যায় না। তাই জন্মোত্তর স্থবির তরুলতা ও বুদ্ধিহীন পশুপাখি স্বতঃসিদ্ধভাবে তরুলতা ও পশুপাখি হিসেবে পরিচিতি লাভ করে। কিন্তু মানুষের ক্ষেত্রে তা ঘটে না। মানুষকে মানুষ হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করতে হলে মনুষ্যত্ব অর্জন করতে হয়, যা পশুপাখির জীবনে অর্জন করা খুবই কঠিন। প্রাণপণ প্রচেষ্টা ও নিরবচ্ছিন সাধনার মধ্য দিয়ে মানুষকে মনুষ্যত্ব অর্জন করতে হয়। তাছাড়া তরুলতা প্রাকৃতিক নিয়মে জন্ম নেয়, বেড়ে ওঠে এবং একসময় নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। আবার, পশুপাখি– আহার, নিদ্রা ও মৈথুন এই ত্রিপ্রবৃত্তির মধ্যেই তাদের জন্ম থেকে মৃত্যু অবধি সীমাবদ্ধ জীবন অতিবাহিত করে। কিন্তু মানুষকে আরও অনেক কিছু ভাবতে হয়, করতে হয়। তার মধ্যে সবচেয়ে বড়ো কর্ম হলো মানুষকে ধর্ম পালন করতে হয়, স্রষ্টার সান্নিধ্যলাভে এবং মানবাত্মার উন্নতি–কল্পে মানুষকে স্রষ্টার আরাধনা করতে হয়। এছাড়া সামাজিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক তথা বিশ্ব–মানবতার কল্যাণে সাধ্যমতো শুভকর্মে নিয়োজিত হয়ে জন্ম সার্থক করে মানুষ। বর্তমানে আমরা যে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির উৎকর্ষে আধুনিক বিশ্ব প্রত্যক্ষ করছি, এর রূপকার কেবলই মানুষ। এখানে তরুলতা কিংবা পশুপাখির কোনো অবদান নেই। তবে মানুষ তার বুদ্ধি প্রয়োগ করে সুকৌশলে মানবসভ্যতা বিনির্মাণে তরুলতা ও পশুপাখিকে কাজে লাগিয়েছে, যার কৃতিত্বও মানুষেরই প্রাপ্য। মোটকথা, বেঁচে থাকার সংগ্রামের পাশাপাশি মানুষকে নিরন্তর সুন্দরের সাধনায় ব্রতী থেকে জীবনকে সার্থক করে তুলতে হয়।

মন্তব্য : মানুষের বিচার–বুদ্ধির ক্ষমতা, মহানুভবতা, ন্যায়পরায়ণতা ইত্যাদি মহৎ গুণাবলি রয়েছে, কিন্তু তরুলতা বা পশুপাখির তা নেই। মন নামক অমূল্য সম্পদের প্রভাবে পৃথিবীতে মানুষ 'মানুষ' নামে পরিচিত। প্রকৃতপক্ষে, মানুষকে মানুষ হিসেবে পৃথিবীতে আত্মপরিচয়ের মর্যাদা দিয়েছে মন বা বিবেকই।

৪. জ্ঞান যেখানে সীমাবদ্ধ, বুদ্ধি সেখানে আড়ষ্ট, মুক্তি সেখানে অসম্ভব *[রা. বো. '১৯]*

ভাব–সম্প্রসারণ : জ্ঞান ও বুদ্ধির সম্পর্ক অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। এই জগতে মানুষ শ্রেষ্ঠ তার জ্ঞান–বুদ্ধিতে। জ্ঞান–বুদ্ধির বলেই মানুষ আজ সভ্যতার চরম উন্নতির শিখরে আরোহণ করতে পেরেছে। সর্বার্থে জ্ঞান–বুদ্ধি ছাড়া মানবমুক্তির আর কোনো পথ নেই।

মানুষের লক্ষ্য দেহমনে সুস্থ, সজীব, প্রফুল্ল, শান্তি ও কল্যাণময় উন্নত জীবন। জীবনের এই লক্ষ্য অর্জনে জ্ঞান চর্চার কোনো বিকল্প নেই। জ্ঞান মানুষকে আলোকিত করে, সচেতন করে তোলে। জ্ঞান ও বুদ্ধি একটি অপরটির অবিচ্ছেদ্য অংশ। জ্ঞানের বিকাশ ঘটলেই বুদ্ধির বিকাশ ঘটে। বুদ্ধির বলেই মানুষ ব্যক্তি–পরিবার–সমাজ–রাষ্ট্রের ভালো–মন্দ, ন্যায়–অন্যায়, উন্নতি–অবনতির বিচার করে সুস্থ–সুন্দর জীবন নির্মাণ করতে পারে। কুসংস্কার থেকে মুক্তির অন্যতম উপায় হলো বুদ্ধির মুক্তি। যুক্তি–বুদ্ধিতেই সমাজে প্রগতির পথ প্রশস্ত হয়। মানুষের স্বপ্ন–আশা–কল্পনাসহ বহুতর সমাজকর্মকাণ্ডে জ্ঞান–বুদ্ধিরই জয়জয়কার। বুদ্ধিবৃত্তির প্রসারেই সমাজের উন্নয়ন ঘটে। আজকের বিশ্বে যেসব দেশ উন্নত, তারা জ্ঞান–বুদ্ধিতে ও বিজ্ঞান–প্রযুক্তিতে উন্নত। ক্রমাগত জ্ঞানচর্চার মাধ্যমেই তারা সমৃদ্ধ–উন্নত ও সভ্যজাতি হিসেবে বিশ্বের দরবারে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়েছে।

জগতের সব মহামানব, মনীষী, বিজ্ঞানী, প্রযুক্তিবিদ, বীরযোদ্ধা, চিন্তাবিদ, অর্থনীতিবিদ, রাজনীতিক, ব্যাবসায়িক, শিল্পী–সাহিত্যিক, কবি–লেখক, বুদ্ধিজীবী, সাংবাদিক— তাঁরা জ্ঞান–বুদ্ধিতে প্রসারিত বলেই মানুষের মুক্তির পথ দেখাতে পেরেছেন। জ্ঞান–বুদ্ধির বলেই মানুষ বদলে দিয়েছেন ব্যক্তি–পরিবার–সমাজ–রাষ্ট্রসহ গোটা বিশ্বকে। একনিষ্ঠ কর্মসাধনায় জ্ঞানচর্চায় বা বুদ্ধিবৃত্তির চর্চায় প্রকৃষ্ট জ্ঞানীরাই পৃথিবীতে মানবকল্যাণের সমস্ত পথ বাতলে দিয়েছেন। কর্ম–ধর্ম, শিক্ষা–শাস্ত্র যা–ই বলি না কেন– এসব জ্ঞান–বুদ্ধিরই চর্চা। তাই জ্ঞান সীমিত বা সীমাবদ্ধ হলে বুদ্ধি তখন আড়ষ্ট অসাড়, সংকুচিত হয়ে যায়; ফলে মানব মুক্তির পথও অসম্ভব হয়ে পড়ে। কেননা, জ্ঞান চর্চার সঙ্গে সঙ্গে মানুষের বুদ্ধির বিকাশ ঘটতে শুরু করে। কেবল জ্ঞানই মানুষের সব ধরনের কল্যাণ ও মঙ্গল সাধন করতে পারে। জ্ঞান ছাড়া বিবেক–বুদ্ধি ও চিন্তার বিকাশ না ঘটলে মানুষ সংকীর্ণ কুসংস্কারে আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে। জ্ঞান মানুষকে বুদ্ধির গভীরে প্রবেশের পথ খুলে দেয় এবং মানুষ তখন সহজেই তার মুক্তির পথ খুঁজে নিতে

SINCE-1993
NABARUN PUBLICATION

পারে। বলা হয়, জ্ঞানহীন মানুষ পশুর সমান। পশু ও অন্যান্য প্রাণীর মধ্যে বুদ্ধিবৃত্তিক সৃজনশীল চেতনা নেই কিন্তু মানুষ সৃজনশীল চেতনায় বিশ্বমানবসংস্কৃতি প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়েছে। আজকের জগৎ জ্ঞাননির্ভর। সাংস্কৃতির অগ্রগতি, সভ্যতার বিকাশ, গুণগত শিক্ষা, জীবনমান উন্নয়নসহ সবকিছুই জ্ঞান ব্যতীত অসম্ভব। জ্ঞান-বুদ্ধির চর্চা ছাড়া কোনো জাতির উন্নয়ন কল্পনা করা যায় না। যে জাতি যত বেশি শিক্ষিত সে জাতি তত বেশি উন্নত। জ্ঞানের আলোয় আমাদের সকল সংকীর্ণতা দূরীভূত হয়। জাতীয় জীবনে জ্ঞানচর্চার উপযুক্ত পরিবেশ না থাকলে মানুষের বুদ্ধিবৃত্তির বিকাশ ঘটানোর সুযোগ সীমিত হয়ে পড়ে। তখন অনেক মেধার অপচয়-অবচয় ঘটে। কোনো জাতি যখন মেধার অপচয় রোধ করে জ্ঞান ও মেধার সঠিক ব্যবহার নিশ্চিত করতে পারে, তখন সে জাতির মুক্তি ও উন্নতি নিশ্চিত হয়।

ভাষা-সাহিত্য-সংস্কৃতি, শিল্পকলা, বিজ্ঞান প্রযুক্তি, রাজনীতি, অর্থনীতি, মানবিক সমাজ বিনির্মাণে জ্ঞান-বুদ্ধি চর্চার গুরুত্ব অপরিসীম। জ্ঞান-বুদ্ধি চর্চার মধ্য দিয়েই আমরা আপন করে নিতে পারি গোটা বিশ্বকে, বিশ্বের মানুষকে। জাতীয় মুক্তি ও অগগতির পূর্বশর্ত জনগণের বুদ্ধিবৃত্তিকে বিকাশ করা। এর জন্য চাই জ্ঞানের চর্চা ও গুণীর কদর। এটা যত ব্যাপক হবে জাতীয় মুক্তি ও অগ্রগতি উন্নতির পথ ততই ত্বরান্বিত হবে, ততই প্রসারিত ও প্রশস্ত হবে। নিশ্চিত হবে মানুষের কল্যাণ-শান্তির পথ- চির মুক্তির পথ।

৫. উত্তম নিশ্চিন্তে চলে অধমের সাথে
তিনিই মধ্যম যিনি চলেন তফাতে। *[চ. বো. '০২]*

মূলভাব : উত্তম বা মহৎ ব্যক্তি অনায়াসে সকল মানুষের সঙ্গে নিশ্চিন্তে মিশতে পারেন। কিন্তু যিনি মধ্যম তিনি আত্মরক্ষার্থে উভয়ের বা সকলের থেকেই দূরত্ব বজায় রেখে চলেন। উত্তম আর অধমের জীবনপথে কোনো সংকট নেই।

সম্প্রসারিত ভাব : যে মধ্যম তার সমস্যার জটিলতা আছে, তার সংকট অনেক বেশি। নিজের মর্যাদা রক্ষার জন্য তাকে সচেতনভাবে পদক্ষেপ নিতে হয়। তাই সে সকলের সাথে মিশতে পারে না। তাঁর অবস্থান স্বতন্ত্র অস্পষ্ট। মনুষ্যপ্রকৃতি বিচিত্র ও খুবই জটিল। মানবতার আদর্শে প্রত্যেক মানুষই সমান। সেখানে উত্তম-মধ্যম-অধমের কোনো ভেদাভেদ বা তারতম্য নেই। তবুও কুলশীলজাতি অভিমান ও নানা প্রকার সামাজিক গুণগত সংকীর্ণতা মানুষে মানুষে দুস্তর ব্যবধান সৃষ্টি করেছে। যাহোক, সামাজিক দিক থেকে উত্তম, মধ্যম ও অধম- এই তিন শ্রেণির মানুষ শ্রেণিবিভক্ত। যারা উত্তম মানুষ তাদের কাছে মানবতাই জীবনের চরম সত্য। বাইরে জাতি-বর্ণ, ধর্মসম্প্রদায়ের ভিত্তিতে যত পার্থক্য থাক না কেন, উত্তম শ্রেণির মানুষের সকলকেই এক পরম মানবসন্তান হিসেবে দেখেন। তাঁদের অন্তরে ছোটো-বড়ো, অধম-মধ্যম কোনো প্রকারভেদ ও সংকীর্ণতা স্থান পায় না। মানবজীবন সম্পর্কে এক উত্তম জীবনাদর্শের দ্বারা তারা পরিচালিত হন বলে উত্তম শ্রেণির মানুষ হিসেবে তাঁরা গণ্য। তাদের কাছে জাতি, ধর্ম, বর্ণ, পণ্ডিত, মূর্খ, ধনী, নির্ধনের কোনো ভেদাভেদ নেই। তাঁরা দেখেন পৃথিবীর উত্তরমের থেকে দক্ষিণমেরু পর্যন্ত অজস্র বৈচিত্র্যের মধ্যে এক মানুষই বসবাস করছে। তাই উত্তম শ্রেণির মানুষেরা সকল মানুষের সঙ্গে সহজভাবে মেলামেশা করেন। তথাকথিত যারা অশিক্ষিত, অনুন্নত ও অনভিজাত, অবজ্ঞাত শ্রেণির মানুষ- তাদের সঙ্গেও তারা সহজভাবে মেলামেশা করেন, সকলের সঙ্গে তাঁরা ঘোরাফেরা করেন। সকলের সঙ্গেই তাঁদের হৃদয়ের নিবিড় ও মধুর সম্পর্ক নিশ্চিন্তে স্থাপিত হয়। কিন্তু মধ্যম শ্রেণির মানুষের অধম বা নিম্নশ্রেণির মানুষদের থেকে সামাজিকতায় একটু উন্নত বলে তাদের অন্তরে নানা প্রকার সংকীর্ণতা স্থান পায়। উত্তম ব্যক্তিদের সাথে তাঁরা নিশ্চিন্তে ঘোরাফেরা করেন। কিন্তু অধমের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপনে তাদের বাধোবাধো ঠেকে। তাঁরা ভাবেন অধমের সঙ্গে চলাফেরা করলে বা তাদের সংস্পর্শে এলে নিজেরা অধম হয়ে যাবেন- জনসাধারণ তাদের অধম বলে গণ্য করবে। মধ্যম শ্রেণির ব্যক্তিদের হৃদয়ে মানবতার আদর্শ সম্পূর্ণভাবে স্থান পায় না বলে তাদের চরিত্র সম্পূর্ণ ত্রুটিমুক্ত নয়। কিন্তু উত্তম শ্রেণির মানুষের অন্তরে কোনো প্রকার দীনতা বা সংকীর্ণতার স্থান নেই। সর্বপ্রকার ক্ষুদ্রতার উর্ধ্বে তাঁদের হৃদয় সর্বদা পাখা মেলে থাকে। এর ফলে উত্তম ব্যক্তিদের সংস্পর্শে আলোকিত হয়ে ওঠে অধমের জীবন। উত্তম ব্যক্তিরা মানবতার ধারক ও বাহক বলে মানবতার বিকাশ ও সমৃদ্ধির পথ প্রশস্ত হয়। উত্তম ব্যক্তি যেন পরশমণি।

মন্তব্য : যারা মধ্যম তাদের মন শুচিবায়ুগ্রস্ত হয়ে পড়ে, বিচারবোধ সংকীর্ণ হয়ে যায়। জীবনের সর্বক্ষেত্রে এরা আলাদা হয়ে চলেন। উত্তমের সাথে মিলিত হওয়ার মতো মানসিক শক্তি এদের নেই, অপরপক্ষে অধমের সান্নিধ্যও তাঁদের নিকট ভীতিকর।

এই অতি–সতর্কতার জন্য চিরকাল তারা মাঝারি হয়ে থাকেন, জীবনের কোনো ক্ষেত্রেই তারা পরিপূর্ণ প্রতিষ্ঠা লাভ করতে পারে না।

৬. একতাই বল

মূলভাব : ঐক্যের শক্তিতেই মানুষ জয় করেছে পৃথিবীকে। সমাজজীবনের সাফল্যের অন্যতম সূত্র এই একতা শক্তি।

সম্প্রসারিত ভাব : মানুষ সামাজিক জীব। আর সমাজের প্রত্যেকে একে অপরের ওপর নির্ভরশীল। পারস্পরিক এ নির্ভরশীলতা থেকে গড়ে উঠেছে মানবসমাজ– সমাজের মধ্যে একতাবোধ। মানবজীবনের অস্তিত্বের সঙ্গে তাই একতার সম্পর্ক অত্যন্ত নিবিড়। মানুষকে সবসময় প্রতিকূল পরিবেশের মধ্য দিয়ে জীবনযাপন করতে হয়। প্রতিকূল পরিবেশে শত্রুর মোকাবিলা করার জন্য প্রয়োজন সংঘবন্ধ শক্তির। একতাবন্ধ হওয়ার মধ্য দিয়ে পাওয়া যায় নিরাপত্তার নিশ্চয়তা। ঐক্যবন্ধ জাতিকে কোনো শক্তিই পদানত করতে পারে না। একতার কল্যাণ প্রতিফলিত হয় ব্যক্তি ও জাতীয় জীবনে। একতার গুণে মানুষ অসাধ্যকেও সাধন করতে পারে। এভাবে জাতি একতার গুণে বড়ো হয়। আজকের বিশ্বে উন্নত ও সমৃদ্ধ জাতিগুলো নিজেদের মধ্যে সব ভেদাভেদ ভুলে জাতীয় ঐক্যে উদ্বুদ্ধ হয়েছে। তাই আজ তারা এত উন্নত। যে জাতি ঐক্যবন্ধ নয়, সে জাতির ধ্বংস অনিবার্য। বন্ধুবান্ধবহীন নিঃসঙ্গ জীবন কাটানো যেমন সম্ভব নয়, তেমনি একতাহীন জাতির উন্নতি অসম্ভব। ব্যক্তিজীবন, জাতীয় জীবন ও মানবজাতির কল্যাণের জন্য মানুষের ঐক্যবন্ধ থাকা একান্ত দরকার।

একা মানুষ সামাজিকভাবে তুচ্ছ। কিন্তু একতার শক্তিতে মানুষ অসম্ভবকে সম্ভব করতে পারে।

মন্তব্য : সমাজজীবনের সব ক্ষেত্রে এই শক্তির গুরুত্ব অনুধাবন করা প্রয়োজন।

৭. সুসময়ে অনেকে বন্ধু বটে হয়
অসময়ে হায় হায় কেহ কারো নয়। *[চ. বো. '০৩]*

মূলভাব : ভালো সময়ে কোনো ব্যক্তির পাশে তার আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধব সবাই থাকে। কিন্তু যখন ওই ব্যক্তিরই দুঃসময় আসে তখন পাশে দাঁড়নোর কেউ থাকে না। খারাপ সময় যে পাশে থাকে সে–ই প্রকৃত বন্ধু হয়।

সম্প্রসারিত ভাব: আর্থিক ও সামাজিক অবস্থা ভালো থাকলে তখন অনেক বন্ধুবান্ধব জোটে। আর যখন ওই ঐশ্বর্য হারিয়ে দুঃসময় আসে তখন স্বার্থান্বেষী বন্ধুরা ছেড়ে চলে যায়। আমাদের চারিদিকে প্রতারক ও স্বার্থপর লোকের অভাব নেই। এরা মাছির মতো ভিড় জমায়। আবার চলে যায়। মাছি যেমন দুধের ওপরে বসে দুধের মূল অংশ চুষে নেওয়ার পর উড়ে যায়, একইভাবে স্বার্থান্বেষী লোকেরাও বন্ধুর ধনসম্পদ থাকাকালে বন্ধুকে তোষামোদ করতে থাকে আর স্বার্থোদ্ধার করে। আবার, যখন ওই বন্ধুর ধনসম্পদে ভাটা পড়ে তখন তাকে ছেড়ে পাড়ি জমায় আরেক সম্পদশালী বন্ধুর খোঁজে। এই যে সুসময়ের বন্ধু নামক অমানুষ, প্রতারকের দল– এরা সমাজের কীট। এদের দ্বারা মানুষ চরমভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এরা দ্বিমুখী সাপের মতো; যেকোনো মুহূর্তে এরা বিষধর সাপের মতো ছোবল মেরে পালিয়ে যায়। ভুলে যায়, এদের প্রতি ওই লোকের সকল অবদান। সমাজে প্রকৃত মানুষ এবং বন্ধু হিসেবে তাদের আখ্যা দেওয়া যায়, যারা তার বন্ধুকে বিপদে রেখে ছুটে পালায় না। স্বার্থের পেছনে না ঘুরে বন্ধুত্বের মূল্য প্রদানই যাঁদের কাজ। তারা তাদের বিপদাপন্ন বন্ধুকে বিপদ থেকে উদ্ধারের জন্য নানা ধরনের চেষ্টা চালায়। বন্ধুকে আর্থিক ও মানসিক দিক থেকে নানাভাবে সাহায্য করে থাকে। বন্ধুর দুঃখদুর্দশা ও বেদনাকে আপন করে নিতে চায়। বন্ধুর মনোবল যেন ভেঙে না যায়, সেদিকেও লক্ষ রাখে। উৎসাহ প্রদানের মাধ্যমে বন্ধুকে পূর্বের অবস্থায় ফিরিয়ে নিতে চেষ্টা করে।

মন্তব্য: প্রকৃত বন্ধুদের গ্রহণ করে, স্বার্থান্বেষী বন্ধুদের পরিত্যাগ করতে হবে। বন্ধু নির্বাচন করতে একটু সজাগ দৃষ্টি দিতে হবে। স্বার্থান্বেষী কেউ যেন বন্ধুর ছদ্মবেশে এসে ক্ষতি করতে না পারে, সে ব্যাপারে সচেতন থাকতে হবে।

৮. এ জগতে হায় সেই ....সমস্ত কাঙালের ধন চুরি।

[চ. বো. '০৫; ব. বো. '০৭; দি. বো. '১১]

অথবা, তেলে মাথায় তেল দেওয়া মনুষ্য জাতির রোগ।

অথবা, চোর দোষী বটে, কৃপণ–ধনী তদপেক্ষা শতগুণ দোষী।

অথবা, চেরাপুঞ্জির থেকে

একখানি মেঘ ধার দিতে পার গোবি–সাহারার বুকে?

মূলভাব : বিশ্বজগতে অসংগতি ও অসামঞ্জস্যের সীমা নেই। প্রকৃতির রাজ্যে তার অজস্র স্বাক্ষর প্রত্যহ প্রতীয়মান। প্রকৃতির অকৃপণ প্রাচুর্যের অজস্র উদারতার পাশাপাশি দেখতে পাই সীমাহীন কার্পণ্যের নিষ্করুণ অকিঞ্চনতা।

সম্প্রসারিত ভাব : দেখা যায় কোথাও সবুজ–শ্যামলের সমারোহ; আবার কোথাওবা ধূসর মরুভূমির কঠিন শুষ্কতা। কোথাও ভারি–বর্ষণের প্রাচুর্য, আবার কোথাও শুষ্ক মরুর তৃষ্ণা। ধনিকের দুর্নিবার সম্পদক্ষুধা কোনোদিনই পরিতৃপ্ত হয় না। তার পেছনে ক্রমাগত থাকে শোষণের নগ্ন ইতিহাস। বিত্তবানের এই অতিরিক্ত বিত্ত সংগ্রহের প্রবণতার কারণে সমাজে দেখা দেয় চৌর্যবৃত্তি। স্ফীতকায় হয়ে ওঠে নানা অশান্তি, সংঘাত এবং সংগ্রাম। চেরাপুঞ্জির অনবরত বর্ষণমুখরতাকে গোবি–সাহারার শুষ্ক কঠিন মরুভূমিতে আনার বোধ করি কোনো উপায় নেই। তাই বলে কি মানুষ মুখ বুজে বসে থাকবে? মানুষও আজ সমানভাবে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অবতীর্ণ হতে চায়; অসম্ভবকে সম্ভব করতে চায়। বিজ্ঞানের শক্তি দ্বারা প্রকৃতির নিয়ম কিংবা অসংখ্য বিধানকে আজ মানুষ পরিবর্তন করতে চায়। হয়তো সবটুকু তার পক্ষে সম্ভব নয়; তবে প্রত্যাশা করবে না কেন? চেরাপুঞ্জির মানুষ অনবরত বৃষ্টির জ্বালায় অস্থির; আবার গোবি–সাহারার বুকে এক বিন্দু বৃষ্টির জল পাওয়া যায় না। প্রকৃতির এই অমোঘ বিধানকে পরিবর্তন করার শক্তি মানুষের নেই। পৃথিবীতে যারা অপর্যাপ্ত সম্পদের মালিক, যাদের ধনৈশ্বর্য অফুরন্ত; তাদের সম্পদ–তৃষ্ণা কোনোদিনই পরিতৃপ্ত হয় না। তারা যত পায়, তত চায় এবং বেশিরভাগ মানুষও বিত্তহীনদের কিছু দান না করে সাধ্যাতীত দান করে থাকে বিত্তবানদের। তারা সামাজিক সম্পদ বৈষম্যকে হ্রাস না করে ক্রমাগত বৃদ্ধি করে চলে। সামাজিক সকল অশান্তির মূলে আছে এই অবাঞ্ছিত ও অস্বাভাবিক সম্পদ–বৈষম্য। অন্যদিকে বিবেকহীন, হৃদয়হীন মানুষেরা নানাভাবে সামাজিক সম্পদ অপহরণ করে দিনের পর দিন নিজেদের মোটা পেট আরও মোটা করে। তাদের সেই নির্বিচার সম্পদ–সংগ্রহের ফলে হাত পড়ে গরিবের কানাকড়িতে। পৃথিবীর দুঃখী মানুষেরা তাদের যৎসামান্য পুঁজিপাটা নিয়ে অসহ্য দুঃখ–ক্লেশের মধ্যে জীবনযাপন করে। 'শুধু দুটি অন্নখুঁটি কোনোমতে কষ্ট–ক্লিষ্টে প্রাণ' রাখে বাঁচিয়ে। কিন্তু ধনিকের অপরিসীম ধনতৃষ্ণা ক্রমাগত স্ফীতকায় হতে হতে একদিন দরিদ্র্যের সর্বশেষ সম্বল তাদের সামান্য কানাকড়িকে ছিনিয়ে নিয়ে নিজেদের সম্পদ–তৃষ্ণার আগুনে দেয় আহুতি। এইভাবে পৃথিবীর দরিদ্রেরা তাদের সবকিছু হারিয়ে ভিটেমাটি ছেড়ে সাজে পথের ভিক্ষুক অথবা পরস্বপ্রহারী দস্যু। কেউ তাদের হিসাব রাখে না, কেউ তাদের খবর রাখে না। আজ পৃথিবীতে এসেছে নতুন চেতনা, নতুন চিন্তা। বিশ্বের সর্বহারাদের অপহৃত সম্পদ আজ কড়ায়–ক্রান্তিতে ফিরিয়ে দিতে হবে তাদের। পৃথিবীতে তাদের মানুষের মতো বাঁচার অধিকার দিতে হবে। আজ তারা নিজেদের অধিকার সম্বন্ধে সচেতন হয়ে তার পুনরুদ্ধারকল্পে একত্রে সংঘবদ্ধ হয়েছে। ধনতন্ত্রের সঙ্গে তার আজ সংঘাত অনিবার্য। একদিকে বিলাসের ব্যসন, অন্যদিকে নিঃস্বের রোদন; একদিকে সহস্র দীপের রোশনাই, অন্যদিকে অন্ধকারে তৈলহীন মাটির প্রদীপ, একদিকে বিত্তবানের উল্লাস, অন্যদিকে সর্বহারার দীর্ঘশ্বাস– এসবের মধ্যে সামঞ্জস্য আনতেই হবে। সাম্য প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে পৃথিবীর নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হবে– মানবকল্যাণের মন্ত্র উদ্‌গীত হবে। সামাজিক নিরাপত্তার প্রয়োজনে ধনিকের উচিত অতিরিক্ত ধন–সংগ্রহ ও ধন–সঞ্চয় থেকে বিরত হওয়া।

মন্তব্য: বিশ্বের সকল শান্তিকামী মানুষের সাধনাই হলো আজ শোষণ এবং সামাজিক অবিচার দূর করে সামাজিক সম্পদের ন্যায়সংগত সমবণ্টনের মধ্যস্থতায় পৃথিবীতে শান্তির এক সুস্থ পরিমণ্ডল সৃষ্টি করা।

৯. কত বড়ো আমি, কহে নকল হীরাটি

তাইতো সন্দেহ করি, নহ ঠিক খাঁটি।

মূলভাব: সমাজে যার কোনো দান নেই সে–ই বরং নিজেকে জাহির করতে চায় গলাবাজি করে। কিন্তু মানুষই সচেতন মানুষ তা সহজেই বুঝতে পারে এবং মুখ টিপে হাসে।

সম্প্রসারিত ভাব: মানুষ সমাজবদ্ধভাবে বাস করে। ভালো–খারাপ দুই প্রকার মানুষই সমাজে বাস করে। সমাজ বা মানুষের কল্যাণ কামনা করা ভালো মানুষের লক্ষণ। সে সবসময় চিন্তা করে মানুষের শুভকামনা। অথচ সে তা প্রকাশ করতে চায় না। তার প্রশংসা মানুষের মুখে প্রকাশ পায়। আর খারাপ লোক সবসময় মানুষের মন্দ, সমাজের মন্দ করার চিন্তাভাবনা করে। আর প্রকাশ করতে থাকে আমি মানবসমাজের ভালো করছি। এটা আসলে ঘৃণার যোগ্য। সমাজের মাঝে যে ভালো কাজ করে তার প্রকাশ

মানুষের মুখে মুখে। খারাপ লোক নিজেকে প্রকাশ করতে উন্মুখ হয়ে থাকে। কীভাবে নিজের কৃতিত্ব প্রকাশ করতে পারবে তার জন্য চেষ্টা করতে থাকে। যেমন– নকল হীরা নিজেকে খাঁটি বলে বেড়ায়। আর এর জন্য খাঁটি হীরা নিজেকে খাঁটি বলতে কুণ্ঠাবোধ করে। কারণ নকলের অস্তিত্ব আছে। খারাপ আছে বলে ভালোর দাম আছে। মন্দ না থাকলে আমরা ভালোর মর্ম বুঝতে পারতাম না। মন্দের বা খারাপের মিথ্যা বড়াই করাটাই ভালোর দাম। সত্যিকার ভালো কখনো নিজেকে নিয়ে বড়াই করে না। মানুষ তার গুণগান করে। ভরা কলস যেমন শব্দ করে বাজে না তেমনি যাদের দানে সভ্যতার বিকাশ তারা কখনো তাদের মহিমা প্রচার করে না।

মন্তব্য: খালি কলস যেমন বেশি বাজে তেমনি গুণহীন ব্যক্তি নিজের ঢোল নিজে পিটিয়ে হয়রান হয়। কেউ তা শোনে না; বরং কানে তুলা দিয়ে রাখে দূষণের ক্ষতি থেকে বাঁচতে।

১০. করিতে পারি না কাজ
সদা ভয়, সদা লাজ
সংশয়ে সংকল্প সদা টলে
পাছে লোকে কিছু বলে।

মূলভাব: মানুষের সমালোচনা দুর্বলচিত্ত ব্যক্তিদের ইতিবাচক কাজ থেকে বিমুখ করে রাখে। কিন্তু মনের এ জড়তা দূর করতে না পারলে সাফল্য অর্জন করা সম্ভব হয় না।

সম্প্রসারিত ভাব : মানবজীবন কর্মমুখর। কাজের মাধ্যমেই মানুষের জীবনে সফলতা আসে। কাজ করতে গেলে ভুল হতেই পারে। কিন্তু সে ভুল থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে জীবনকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হয়। কিন্তু সবাই কর্মঠ হয় না। এমন কিছু মানুষ আছে, যারা সবসময় অন্যের সমালোচনায় মুখর থাকে, অন্যের কাজের খুঁত ধরে। কাজ করতে গেলে কেউ কেউ এদের কথা ভেবে দ্বিধাগ্রস্ত হয়। কে কী বলবে, কে কী সমালোচনা করবে, এসব ভেবে তারা বসে থাকে। ফলে কাজ এগোয় না। তাই যারা সমাজে অবদান রাখতে চায়, তাদের দ্বিধাগ্রস্ত হলে চলবে না। জীবনে সফল হতে হলে দৃঢ় মনোবল নিয়ে লোকলজ্জা ও সমালোচনাকে উপেক্ষা করে কাজে অগ্রসর হতে হবে। দেশ ও মানুষের কল্যাণে মহৎ কাজ করতে হলে ভয়ভীতি ও সংকোচকে পাশ কাটিয়ে লক্ষ্যে পৌঁছাতে হবে।

মন্তব্য: মহৎ কাজের ক্ষেত্রে দ্বিধাগ্রস্ত হলে চলবে না। মানুষের সমালোচনার ভয়কে উপেক্ষা করে আপন লক্ষ্যে স্থির থাকতে হবে।

NABARUN PUBLICATION

১১. কীর্তিমানের মৃত্যু নাই। *[ঢা. বো. '০২; ব. বো. '০৪; য. বো. '১৫]*

অথবা, বেঁচেও মরে যদি মানুষ দোষে, মরেও বাঁচে যদি মানুষ ঘোষে।

মূলভাব: মানবজীবনে কর্মই মূল্যায়নের মানদণ্ড। মানুষের দেহ নশ্বর কিন্তু কীর্তি অবিনশ্বর। কর্মের মহিমাই মানুষকে যুগ–যুগান্তর ধরে বাঁচিয়ে রাখে। সীমাবদ্ধ জীবনে মানুষ তার মহৎকর্মের মধ্য দিয়ে এ পৃথিবীতে অনন্তকাল স্মরণীয় ও বরণীয় হয়ে থাকে।

সম্প্রসারিত ভাব: 'জাতস্য হি ধ্রুব মৃত্যু' জন্ম হলে মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী। মানুষমাত্রই জন্ম–মৃত্যুর অধীন। মৃত্যুর মধ্য দিয়েই মানুষ পৃথিবী থেকে চিরবিদায় নেয়, কিন্তু পেছনে পড়ে থাকে তার মহৎকর্মের ফসল। যে কর্মের জন্য পরলোকগত হওয়ার পরও মানুষ পৃথিবীতে যুগ যুগ ধরে বেঁচে থাকে। এমন শ্রদ্ধাভাজন অমর ব্যক্তিত্বই মানবসমাজে ধন্য বলে বিবেচিত। বস্তুত মানুষের জীবনকে দীর্ঘ সময়ের সীমারেখা দিয়ে পরিমাপ করা যায় না। কেউ যদি তার পূর্ণাঙ্গ জীবনে কোনো ভালো কাজ না করে থাকে, তবে সে জীবন অর্থহীন, নিষ্ফল। এমন নিষ্ফল জীবনের অধিকারী মানুষটিকে কেউ মনে রাখে না। এমন নিরর্থক জীবন নীরবেই পৃথিবী থেকে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। পক্ষান্তরে, যে মানুষ জীবনকে কর্মমুখর করে রাখে এবং যার কাজের মাধ্যমে জগৎ ও জীবনের উপকার সাধিত হয়, তাকে বিশ্বের মানুষ অন্তর থেকে ভালোবাসে এবং শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করে। সেই সার্থক মানুষের কাজের অবদান বিশ্বের বুকে কীর্তিত হয়ে কৃতী লোকের গৌরব প্রচারিত হতে থাকে। আসলে কীর্তিমানের মৃত্যু তাঁর দেহের ধ্বংসসাধন করে মাত্র, কিন্তু তাঁর অম্লান কীর্তি পৃথিবীর মানুষের হৃদয়ে তাঁকে বাঁচিয়ে রাখে। এমন মহামানবের মৃত্যুর শত শত বছর পরেও মানুষ তাঁকে শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করে। তাই নিঃসন্দেহে বলা যায়, মানবজীবনের প্রকৃত সার্থকতা একমাত্র কর্ম সাফল্যের ওপরই নির্ভরশীল। মূলত একটা নির্দিষ্ট সময়ের জন্য মানুষ পৃথিবীতে আসে এবং সে সময়সীমা পার হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পৃথিবী থেকে বিদায় নিতে

হয় তাকে। সীমাবদ্ধ সংক্ষিপ্ত জীবনে কেউ যদি গৌরবজনক কর্মে জীবনকে মহিমান্বিত করে তুলতে সক্ষম হয়, তবে তার নশ্বর দেহের বিনাশহলেও তার স্বকীয় সত্তা থাকে মৃত্যুহীন। পৃথিবীতে এ রকম বহু জ্ঞানী-গুণী ব্যক্তিগণ তাঁদের গৌরবজনক কীর্তির জন্য চিরস্মরণীয় হয়ে রয়েছেন। কবি কাজী নজরুল ইসলাম সাধারণ পরিবারে জন্মগ্রহণ করেও কর্মের মাধ্যমে চিরঅমর হয়ে আছেন। জর্জ ওয়াশিংটন একজন সামান্য কৃষকের ঘরে জন্মগ্রহণ করেও স্বীয় কর্মবলে আমেরিকার প্রেসিডেন্ট হয়েছিলেন। কবি সুকান্ত ভট্টাচার্য, কিটস, ডিরোজিও এঁরা ত্রিশ বছর বয়সও বাঁচেননি; অথচ কর্মগুণে তাঁরাআজও অমর হয়ে আছেন। ইতিহাসের পাতায় এরূপ শতসহস্র মহামানবের দৃষ্টান্ত খুঁজে পাওয়া যাবে, যাঁরা মহৎ কীর্তি জন্য পৃথিবীতে অবিস্মরণীয় হয়ে আছেন।

মন্তব্য: আমাদের প্রতিটি ক্ষণ কাজে লাগানো দরকার। তাই মহৎ কর্মের মাধ্যমে মানুষের কল্যাণে নিজেকে নিবেদিত করে মৃত্যুর পরেও মানুষের হৃদয়ে স্থান করে নেওয়াই মনুষ্যজীবনের পরম উদ্দেশ্য ও প্রকৃত সার্থকতা।

১২. কর্তব্যের কাছে ভাই বন্ধু কেহই নাই।

মূলভাব: কর্তব্যের স্থান সকল মানবিক সম্পর্ক ও স্বার্থের ওপরে। মানবজীবনে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় কর্তব্য পালন। যে সকল মানুষ সঠিকভাবে, সঠিক সময়ে নিজের কর্তব্য পালন করে তারাই প্রকৃত মানুষ।

সম্প্রসারিত ভাব : জীবনের সমস্ত সংকীর্ণতাকে পরিহার করে যারা কর্তব্যকে সবার ওপরে স্থান দিয়েছেন তারাই সত্যিকারের মানুষ। কারণ কর্তব্যের কঠিন পথে প্রেম-ভালোবাসা ও স্নেহ-মমতা তাদের কাছে বাধা হয়ে দাঁড়ায়নি। পৃথিবী মানবের কর্মক্ষেত্র। এ কর্মক্ষেত্রে মানুষ কর্তব্যবোধ দ্বারা সর্বদা শাসিত হচ্ছে। যারা সমাজে কর্তব্যপরায়ণ ব্যক্তিরূপে খ্যাতিমান হয়েছেন, অনুসন্ধান করলে দেখা যাবে যে, তাঁরা জীবনের প্রভাতবেলা থেকেই কর্তব্যবোধের অর্থ অনুধাবন করতে সমর্থ হয়েছেন এবং জীবনসংগ্রামে যথোচিত সম্মান ও মর্যাদার আসনে উপবিষ্ট হয়েছেন। মহাপুরুষ মাত্রই কর্তব্যের কাছে নতি স্বীকার করেন; ফলে, তাঁদের কর্তব্যের সফলতার পথে যেকোনো বাধাই আসুক না কেন তাঁরা অবলীলায় তা অতিক্রম করেন। এমনকি নিজের রক্তের সম্পর্কের ভাইও তাঁদের কর্তব্যের পথে বাধা সৃষ্টি করতে পারে না। মানুষের সর্বাপেক্ষা প্রিয় তার ভাই ও বন্ধু। কিন্তু কর্তব্যনিষ্ঠ বলে পরিচিত ও অভিহিত ব্যক্তিমাত্রই কর্তব্যকর্ম সম্পাদনের পথে ভাই ও বন্ধুর কোনো প্রতিবন্ধকই গ্রাহ্য করে না। ভাই ও বন্ধুর স্বার্থকে বড়ো করে দেখে যদি কর্তব্য পালনে বাধাগ্রস্ত হয়, তবে মানুষ পকৃত মানুষ হয়ে উঠতে বাধাপ্রাপ্ত হয়। তবে দায়িত্বশীল মানুষ সে স্বার্থকে উপেক্ষা করে কর্তব্য পালনের ওপরেই গুরুত্ব দেয়। কেননা কর্তব্যনিষ্ঠ মানুষ কখনো কর্তব্যকে বিসর্জন দেয় না। কর্তব্যনিষ্ঠ মানুষ সকল কিছু উপেক্ষা করে কর্তব্য পালনের মধ্য দিয়েই প্রকৃত মনুষ্যত্বের বিকাশ ঘটান। তিনি সামনের দিকে অগ্রসর হন এবং জীবনে সাফল্য লাভ করেন।

মন্তব্য: সমাজ-সংসারে কর্তব্যনিষ্ঠ বহু লোক আছেন; তাঁদের জীবনের চাকা কর্তব্যবোধের পীড়নে সুষ্ঠুভাবে ঘুরত বলেই আজ তারা স্ব-স্ব লক্ষ্যে সফলকাম হয়েছেন। সুতরাং কর্তব্যই সাফল্যের চাবি।

১৩. কাঁটা হেরি ক্ষান্ত কেন কমল তুলিতে
দুঃখ বিনা সুখ লাভ হয়কি মহীতে?

মূলভাব: পৃথিবীতে যেকোনো সাফল্য লাভ করতে হলে প্রয়োজন শ্রম, সাধনা ও নিষ্ঠা; প্রয়োজন প্রতিকূলতাকে জয় করার মনোবল ও সহ্যশক্তি। সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্না, ভালো-মন্দ পরস্পর বিপরীতধর্মী হলেও একে অন্যের পরিপূরক। মানবজীবনে সুখ ও দুঃখের বিচিত্র সমাবেশ ঘটে। পার্থিব জীবনের চলমান ধারায় কখনো দুঃখের অমানিশা পার না হলে সুখের সাগরে পৌঁছানো যায় না।

সম্প্রসারিত ভাব : মহৎ সাফল্য সাধনাসাপেক্ষ। শ্রেষ্ঠত্ব লাভের পথ মোটেই কুসুমাস্তীর্ণ নয়। ফুল তুলতে গেলে যেমন কাঁটার আঘাত সইতে হয়, তেমনি সুখের অধিকারী হতে গেলে দুঃখ সহ্য করতে হয়। দুঃখকস্ট সুখের মতোই বরণ করে না নিলে জীবনে সফলতা আসে না। কাঁটার আঘাতে রক্ত ঝরিয়ে যারা পদ্মফুল সংগ্রহ করে তারাই প্রকৃতপক্ষে সার্থক। অবিমিশ্রিত সুখ এ জগতে লাভ করা যায় না। দুঃখের অগ্নিপরীক্ষার ভেতর দিয়ে সুখের নাগাল পাওয়া যায়। অনেকে মনে করে সুখ-দুঃখ অদৃস্টের লিখন। অদৃস্ট যখন প্রসন্ন হয় সুখ তখন আপনা-আপনিই এসে ধরা দেয়, আর অদৃস্ট মন্দ হলে শত চেস্টায়ও কিছু হয় না— এ ধারণা ভুল। মানুষ চেস্টা, সাধনা, ত্যাগ, ধৈর্য ও দুঃখ বরণ করে নিজ ভাগ্য জয় করে নিতে পারে। ইংরেজিতে একটা প্রবাদ আছে 'Life is not a bed of roses'- 'জীবনটা পুষ্পশয্যা নয়।' জীবনে চলার পথটা কণ্টকাকীর্ণ। এখানে কাঁটার আঘাত সহ্য

না করলে সুখের দেখা পাওয়া যায় না। কাঁটার ভয়ে যারা গোলাপ ফুলের কাছে যায় না, তারা গোলাপ ফুলের সৌন্দর্য থেকে বঞ্চিত হয়। ক্লান্তির ভয়ে পথিক যদি পথ চলা থেকে বিরত হয় তবে তার পক্ষে কখনো গন্তব্যে পৌঁছানো সম্ভব নয়। মহৎ ও ভালো কিছু অর্জনের জন্য প্রয়োজন কাঁটার মতো দুঃখ সহ্য করা। যারা সকল বাধা–বিপত্তি, প্রতিকূলতাকে হাসিমুখে বরণ করে এগিয়ে চলে তারাই পারে সাফল্যের চূড়ান্ত শিখরে আরোহণ করতে। সংসার জীবনে দুঃখ, কষ্ট, প্রতিকূলতা, বাধা–বিপত্তি আছে। মানুষকে উদ্যোগী হয়ে সে সকল বাধা–বিপত্তি অতিক্রম করে সাফল্য লাভ করতে হয়। মানুষ সুখের প্রত্যাশী। সুখ মানুষের কামনার ধন আর দুঃখ সর্বদাই পরিত্যাজ্য। কিন্তু মানবজীবনে সুখ–দুঃখ ওতপ্রোতভাবে জড়িত। দুঃখকে ভয় করে লক্ষ্য অর্জনের পথ থেকে সরে দাঁড়ালে সাফল্য কখনো ধরা দেয় না। প্রত্যেক মানুষের ভেতর এমন এক শক্তিসামর্থ্য আছে যা প্রয়োগ করে সে নির্দিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছাতে পারে। তাই সুখের নাগাল পেতে হলে দুঃখকে বরণ করে নিতে হবে। কাঁটার ভয়ে পদ্মফুলকে উপেক্ষা করা, পথ দেখে ভয় পেয়ে পথ না চলা মূর্খতারই নামান্তর। তাই ভয় পেলে চলবে না, দুঃখকে আলিঙ্গান করে প্রকৃত সৌন্দর্য উদ্ঘাটনের চেষ্টা করতে হবে। জাবনে যখন দুঃখ নেমে আসে তখন মনে হয় দুঃখের বোধহয় শেষ নেই। সুখ–দুঃখের বিচিত্র সমাবেশে আমাদের এই জীবনে দুঃখের ঘোর অমানিশা একদিন কেটে যায়। পুবের আকাশে উদিত হয় এক নতুন সুন্দর সূর্য যাতে আগমন হয় শান্তির, সুখের। আমাদের জীবনটা জোয়ার–ভাটার মতো। ভাটার পরে যেমন জোয়ার আসে তেমনি দুঃখের পরেও সুখ আসে। এর জন্য প্রয়োজন ধৈর্য আর সৎ সাহস। ইতিহাসে যারা জয়ী হয়েছেন, প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন তারা সবাই দুঃখের সাথে সংগ্রাম করেছেন। সালাউদ্দিন, শেরশাহ, নেপোলিয়ন, কামাল পাশা এবং আরও অসংখ্য ব্যক্তি রয়েছে।

মন্তব্য : আমাদের এই সত্যে বিশ্বাসী হয়ে সাময়িক দুঃখ–কষ্ট, দ্বন্দ্ব–সংঘাত মেনে নিয়ে সামনের দিকে এগিয়ে যেতে হবে।

১৪. অতি বাড় বেড়ো না, ঝড়ে পড়ে যাবে; অতি ছোট থেকো না, ছাগলে মুড়ে খাবে।

মূলভাব: মানবজীবনে পরিমিতিবোধ একান্ত অপরিহার্য। যা আছে তার চেয়ে বেশি বাড়াবাড়ি যেমন ব্যক্তি ও সমাজের জন্য ক্ষতিকর, তেমনি নিজের যোগ্যতা থেকে ছোটো হয়ে থাকাও ব্যক্তি ও সমাজের জন্য ক্ষতিকর।

সম্প্রসারিত ভাব: পৃথিবীর সবকিছুর একটা নির্দিষ্ট সীমা আছে। এই সীমার মধ্যেই মানুষকে তার কর্মপন্থা, স্বভাব–চরিত্র নিয়ন্ত্রণে রাখতে হয়। সৃষ্টির নিয়মের ভেতরেই এই সীমার ব্যাপারটি নিহিত। মানবজীবনেও এ নিয়ম প্রযোজ্য। যার যেমন ক্ষমতা, যোগ্যতা, গুণাবলি তার তেমনই হওয়া উচিত। ক্ষমতার বাইরে, যোগ্যতার বাইরে, গুণাবলির বাইরে গেলেই তার বিপদ, এমনকি সে অস্তিত্ব সংকটাপন্ন হয়ে পড়বে। আবার যোগ্যতার নিচে, ক্ষমতার পরিমাপের নিচে, গুণাবলির নিষ্ক্রিয়তায় অবস্থানকারী মানুষের মূল্যায়ন হয় না। এ সংসার বিচিত্র। এখানে বেশি বড়ো হওয়া যেমন অনুচিত তেমনি বেশি ছোটো হওয়া অপ্রয়োজনীয়। মধ্যপন্থা অনুসরণই সর্বোত্তম। সব দেশেই এ মতবাদ সিদ্ধ যে, কোনোকিছুতেই বেশি বাড়াবাড়ি ভালো নয়। গাছ বেশি বড়ো হলে এতে ঝড়ের প্রবল আঘাত লাগে, আবার অতি ছোটো হলে ছাগলে এসে নির্মূল করে ফেলে। অতএব, গাছকে এমনভাবে বড়ো হতে হবে যেন, ঝড় আসলে এর গায়ে আঘাত করতে না পারে এবং ছাগলে এর মাথার নাগাল না পায়। মানুষের ক্ষেত্রেও এটি প্রযোজ্য। মানুষ যেহেতু সমাজে বাস করে সেজন্য তাকে প্রতিদিনের কর্মকাণ্ডে এ কথা মনে রাখতে হবে। সংসারে অন্যদের তুলনায় বেশি প্রতিষ্ঠা অর্জন করতে হলে তাকে নানা প্রতিবন্ধকতা পার হতে হবে, আবার অত্যন্ত হীন অবস্থায় মাথা নিচু করে থাকলে সবার কাছে তাচ্ছিল্যের বস্তু হতে হবে। অতএব, মধ্যপন্থা অবলম্বনই বাঞ্ছনীয়। বাড়াবাড়ি সবসময়ই পরিত্যাজ্য। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে, বিশ্বজয়ী নেপোলিয়ন বোনাপার্ট বাড়াবাড়ি করেছিলেন বলে ওয়ার্টার্লুর যুদ্ধে তার সর্বনাশ ঘটেছিল।

মন্তব্য: সমাজের মধ্যে অতি বাড়াবাড়ি যেমন কাম্য নয় তেমনি অতি ক্ষুদ্রতাও অনাকাঙ্ক্ষিত। সবারই সুষ্ঠু পরিমিতিবোধ থাকা উচিত।

১৫. আলস্য এক ভয়ানক ব্যাধি *[ঢা. বো. '১৩]*

মূলভাব: অলসতা মানুষের জীবনের জন্য অত্যন্ত ক্ষতিকর। এই অলসতার কারণে ব্যক্তি তার শক্তি এবং সামর্থ্য সম্বন্ধে আত্মবিশ্বাস একেবারেই হারিয়ে ফেলে। আলস্য মানবজীবনের সমস্ত শক্তিকে ধ্বংস করে দেয়। তাই অলসতা কাটিয়ে জীবনকে করে তুলতে হবে কর্মময়।

সম্প্রসারিত ভাব: বিশ্বসভ্যতার দিকে তাকালে আমাদের নয়ন–মন জুড়িয়ে যায়, তাতে রয়েছে অগণিত নিবেদিত প্রাণ, পরোপকারী মানুষের শ্রম আর একনিষ্ঠ সাধনা। মানুষের শ্রমেই গড়ে উঠেছে আধুনিক পৃথিবী। সুতরাং শ্রম ব্যতীত অন্য কোনো

শক্তি কোনো জাতির উন্নয়ন ও সমৃদ্ধিতে ভূমিকা রাখতে পারে না। পক্ষান্তরে, আলস্য পারমাণবিক বোমার চেয়েও ধ্বংসাত্মক, মানুষের অস্থিমজ্জায় মিশে মানুষকে চিরতরে পঙ্গু করে দেয়। ফলে অলস লোকজন নিয়ে কোনো সমাজই তাদের প্রত্যাশিত স্থানে পৌঁছাতে পারে না। অলসতা মানুষের মধ্যে তীব্রভাবে জন্ম দেয় হীনম্মন্যতা, কুসংস্কারাচ্ছন্নতা; আরও জন্ম দিতে পারে অত্যধিক কল্পনা-প্রিয়তা, যার বাস্তবের সঙ্গে কোনো মিল নেই। অলসতা দিন দিন সমস্ত সৃজনশীল শক্তি চুষে খেয়ে ফেলে। সীমাহীন নেতিবাচকতায় পরিপূর্ণ এ অলসতা। কাজেই, এটি মানবজীবনের এক ভয়াবহ পীড়া। অত্যধিক ভোগ-বিলাস আর অলসতায় অনেক মানুষ তার অস্তিত্বকে বিপন্ন করেছে- পৃথিবীতে এ নজিরও বিরল নয়। ভারতীয় উপমহাদেশে অনেক রাজা-বাদশা, সম্রাট, সুলতান ভোগ-বিলাসে আর বাইজি নাচে অলস সময় কাটাতে গিয়ে শেষ পর্যন্ত সিংহাসন হারা ও রাজ্য হারাও হয়েছেন। ব্যক্তিগত জীবনেও আলস্য এক মরণঘাতী রোগের মতোই একটি সাজানো-গোছানো সংসারকে তছনছ করে দিতে পারে। অলসতার ক্ষতিকর প্রভাবেই সমাজে জন্ম নেয়- চুরি, ডাকাতিসহ নানা অপকর্ম। আজকের যুবসমাজের অবক্ষয়ের অন্যতম কারণই এ আলস্য। অথচ যেকোনো দেশের জন্য এ যুব-সম্প্রদায় একটি বৃহৎ শক্তির উৎস। এক্ষেত্রে বাংলাদেশের অবস্থান মোটেই সন্তোষজনক নয়। বরং অধিকাংশ এসিড নিক্ষেপ, ইভটিজিং-এর মতো ঘৃণিত অপরাধের সঙ্গে সরাসরি কিছু উচ্ছৃঙ্খল যুবক জড়িত। এরা চাঁদাবাজি থেকে শুরু করে যেকোনো ধরনের অপরাধমূলক কাজে নিয়োজিত। এদের অফুরন্ত সময় কাটে নেশার আড্ডায়। জাতি হিসেবে এ আমাদের জন্য এক ভয়ংকর দৃষ্টান্ত। রাষ্ট্র এখন পর্যন্ত এ সম্ভাবনাময় যুবশক্তিকে কাজে লাগানোর জন্য কোনো ধরনের টেকসই উদ্যোগ গ্রহণ করেনি। ফলে একদিকে যেমন দেশে সর্বদা লক্ষ যুবকের কোটি কোটি কর্ম-ঘণ্টা নষ্ট হচ্ছে অলসতায়; অন্যদিকে সমাজ-রাষ্ট্রে জন্ম নিচ্ছে নানা রকমের দুর্নীতি। অথচ অতিশয় জ্ঞানবৃদ্ধ দার্শনিক সক্রেটিস গ্রিসের যুব-সম্প্রদায়েরই শক্তি-সামর্থ্যকে স্বাগত জানাতেই প্রাণ বিসর্জন দিয়েছেন। কিন্তু, আমাদের জীবনে এ অলসতা যেভাবে বাসা বাঁধছে তাতে মহাদুর্যোগেরই আলামত পাওয়া যায়। সুতরাং এটি নিশ্চিত যে, যেকোনো দেশ-জাতির অর্থনৈতিক উন্নয়নে, সাংস্কৃতিক বিকাশে আলস্য মারাত্মক হুমকি হয়ে দাঁড়ায়। তাই আলস্য পরিহার করে শ্রমের সাধনা সকলের করা উচিত।

মন্তব্য: প্রবহমান জীবনে আলস্য এক প্রতিবন্ধকতার নাম। এটি মানবজীবনের সমস্ত অর্জনকে ম্লান করে দিতে পারে। তাই আলস্যকে ছুটি দিয়ে নিরন্তর কর্ম আর একনিষ্ঠ সাধনায় সমৃদ্ধ জীবন গড়ে তুলতে হবে।

১৬. অন্যায় যে করে আর অন্যায় যে সহে
তব ঘৃণা যেন তারে তৃণসম দহে।

মূলভাব: আজকের পৃথিবীতে যে অশান্তি, নৈরাজ্য তার মূল হচ্ছে অপরাধীর অন্যায় কর্ম। ছোটো এক দল মানুষ অপরাধ করে যাচ্ছে আর প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে ভুক্তভোগী হচ্ছে পৃথিবীর সকল মানুষ। শুধু নিজে অন্যায় না করলেই দায়িত্ব শেষ হয়ে যায় না, অন্যায়কে প্রতিহতও করতে হয়।

সম্প্রসারিত ভাব : অপরাধপ্রবণতাটা আমাদের সমাজে সৃষ্টির সূচনা থেকেই লেগে আছে আঠার মতো। আর কিছু কিছু মানুষ এই প্রবণতায় মেতে উঠে সমাজের ক্ষতি করে যাচ্ছে। আবার কিছু মানুষ সরাসরি এই অন্যায় করে না। অন্যায়কে প্রশ্রয় দিয়ে অন্যায়ের ধারাকে বাড়িয়ে দেয়। নিশ্চিতভাবে তারাও সমান অপরাধী। কারণ অন্যায় সহ্য করা মানে হচ্ছে- অপরাধীকে প্রশ্রয় দেওয়া এবং অন্যায়কে মেনে নেওয়া। এরা সমাজকে কলুষিত করে তোলে। এদের জন্য সমাজের অগ্রগতি থেমে যায়। ফলে সমাজে নেমে আসে নৈরাশ্যের কালো অন্ধকার। অন্যায়কারীর প্রতি ঘৃণা সকলেরই থাকে। কিন্তু শুধু ঘৃণা করলেই চলবে না। অন্যায় যে সহ্য করে সেও ঘৃণার পাত্র। সৃষ্টিকর্তা মানুষের মধ্যে বিবেক-বুদ্ধি, শক্তি, সাহস সবই দিয়েছেন। এই শক্তি ও সাহস অন্যায়কে প্রতিহত করার কাজে ব্যবহৃত হওয়া উচিত। কিন্তু সমাজে বহুলোক শক্তিসামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও অন্যায়কারীকে বাধা দেয় না। নিজেকে সত্য প্রতিষ্ঠা থেকে সরিয়ে রাখতে চায়। মানুষের মূল্যবোধ দিনে দিনে পরিবর্তিত হচ্ছে। অপরাধ করার ধরনও সেই সাথে পালটে যাচ্ছে। রাষ্ট্রীয় অন্যায়ের পরিধি ব্যাপকভাবে বিস্তৃতি লাভ করেছে। এসব রাষ্ট্রীয় অন্যায় সমাজকে ক্ষতিগ্রস্ত করছে। তাই এ অন্যায়কে মুখ বুজে সহ্য করা যাবে না। যারা অন্যায় সহ্য করে নিভৃতে চোখের জল ফেলছে, ভয়ে কিছু বলতে পারছে না তাদেরকে সম্মিলিতভাবে প্রতিবাদ করতে হবে। অন্যায়ের বিরুদ্ধে রুখে না দাঁড়িয়ে অন্যায় সহ্য করলে অপরাধপ্রবণতা বাড়ে। তাই অন্যায়কে প্রতিহত করা মানবধর্মের মহান কর্তব্য।

মন্তব্য: অন্যায়কে প্রতিহত করার মানসিকতা ছোটোবেলা থেকেই গড়ে তুলতে হবে। সৃষ্টিকর্তা অন্যায়কারী ও অন্যায় সহ্যকারী উভয়কেই ঘৃণা করেন। তাই সমাজজীবনকে সুন্দর ও সুশৃঙ্খল করতে হলে আমাদের অন্যায়কারীর বিরুদ্ধে প্রতিবাদমুখর হতে হবে।

১৭. অভাব অল্প হলে দুঃখও অল্প হয়ে থাকে। *[য. বো. '০০]*

মূলভাব: অভাববোধ বা চাহিদার ওপরই মানবজীবনের সুখ–দুঃখ নির্ভর করে। যদি অভাবের পরিমাণ অল্প হয় তবে দুঃখের পরিমাণও অল্প হতে বাধ্য।

সম্প্রসারিত ভাব : মানুষ সামাজিকভাবে বসবাস করে। একাকী তার পক্ষে বাস করা কঠিন। সব সমাজে সুখ আছে, দুঃখ আছে, জ্বালা আছে, যন্ত্রণা আছে। আবার সব দেশে নানা শ্রেণির নর–নারী নিয়েই জনসমাজ গঠিত, যেখানে ধনী ও দরিদ্র– এ দু–শ্রেণিতে বিভক্ত। বিশ্বের মানবসমাজে যেখানে বেশিরভাগ লোক দারিদ্র্যের কশাঘাতে জর্জরিত সেখানে অভাব–অভিযোগ যে কত তা বলাই বাহুল্য। সব দেশে দরিদ্র লোকের সংখ্যা অগণিত। তাদের নুন আনতে পান্তা ফুরায়, এ অভাব–অভিযোগের ফলে তাদের দুঃখ–বেদনাও অসীম। মানবজীবন কেবল সুখের আকর নয়। এই পৃথিবীতে বেঁচে থাকতে হলে মানুষকে নানা রকম অভাব ও চাহিদার মোকাবিলা করতে হয়। অজস্র ঘাত–প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে তাকে এ অভাব বা চাহিদা পূরণ করতে হয়। কিন্তু মানুষের চাহিদার কোনো শেষ নেই, যার চাহিদা যত বেশি তার অভাবের পরিমাণও তত বেশি। অভাব শুধু মানুষের দুঃখ বাড়ায়। মানুষের প্রয়োজন অনুযায়ী সব কিছুই বিধাতা দিয়েছেন। তব্ও মানুষ নিজেদের তৈরি করা অভাবের জন্য দুঃখ পেয়ে যায় সবসময়। পার্থিব সম্পদের প্রতি মানুষের আকাঙ্ক্ষা মানুষকে অতৃপ্ত করে তোলে এবং মনুষ্যত্ব বিলীন করে দেয়। আবার এ কথাও সত্য যে, ধনী–দরিদ্র সব শ্রেণির লোকেরই অভাববোধ আছে, তারা সংসারে কোনো না কোনোভাবে অভাবের শিকার। দেশের প্রেসিডেন্টের যেমন অভাববোধ আছে, সে দেশের এক সাধারণ শ্রমিকেরও তেমনি অভাববোধ আছে। একজনার অভাববোধের সঙ্গে অপরজনের অভাববোধের মিল নেই। এই অভাববোধ আছে বলে মানুষের দুঃখের সীমা নেই। কিন্তু যারা অভাবী নয়, তাদের তো কোনো দুঃখ নেই। যদি মনে করি, আমার কোনো অভাব নেই অথবা অভাব নিতান্ত অল্প তাহলে মনের আকাশে দুঃখের কালো মেঘ জমবে না, অথবা কালো মেঘ জমলেও নিতান্তই অল্প জমবে।

মন্তব্য: মহাপুরুষদের জীবন থেকে শিক্ষা গ্রহণ করা যায় যে, তাঁদের জীবনে অভাববোধ নিতান্ত অল্প ছিল ফলে জীবনে তাঁরা দুঃখও কম পেয়েছেন। অভাব যার অল্প দুঃখও তার অল্প হতে বাধ্য। প্রয়োজনের অতিরিক্ত অভাববোধই জীবনকে দুঃখময় করে তোলে।

১৮. অর্থ অনর্থের মূল।

[ঢা. বো. '১৩; চ. বো. '১৪]

মূলভাব: মানুষের জীবনযাত্রা নির্বাহের জন্য অর্থ অপরিহার্য হলেও এই অর্থই আবার মানুষের সমস্ত অকল্যাণের মূলে। অর্থ মানবজীবনের অমৃত রসায়ন। কারণ এ সংসারে অর্থকে অবলম্বন করেই মানুষ যাবতীয় বস্তু লাভ করতে পারে।

সম্প্রসারিত ভাব: সংসারের সুখ, সমৃদ্ধি, সমাজের প্রতিষ্ঠা এমনকি প্রতিদিনকার কর্মকান্ড অর্থ দ্বারাই পরিচালিত হয়। অর্থোপার্জনের জন্য মানুষ মাথার ঘাম পায়ে ফেলে পরিশ্রম করে ব্যাবসাবাণিজ্য করে, লেখাপড়া করে, সে দেশ হতে দেশান্তরে ছুটে বেড়ায়। কারণ জীবনের সর্বক্ষেত্রে অর্থ ছাড়া চলার উপায় নেই। এমনকি দাম্পত্য জীবনের সুখের জন্যও অর্থের একান্ত প্রয়োজন। জীবন যে এত মধুময় ও লোভনীয় তার পেছনেও রয়েছে এ অর্থ। এ অর্থ মানুষ সৎকার্জে ব্যয় করে মহৎ কীর্তি স্থাপন করতে পারে। সকলের মধ্যমণি হয়ে অম্লান আদর্শ নির্মাণ করতে পারে। যে অর্থ মানুষের এত মঙ্গল সাধন করে, সে অর্থ আবার সব রকম অনর্থের সূত্রপাত করতে পারে। মানুষ ধনাঢ্য হওয়ার জন্য যেকোনো নীচ কাজ করতে দ্বিধা করে না; অর্থোপার্জনের অভিলাষে সে অনেক সময় অপরের ওপর অত্যাচারের স্টিমরোলার চালাতে কুণ্ঠিত হয় না। মানুষ অর্থের লোভে নীতি–নৈতিকতা বিসর্জন দিয়ে প্রত্যহ নানা অপকর্মে লিপ্ত হয়। পৃথিবীতে যত অকল্যাণ সাধিত হচ্ছে তার প্রত্যেকটির মূলে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে অর্থ জড়িত। মানুষের সীমাহীন দুর্নীতি ও নৈতিক অবক্ষয়ের অন্যতম কারণ অর্থের প্রতি উদগ্র লালসা। অর্থের লোভেই চরিত্রহীন হয়ে মানুষ সামজবিরোধী কাজে লিপ্ত হয়। অর্থসম্পদের স্বার্থেই রাষ্ট্রে রাষ্ট্রে যুদ্ধের উন্মাদনা জাগে, শ্রমিক–মালিকে বাধে মতবিরোধ, ভাইয়ে–ভাইয়ে শুরু হয় চরম শত্রুতা। অর্থের লোভেই মানুষ মানুষকে খুন করে। তাই জগতের সব অশান্তি ও অনর্থের মূলে রয়েছে অর্থ।

মন্তব্য: অর্থ মানবজীবনে অত্যাবশ্যকীয় হলেও তা মাঝে মাঝে অনর্থের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। তাই অর্থ–সম্পদ আমাদের সচেতনভাবে আয় ও ব্যয় করতে হবে। অর্থের জন্য বন্ধুবিচ্ছেদ ঘটে, নিতান্ত আপনজনের সঙ্গে মনোমালিন্যেরও সৃষ্টি হয়। কাজেই অর্থই অনর্থের মূল।

১৯. অর্থসম্পদের বিনাশ আছে কিন্তু জ্ঞানসম্পদের বিনাশ নেই। *[চ. বো. '০৯]*

মূলভাব: মানবজীবনে ধনসম্পদের প্রয়োজন রয়েছে। কিন্তু অর্থসম্পদ আহরণ করার আকাঙ্ক্ষা যদি কোনো ব্যক্তির মনে উদিত হয়, তখন তার থেকে লালসার সৃষ্টি হয়।

সম্প্রসারিত ভাব : অর্থসম্পদের প্রতি মানুষের আগ্রহ পতিনিয়ত বৃদ্ধি পেতে থাকে। অর্থসম্পদ সংগ্রহ মানুষের প্রধান কর্ম হয়। কিন্তু এ অর্থসম্পদের ক্ষয় আছে। বস্তুত বিত্তবান ব্যক্তি স্বল্প সময়ের ব্যবধানেই বিত্তহীন হয়ে পড়ে। আবার বিত্তহীন ব্যক্তি বিত্তবান হয়, এ ধনসম্পদ নিয়ন্ত্রণে থাকলে সে রাজা–বাদশাহ সদৃশ। আমরা জানি, এ ইহলৌকিক বস্তুগত সম্পদ ছাড়া আরও একটা বিশাল সম্পদ রয়েছে, সেটি হলো 'জ্ঞানসম্পদ'। অর্থসম্পদের ক্ষয় থাকলেও এ সম্পদের কোনো ক্ষয় নেই। বিদ্যা বা জ্ঞানের সমতুল্য কোনো সম্পদ এ পৃথিবীতে নেই। এ কারণে বিদ্যাকে অমূল্য রত্ন বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। এ অমূল্য রত্নসদৃশ সম্পদটির কোনো ক্ষয় নেই। মানবজীবন এ অমূল্য সম্পদটির দ্বারা সব বাধাবিপত্তি দূরীভূত করে। এর ফলে আমাদের জীবন সহজসরল হয়ে ওঠে। জ্ঞানসম্পদ পশুতুল্য মানুষকে সত্যিকার মানুষ করে থাকে। অপরপক্ষে অর্থসম্পদের নেশা মানুষকে অমানুষ করে তোলে। এ ধনসম্পদ ক্রমাগত ব্যয় করলে একসময় তা শেষ হয়ে যায়। পক্ষান্তরে, জ্ঞানসম্পদ ব্যয় করলে তা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পায়। সুতরাং জ্ঞানসম্পদের সমতুল্য সম্পদ পৃথিবীতে আর একটিও নেই। এ সম্পদ পানি দ্বারা নষ্ট হয়ে যাওয়া কিংবা আগুনে পুড়ে গিয়ে নিঃশেষ হয়ে যাওয়ার কোনো সম্ভাবনা নেই। এমনকি চোর, ডাকাত, ছিনতাইকারীর ভয়ও নেই।

মন্তব্য : বিশাল ধনসম্পদের অধিকারী ব্যক্তি মৃত্যুর পরেই বিস্মৃত হয়। অপরদিকে জ্ঞানসম্পদের অধিকারী ব্যক্তি চিরকাল মানুষের মধ্যে বেঁচে থাকেন।

২০. অসি অপেক্ষা মসি অধিকতর শক্তিমান।

মূলভাব: মসি অর্থাৎ কলম সভ্যতা, বিজ্ঞান ও উন্নতি সবকিছুর ধারক এবং বাহক। একটি শক্তিশালী তরবারির চেয়ে একটি কলমের ক্ষমতা আরও বেশি শক্তিশালী।

সম্প্রসারিত ভাব: লেখকের কলমের ক্ষমতা সামরিক যুদ্ধজয়ী মানুষের তুলনায় অধিক ক্ষমতার অধিকারী। বিশ্বের মহান সমর নায়করা অনেক রাষ্ট্র জয় করেছেন। কিন্তু মানুষের মনের ওপর তাদের খুব কম প্রভাব ছিল। কিন্তু হোমার, অ্যারিস্টটল, প্লেটো, টলস্টয়, শেক্সপিয়র এবং অন্যান্য লেখকের লেখা বইগুলোর সকল যুগের মানুষের ওপর অধিকতর প্রভাব রয়েছে। তরবারি ক্ষমতার প্রতীক; ভয়ের প্রতীক কিন্তু লেখকের কলম মনের ওপর মানুষের অসীম ক্ষমতার প্রতীক। কলম দ্বারা সমাধাকৃত কাজ তরবারি দ্বারা সমাধা করা সম্ভব নয়। শারীরিক শক্তি একটি জাতিকে জয় করতে পারে, কিন্তু তাকে শাসন করতে পারে না। শুধু কলমই পৃথিবীর মানবহৃদয় শাসন করতে পারে। অসি অর্থাৎ, তরবারির ক্ষমতা অত্যধিক তাতে কোনো সন্দেহ নেই। মারণাস্ত্রের দ্বারা শত্রু দমন হয়, মুহূর্তে লাখো প্রাণ বিনষ্ট হয়, এমনকি গোটা দেশও সমূলে ধ্বংস হয়। আপাতদৃষ্টিতে অসি অনেক শক্তিশালী মনে হয়। কিন্তু অসি অপেক্ষা মসির ক্ষমতা নগণ্য মনে হলেও প্রকৃতপক্ষে তা সত্য নয়। বিশ্বের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায়– হালাকু খান, চেঙ্গিস খান, নাদির শাহ, হিটলার প্রমুখ তাদের মারণাস্ত্রের আঘাতে রক্তের বন্যা বইয়ে দিয়ে দিগ্‌বিজয়ী বীরের আখ্যায় আখ্যায়িত হলেও ইতিহাসে তারা অক্ষয় আসন লাভ করতে ব্যর্থ হয়েছেন। কিছুদিনের জন্য প্রভাব বিস্তার করলেও মৃত্যুর পর চিরতরে হারিয়ে গেছেন বিস্মৃতির অতল অন্ধকারে। অন্যদিকে লেখনীর আঘাতে বাহুবলে বলীয়ান রাজার মাথার মুকুট কত যে ধুলায় গড়িয়ে পড়েছে, ফরাসি বিপ্লবের কাহিনি তারই জ্বলন্ত নিদর্শন। উচ্চমানের কবির রচনার গুণেই দিগ্‌বিজয়ীর ক্ষণস্থায়ী জয়ের কাহিনি মানুষের কাছে অমর হয়ে থাকে। অতএব, নিঃসংশয়ে বলা যায়, বাহুবলের চেয়ে কলমের শক্তি সবসময়ই বেশি।

মন্তব্য : বিদ্যা তথা জ্ঞানের চেয়ে মূল্যবান জিনিস আর নেই। জাতীয় মুক্তিতে শহিদের অবদানের চেয়ে জ্ঞানীর অবদান কম নয়।

২১. আত্মশক্তি অর্জনই শিক্ষার উদ্দেশ্য।

অথবা, জ্ঞানশক্তি অর্জনই শিক্ষার উদ্দেশ্য।

মূলভাব: শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য হলো মানুষের কর্মশক্তি অর্জন ও মনষ্যত্বের বিকাশ। বিশেষত মানুষের বিশেষ ক্ষমতাগুলোর বিকশিত করা। এ কারণে অর্থ উপার্জনের ক্ষেত্রটি শিক্ষার একমাত্র উদ্দেশ্য নয়। যদিও বর্তমান যুগে ভালো ফলাফল করার উদ্দেশ্য হলো উত্তম একটি চাকরি পাওয়া এবং এ সঙ্গে প্রচুর অর্থ উপার্জন করা। কিন্তু এর ফলে শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য নষ্ট হয়। সুতরাং শিক্ষার প্রকৃত উদ্দেশ্য থেকে মানুষ বহু দূর সরে যায়।

সম্প্রসারিত ভাব : মানবসম্পদ উন্নয়নের মূলরূপে শিক্ষার প্রচলন হয়। এক্ষেত্রে শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য হলো মানুষের বুদ্ধি এবং বিবেক জাগ্রত করা। এর ফলে অভ্যন্তরীণ শক্তি ও সম্ভাবনা কাজ করে থাকে। এছাড়াও সমাজ ও সভ্যতার কল্যাণ সাধিত হয়। এর অনেকগুলো কারণ রয়েছে। এর মধ্যে প্রধান হলো মনুষ্যত্ব অর্জন করা। কারণ মানুষ জন্মসূত্রে কেবলই মানুষ নয়, তার মানুষ হওয়ার জন্য অনেক চেষ্টা করতে হয়। এক্ষেত্রে প্রকৃত শিক্ষার সাহায্যে শুধু মনুষ্যত্ব অর্জন করা যায়। এজন্য বলা হয়ে থাকে, ‘সুশিক্ষিত মাত্রই স্বশিক্ষিত’। একজন শিক্ষিত মানুষ অন্য একজন অর্ধশিক্ষিত মানুষ থেকে শুধু চারিত্রিক গুণাবলির জন্যই আলাদা হয়ে ওঠে। এসব চারিত্রিক গুণের মধ্যে রয়েছে– মার্জিত আচরণ, ভদ্র ব্যবহার, উন্নত চিন্তা, ন্যায়পরায়ণতা, কর্তব্যনিষ্ঠা, সততা প্রভৃতি। এগুলো হলো মানুষের মানবিক গুণ এবং আত্মগত শক্তি। সুতরাং বলা যায়, শিক্ষাই মানুষের আত্মসামর্থ্যের অধিকারী। অর্থাৎ শিক্ষাই আত্মশক্তি অর্জনের মূলমন্ত্র। কিন্তু প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার মাধ্যমে এ বিষয়ে পূর্ণতা অর্জন করা যায় না। জ্ঞানকে আত্মস্থ করার জন্য নিজের চেষ্টার কোনো বিকল্প নেই। কারণ শিক্ষার পরিধি অনেক বড়ো। দোলনা থেকে কবর পর্যন্ত শিক্ষালাভের সময়। সুতরাং প্রচুর জ্ঞানচর্চা ছাড়া সুশিক্ষিত হওয়া যায় না। আমাদের দেশে এমন অনেক ব্যক্তি রয়েছে যাদের উচ্চতর ডিগ্রি রয়েছে কিন্তু দেশ ও জাতির কল্যাণে তারা কিছুই করতে পারেননি। কারণ তারা স্বশিক্ষাই শিক্ষিত নন। এমনকি তাদের মধ্যে কোনো মুক্তচিন্তার বহিঃপ্রকাশ ঘটেনি। আবার কোনো কোনো স্বশিক্ষিত ব্যক্তি রয়েছেন, যাদের তেমন কোনো ডিগ্রি নেই। কিন্তু তারা বিশ্বমানবের কল্যাণে অনেক কিছু করেছেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ– সক্রেটিস, অ্যারিস্টটল, প্লেটো, নিউটন, রবীন্দ্রনাথ, নজরুল প্রমুখের নাম উল্লেখ করা যায়। তারা স্বশিক্ষায় শিক্ষিত বলে, মরেও অমর হয়েছেন।

মন্তব্য : তাই প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা সমাপ্ত করে, যথাযথ জ্ঞান অর্জনের জন্য জ্ঞানের অনুশীলন প্রয়োজন। সুশিক্ষার জন্য কিংবা আত্মশিক্ষা অর্জনের জন্য নিজের মনোদৈহিক শক্তিগুলো জাগ্রত করা প্রয়োজন। একমাত্র স্বশিক্ষার মাধ্যমেই সুশিক্ষিত কিংবা আত্মশক্তি অর্জন করা সম্ভব হয়। এজন্য সারাজীবন মানুষের আত্মশক্তি কিংবা জ্ঞান সাধনা করা উচিত।

NABARUN PUBLICATION

২২. আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারি
আমি কি ভুলিতে পারি।

মূলভাব: মাতৃভাষার মর্যাদা রক্ষার্থে বাঙালির আত্মত্যাগের ইতিহাস অবিস্মরণীয়। ভাষাশহিদদের রক্তাক্ত স্মৃতি চিরকাল আমাদের হৃদয়ে অমলিন হয়ে থাকবে।

সম্প্রসারিত ভাব: ২১ ফেব্রুয়ারি আমাদের জাতীয় জীবনে একটি স্মরণীয় দিন। ১৯৫২ সালের এই দিনটিতে বাংলা ভাষাকে মাতৃভাষা করার দাবিতে প্রাণ দিয়েছিলেন সালাম, রফিক, বরকত, জব্বারসহ নাম না–জানা আরও অনেকে। ১৯৪৭ সালে পাকিস্তান রাষ্ট্রের জন্মের পর থেকেই পাকিস্তানি স্বৈরশাসকেরা বাঙালিদের ওপরে কর্তৃত্ব স্থাপনের চেষ্টা করে। রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক সব ধরনের অধিকার কেড়ে নেওয়ার চেষ্টা করে। এরই পরিপ্রেক্ষিতে ১৯৪৮ সালের ২১ মার্চ পাকিস্তানের গভর্নর জেনারেল মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ বলে, ‘উর্দু এবং উর্দুই হবে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা।’ এ কথার প্রতিবাদে ছাত্র–সমাজ ক্ষোভে ফেটে পড়ে। তারা মিছিল–মিটিংয়ে অংশগ্রহণ করে। সরকারের দেওয়া ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করে ’৫২–এর ২১ ফেব্রুয়ারিতে মিছিল বের করে। সরকার পক্ষের পুলিশ মিছিলে গুলি চালালে শহিদ হন অনেকে। তাঁদের স্মৃতিকে অম্লান করে রাখার জন্য নির্মিত হয় শহিদ মিনার। প্রতি বছর ২১ ফেব্রুয়ারি আমরা শহিদ মিনারে যাই ফুল দিয়ে তাঁদের শ্রদ্ধা জানাতে। সেদিন ভাইয়ের রক্তে রাজপথ রঞ্জিত হয়েছিল বলে গেয়ে উঠি, ‘আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারি, আমি কি ভুলিতে পারি।’ দেশের শিক্ষিত মানুষের পাশাপাশি সব শ্রেণির মানুষ শ্রদ্ধা জানায় ভাষাশহিদদের। আমরা তাঁদের ঋণ কখনো ভুলব না।

মন্তব্য: ভাষাশহিদদের মহান আত্মত্যাগের কল্যাণেই অর্জিত হয়েছে মাতৃভাষা বাংলার অধিকার। তাঁদের রক্তের ঋণ কোনো দিন শোধ হওয়ার নয়।

২৩. আলো বলে, ‘অন্ধকার, তুই বড়ো কালো’

অন্ধকার বলে, 'ভাই, তাই তুমি আলো।'

মূলভাব: মানবজীবনে সর্বত্রই আলো–আঁধাররূপ সুখ–দুঃখের সমাবেশ দেখতে পাওয়া যায়। আলো এবং অন্ধকার পরস্পর বিপরীতধর্মী হলেও একে অপরের পরিপূরক। একটিকে বাদ দিয়ে অন্যটির অস্তিত্ব নিরর্থক।

সম্প্রসারিত ভাব: পৃথিবীতে আলো ও অন্ধকার উভয়ই আছে। যখন আলো প্রকাশিত হয়, তখন আমরা সকল বস্তুই দেখতে পাই। যখন অন্ধকার আসে, তখন ওই সকল বস্তু আমরা দেখতে পাই না। দিনের বেলায় সমস্ত জগতে আলো ছড়িয়ে পড়ে, তখন আমরা আমাদের পার্থিব কাজকর্ম করি এবং অবাধে গমনাগমন করি। রাতে আমরা বিশ্রাম নিই ও নিদ্রা যাই এবং দিবসের ক্লান্তি দূর করি। আল্লাহ্তায়ালা আলো ও অন্ধকার, রাত ও দিন– মঙ্গল ও উপকারের জন্যই সৃষ্টি করেছেন। আলো অন্ধকারকে বিদ্রূপ করে বলছে যে, সে এত কালো বলেই জগৎ নিরানন্দময়। অন্ধকার প্রত্যুত্তরে বলছে যে, অন্ধকার আছে বলেই আলো তার প্রকাশধর্ম লাভ করেছে এবং এত মর্যাদাপ্রাপ্ত হয়েছে। অন্ধকার না থাকলে আলো তার রশ্মি প্রকাশ করতে পারত না। দিনের বেলায় আমরা পরিশ্রম করে দেহে ক্লান্তি বোধ করি; কিন্তু রাত্রিকালে বিশ্রামের মধ্য দিয়ে সুপ্তশক্তি ও নবচেতনা ফিরে পাই। মানবজীবনেও আলো–আঁধারের মতো ভালো–মন্দ মিশে আছে। জীবন সবসময় সুখে আলোড়িত হয় না, দুঃখবেদনাও পাশাপাশি অবস্থান করে। পৃথিবীতে সুখের অস্তিত্ব আছে বলেই মানুষ দুঃখকে হাসিমুখে বরণ করে নিতে পারে। একটানা সুখ কখনো সুখের সবটুকু নির্যাস দিতে পারে না। জীবনে মৃত্যুর উপস্থিতি না থাকলে জীবন হতো মূল্যহীন। বিনাশের ভয় আছে বলেই মানুষ সৃষ্টিকে এত যত্ন করে, ভালোবাসে। অতএব অন্ধকার ও আলো, রাত ও দিন– উভয়ই সমভাবে প্রয়োজনীয়।

মন্তব্য : পরস্পরবিরোধী বৈশিষ্ট্যের অস্তিত্বের কারণেই প্রকৃতি হয়েছে শ্রীমন্ডিত–সুষমিত। পৃথিবীতে দুই বিপরীতধর্মী বৈশিষ্ট্যের একটিকে বাদ দিয়ে অন্যটির অস্তিত্ব কল্পনাতীত।

২৪. কাক কালো, পিক কালো, মিছে ভেদ খোঁজা।
বসন্ত যখন আসে, ভেদ যায় বোঝা।
অথবা,
কাক কোকিলের একই বর্ণ, স্বরে কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন।

মূলভাব: মানুষের বহিরঙ্গের রূপ দেখে সবসময় তার স্বভাবের পরিচয় বোঝা যায় না। মানুষের যথার্থ পরিচয় তার আচরণে ও ব্যক্তিত্বে। আচরণ ও ব্যক্তিত্বের মধ্যে যে সকল বৈশিষ্ট্য দেখা যাবে, তাই দিয়েই তাকে বিচার করতে হবে।

সম্প্রসারিত ভাব: অনেক সময় দুজন ব্যক্তির আপাত সাদৃশ্য দেখে মনে হতে পারে যে, দুজন ব্যক্তির মধ্যে বিশেষ পার্থক্য নেই; কিন্তু ঘনিষ্ঠভাবে মিশলে দেখা যাবে যে, তাদের চারিত্রিক– বৈশিষ্ট্য একরূপ নয়। মানুষের অন্তরের যথার্থ পরিচয়টি পাওয়া যাবে তার রুচি, রসবোধ ও সৌন্দর্যচেতনার মধ্য দিয়ে। আপাত দৃষ্টিতে বহিরঙ্গে কাক ও কোকিল দুটিই কৃষ্ণবর্ণ; অনেকটা একই প্রকার দেখতে। তাদের বাইরের চেহারা দেখে স্বতন্ত্র করে বোঝা যায় না। এমনকি কাকের বাসায় এসে কোকিল ডিম পেড়ে যায়; আর কোকিল শাবক না হওয়া পর্যন্ত কাকও তাদের পৃথক রূপ বুঝতে পারে না। কিন্তু বর্ণে ও আকারে সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হলেও তাদের স্বভাব–বৈশিষ্ট্য যে পৃথক তা বোঝা অসম্ভব নয়। বসন্ত সমাগমে প্রকৃতির দিকে দিকে যখন নবপত্র দলের বিকাশ হতে থাকে, তখন কোকিল আর চুপ করে থাকতে পারে না; তার কুহুরবে সমস্ত বাসন্তী–প্রকৃতি মুখরিত ও ধ্বনিময় হয়ে ওঠে। কাক কিন্তু এভাবে পঞ্চম স্বরে প্রকৃতির বর্ণালির সমারোহে সাড়া দেয় না– সে তখনও ময়লা–আবর্জনা ঘুঁটে নিতে ব্যস্ত থাকে। সমাজে কোনো কোনো ব্যক্তি সকল সময়েই কর্মব্যস্ততার ভাব দেখায়। তার ব্যস্ততার মধ্যে সুন্দরের উপাসনা নেই, রসবোধের পরিচয় নেই। মানুষের অন্তরের যথার্থ পরিচয়টি পাওয়া যায় তার রসবোধের মধ্যে। সুন্দরকে সবাই সমভাবে আবাহন করতে পারে না, উপভোগও করতে পারে না। সুন্দরের স্পর্শে যার হৃদয় আন্দোলিত হয় না, রসবোধের আলোকে যার চিত্ত উদ্দীপিত হয় না; প্রকৃতির রূপ, রস, বর্ণ, গন্ধ যার কাছে কোনো তাৎপর্য বহন করে আনে না– সে ব্যক্তি যতই কর্মব্যস্ত হোক না কেন, কাকের মতোই হতভাগ্য সে। কাকের সৌন্দর্যচেতনা নেই বলেই প্রকৃতির সকল ঋতুতেই তার সমান আচরণ। কিন্তু কোকিল সুন্দরের উপাসক, তাই অজস্র প্রলাপে সে বসন্তের কুঞ্জবনকে মুখর করে তোলে। কাজের মধ্যেও যে সৌন্দর্যচেনার বিকাশ, রসবোধের প্রকাশ– তাতেই কাজের সার্থকতা।

মন্তব্য : যিনি প্রকৃত রসিক, সুন্দরের সামগ্রী তার কাছে আনন্দের সংবাদ বহন করে আনে এবং তার অন্তরের কবি–সত্তা জাগ্রত হয়ে ওঠে। এই কবিকে, এই রসিক ব্যক্তিকে বাইরে থেকে চেনার কোনো উপায় নেই; সুন্দরের আহ্বানে যখন তারা ধরা দেন, তখনি তাদের স্বরূপ আমাদের কাছে প্রতীয়মান হয়।

২৫. আপনারে বড় বলে বড় সেই নয়,
লোকে যারে বড় বলে বড় সেই হয়।

মূলভাব: প্রকৃত গুণী ও জ্ঞানী মানুষরা কখনো আত্মপ্রচারে লিপ্ত হয় না; বরং যাদের কোনো গুণ নেই তারাই নিজেকে বড়ো করে তোলার জন্য অপপ্রচার চালায়।

সম্প্রসারিত ভাব: প্রত্যেক মানুষের ভেতরই বড়ো হওয়ার আকাঙ্ক্ষা থাকে। এখানে বড়ো বলতে মূলত স্মরণীয়–বরণীয় হবার ইচ্ছেকেই বোঝানো হয়েছে। বড়ো হওয়ার প্রথম শর্তই হলো মানুষকে ভালোবাসা এবং মানুষের ভালোবাসা পাওয়া। তুমি বড়ো হলে অন্য লোকেরাই তোমার প্রশংসা করবে, তোমার নিজের আত্মজাহিরের কোনো প্রয়োজন নেই। নিজেকে বড়ো মনে করার মধ্যে কোনো গৌরব নেই; বরং উত্তম কাজের মাধ্যমে মানুষের হৃদয় জয় করা সম্ভব। যারা অহংকারী তারা নিজের সম্পর্কে গর্ববোধ করে, নিজের আত্মপ্রচারে লিপ্ত হয়। ভালো মানুষের এই বৈশিষ্ট্য হওয়া উচিত নয়। আসল হীরার মূল্যায়নের জন্য প্রচারের প্রয়োজন পড়ে না। পৃথিবীর মহান ব্যক্তিদের জীবনীও এ সত্যেরই প্রকাশক। হযরত মুহম্মদ (সা.), গৌতম বুদ্ধ, যিশুখ্রিষ্ট প্রমুখ ব্যক্তিদের জীবন বিশ্লেষণে দেখা যায়, তাঁরা আত্মপ্রচার করেননি, নিজেদের বড়ো বলে প্রমাণ করেননি; বরং লোকের মুখেই তাঁদের শ্রেষ্ঠত্ব চারি হয়েছে। ছোটো–বড়ো, উঁচু–নিচু নিয়েই সংসার। এক শ্রেণির লোক আছে যারা নিজেদের বড়ো ও মহৎ বলে জাহির করে। কিন্তু মহৎ লোকেরা নিজেদের বড়ো বলে জাহির করার কোনো দরকার মনে করেন না। কেননা পৃথিবী চিরদিনই বড়ো ও মহৎ লোকের গুণগরিমা প্রকাশে অকৃপণ। কর্মের দ্বারা, ত্যাগের দ্বারা, মহত্ত্বের দ্বারা যাঁরা দেশের ও দশের উপকার সাধন করে থাকেন, তাদের প্রশংসায় লাখো মানুষ সোচ্চার হয়ে ওঠে। সত্যিকারের জ্ঞানী–গুণী ও বিদ্বানের আত্মপ্রচারের প্রয়োজন হয় না এবং তাঁরা তা পছন্দও করেন না। কর্ম সম্পাদনেই তাঁদের সুখ, আত্মত্যাগেই তাঁদের পরম শান্তি।

মন্তব্য : কেবল স্বার্থপর ব্যক্তিরাই মিথ্যা প্রচারের মোহে প্রলুব্ধ হয়; সত্যিকারের ত্যাগী ব্যক্তিরা আত্মপ্রচারে বিমুখ। এ কথা সর্বকালের, সর্বযুগের এবং সর্বদেশের মানুষের জন্যই সত্য। ভালো মানুষ নিজের মুখে প্রশংসা প্রচার করে না, অপরের মুখে নিজের প্রশংসা শোনেন।

SINCE 1993 NABARUN PUBLICATION

২৬. আমার একার আলো সে যে অন্ধকার
যদি না সবারে অংশ দিতে পারি তার।

[ব. বো. '১৩]

মূলভাব: আত্মকেন্দ্রিক সুখ–ভোগ, আনন্দ–উল্লাস প্রকৃত সুখ বা আনন্দ নয়। প্রকৃত সুখ হচ্ছে সুখী সমাজ গঠন করে সবার সুখে সুখী হওয়ার মধ্যে।

সম্প্রসারিত ভাব: পরিবার, সমাজ, প্রতিবেশ পরিবেশের সাথে অংশীদারিত্ব না থাকলে ব্যক্তিগত কোনো সাফল্যই প্রকৃত সাফল্য নয়। একটি ফুলে মালা হয় না, একটি গাছে বাগান হয় না, এক বিন্দু জলে ঝরনা হয় না, একটি তারার আলোয় আকাশ মনোরম হয়ে সাজে না। কাজেই যত ভালোই হোক, একজনের সাফল্যই প্রকৃত সাফল্য নয়। সবার সাফল্যই প্রকৃত সাফল্য। সবাই পেছনে পড়ে থাকলে দৌড়ে একা হয়ে গেলে সাফল্য ম্লান হয়। তাই নিজের সাফল্য, চিন্তা, চেতনা ও কল্যাণধর্মী মনোভাবের, জ্ঞানের ও শিক্ষার আলো সবার মধ্যে উৎকীর্ণ করাই প্রকৃত কাজ হওয়া উচিত। আত্মকেন্দ্রিকতা জীবনের জন্য পরিপূর্ণ সফলতা নয়। কারণ একার শক্তি যত বেশিই হোক, সমষ্টির চেয়ে বেশি নয়। কাজেই সমষ্টিকে বাদ দিয়ে বা পাশ কাটিয়ে খুব বেশি দূর যাওয়া যায় না। শুধু নিজের মধ্যে শিক্ষার আলো, সত্যের আলো, ন্যায়ের আলো জেলে রাখলেই হবে না, তাকে ছড়িয়ে দিতে হবে। তাহলে সমাজে ন্যায়, সত্য ও সুন্দর প্রতিষ্ঠা লাভ করবে। সমাজে ন্যায়, সত্য, সুন্দর প্রতিষ্ঠা লাভ মানে, সমস্ত মানুষের চেতনায় তা ছড়িয়ে দেওয়া, যত্ন দিয়ে গড়ে তোলা। সবার প্রাণে যদি আলোক শিখা জ্বলে তাহলে সে আলোয় জগৎ ভরে উঠবে। তখন অন্তরের আলোয় সারা পৃথিবী সুখ–শান্তিতে ভরে উঠবে; পৃথিবী থেকে সমস্ত অকল্যাণ–অসুন্দর দূর হবে; মানুষ পরস্পরে আলোর বন্ধনে, প্রেমের বন্ধনে, সুন্দরের বন্ধনে বাঁধা পড়বে। কাজেই আমাদের নিজের মহৎ গুণ, চেষ্টা, কর্ম যদি কিছু থেকে থাকে তবে তা নিয়ে মিথ্যা অহংকারে মত্ত না হয়ে, আত্মকেন্দ্রিক স্বার্থমগ্ন না হয়ে সকলকে তার ভাগ দিতে হবে।

মন্তব্য: সবাইকে নিয়ে সুন্দরের পথে এগিয়ে যেতে হবে। আমাদের জ্ঞানের আলো ছড়িয়ে যাবে জগতের সমস্ত অন্ধকারকে দূর করার নিমিত্তে।

২৭. কালো আর ধলো বাহিরে কেবল
ভিতরে সবারই সমান রাঙা।

মূলভাব: সমগ্র পৃথিবীর মানুষ এক মানবজাতির সদস্য। তাদের অভিন্ন ধমনিতে লাল রক্ত প্রবাহিত হচ্ছে।

সম্প্রসারিত ভাব: সারা পৃথিবীজুড়ে অস্থিরতা চলছে। জাতিতে–জাতিতে বিদ্বেষ, ধর্মে–ধর্মে সংঘাত, বর্ণ–গোত্রের বিচার এখনো পরস্পরকে দূরে সরিয়ে রাখছে। সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ জীব মানুষ নিজের অস্তিত্ব ভুলে দ্বন্দ্ব–সংঘাত আর যুদ্ধ–বিগ্রহে লিপ্ত হচ্ছে। বস্তুত সবাই এক আদমের সন্তান। অথচ আমাদের মধ্যে বহুবিধ বিভক্তি। সাদা চামড়াওয়ালারা কালো মানুষদের ঘৃণা করছে। ধনী এবং এবং অভিজাত শ্রেণির মানুষেরা বিত্তহীন মানুষদের প্রতি ঘৃণা প্রদর্শন করছে। ধর্মীয় উন্মাদনায় আক্রান্ত হয়ে এক মানুষ অবলীলায় অন্য মানুষের প্রাণ হরণ করছে। সাম্রাজ্যবাদী রাজশক্তি নিজের ক্ষমতা বাড়াতে আধুনিক মারণাস্ত্রের ব্যবহার করছে। শোষিত, বঞ্চিত মানুষের রোনাজারিতে পৃথিবীর বাতাস ভারী হচ্ছে। একদিকে দারিদ্র্যপীড়িত মানুষ ভাগ্যকে সম্বল করে অনাহারে বেঁচে আছে। অন্যদিকে ঐশ্বর্যশালীরা তাদের বিত্ত ও বৈভবের মাত্রা প্রতিনিয়ত বাড়িয়ে চলেছে। মানবতা আজ ধুলায় লুণ্ঠিত। বিচারের বাণী নীরবে নিভৃতে কাঁদে। সম্পদের সুষম বণ্টনের অভাবে পৃথিবীর এক অংশের মানুষ ক্ষুধা, দারিদ্র্য ও অপুষ্টির শিকার হচ্ছে। আরেক অংশের মানুষ সম্পদের মালিক হয়ে বঞ্চিত মানুষের ওপর প্রভুত্ব চালাচ্ছে, অসহায় মানুষের কথা তারা চিন্তা করছে না। এসব নিগৃহীত মানুষ তাদের মতোই রক্তমাংসের মানুষ– এ কথা তারা মনে করছে না।

মন্তব্য : ধনী–দরিদ্র, জাতি–ধর্ম, বর্ণ–গোত্র এবং উচ্চ–নিচের ভেদাভেদ ভুলে গিয়ে পৃথিবীর প্রতিটি মানুষ যদি একে অপরকে আপন করত, তাহলে এ পৃথিবী স্বর্গ হয়ে উঠত।

২৮. ক্ষুধার রাজ্যে পৃথিবী গদ্যময়
পূর্ণিমার চাঁদ যেন ঝলসানো রুটি। *[কু. বো. '০৯; রা. বো., ব. বো. '১১; য. বো. '১৫]*

মূলভাব: ক্ষুধার্ত ব্যক্তির কাছে পৃথিবীর সবকিছু তুচ্ছ। সৌন্দর্য, ভালোবাসা, অনুভূতি কোনো কিছুর মূল্য নেই তার কাছে। খাদ্য ছাড়া কোনো মানুষ বাঁচতে পারে না। প্রত্যেক মানুষের জন্য খাদ্য মৌলিক প্রয়োজন।

সম্প্রসারিত ভাব: মানুষ জীবিকানির্বাহের জন্য দিনরাত কাজ করে। যদি কেউ তার ক্ষুধা নিবৃত্ত করতে ব্যর্থ হয়, তাহলে যেকোনো নিচু কাজ করতে বাধ্য হবে। যে ব্যক্তি ক্ষুধার্ত থাকে তার কাছে নৈতিক উপদেশ, দর্শনের কোনো মূল্য নেই। এটা স্বাভাবিক যে, ক্ষুধার্ত মানুষ সবসময়ই রাগী এবং সামান্য উপলক্ষ্যে বিদ্রোহ করতে পারে। ভালোবাসা, সহানুভূতি অথবা তোষামোদি কোনো কিছুই তাকে বশ করতে পারে না। কোনো উপদেশ অথবা যুক্তিবাক্য তাকে শান্ত করতে পারে না। সে আমাদের সমাজব্যবস্থা ধ্বংস করতে পারে। ইংরেজিতে একটি প্রবাদ আছে, "A hungry man is an angry man." পেটে ক্ষুধা থাকলে বাইরের জগতের সৌন্দর্য তার কাছে অর্থহীন ও উপহাসব্যঞ্জক। যার অভাব নেই, অন্নচিন্তা নেই, ঐশ্বর্য আর সচ্ছলতায় যার জীবন নির্বিঘ্ন, তার কাছে আকাশের চাঁদ, ফুল, পাখি, নদী নানা কল্পিতরূপে ফুটে ওঠে। সুখী মানুষের কাছে পৃথিবী তাই কাব্যময়। অন্যদিকে রূঢ় বাস্তবের আঘাতে যাদের জীবন বিপন্ন, দু মুঠো অন্ন সংস্থাপনের জন্য যাদের জীবন বিপর্যস্ত, তাদের কাছে পৃথিবী অত্যন্ত কর্কশ ও কঠিন। তাই আকাশের চাঁদ দেখে তাদের কখনো মনে পড়ে না প্রিয়ার মুখচ্ছবি, অত্যন্ত স্বাভাবিকভাবেই জঠরের জ্বালায় তখন তাদের মনে পড়ে চাঁদের মতো গোল একখানা রুটি। কেননা রুটি ক্ষুধা নিবৃত্তি করে। তাই তার রুটির ভাবনায় পদ্য রচনার মতো স্পৃহা থাকে না। ক্ষুধা লাগলে মানুষ আত্মমর্যাদা ভুলে যায়। নির্দ্বিধায় একজনের কাছ থেকে ছিনতাই করে কিছু আহারের ব্যবস্থা করে। তাই বলা যায়, 'Hunger is the best sauce.' ক্ষুধার্ত ব্যক্তি যেদিকেই তাকাবে, তার কেবল খাদ্যের কথাই মনে পড়বে। তার কাছে সবকিছুই মূল্যহীন– কেবল খাদ্য ব্যতীত।

মন্তব্য: যে মানুষ ক্ষুধাতুর তার মনে প্রকৃতির সৌন্দর্য কোনো অনুভূতি সৃষ্টি করতে পারে না। জীবনে ক্ষুধাকে যে জয় করতে পারবে তার জীবনই হয়ে উঠবে সুন্দর এবং বাস্তবতায় পরিপূর্ণ।

২৯. গতিই জীবন, স্থিতিতে মৃত্যু। *[রা. বো. '০২; কু. বো. '১৭]*

মূলভাব: চলমানতার নামই হচ্ছে জীবন। চলমানতাই জীবনকে স্বতঃস্ফূর্ত করে তোলে, আর স্থবিরতা মৃত্যুরই নামান্তর। এই জীবজগৎ চলমান, স্থিতিশীল নয়। মহাকালের গতি সেদিনই থামবে যেদিন মহাপ্রলয় ঘটবে। থেমে যাবে আমাদের জীবন। কারণ আমাদের জীবনও এই গতিতে আবদ্ধ। নিষ্কর্মা ও অথর্ব মানুষ মৃততুল্য।

সম্প্রসারিত ভাব: জীবনে বেঁচে থাকার সংগ্রাম গতিশীলতার মধ্যেই ফুটে ওঠে। কর্মময় জীবনই প্রকৃত জীবন, কর্মের জন্যই মানুষ আদিম যুগের গুহার জীবন থেকে এই সভ্যতায় আসতে পেরেছে। জ্ঞানে–বিজ্ঞানে পৃথিবী উৎকর্ষতায় পূর্ণ হয়েছে। সংস্কৃতি, শিল্প, সাহিত্য মানুষকে মননশীল করে তুলেছে। এই গতিশীল জগতের পেছনে ছুটে বেড়ানোই মানুষের ধর্ম। আর তার জন্য প্রয়োজন কাজ। কর্মহীন মানুষ সমাজে বোঝা হয়ে পড়ে থাকে। তারা জীবিত থেকেও মৃত। কারণ তাদের আত্মার মৃত্যু হয়ে যায় আগেই। স্রোতহীন নদীতে যেমন শ্যাওলা জমে। শ্যাওলার কারণে নদীর পানি নষ্ট হয়ে যায়। আবার স্রোতঃস্বিনী নদীতে শ্যাওলা জমতে পারে না। তেমনি কর্মই হচ্ছে জীবন। কাজ না করলে জীবন থেমে যায়। পৃথিবী একটা যুদ্ধক্ষেত্র। এখানে প্রতিনিয়ত যুদ্ধ করে বেঁচে থাকতে হয়। কর্মবিমুখতা, অলসতা, গোঁড়ামি মৃত্যুর সমান। যারা কর্মময়, চিন্তাচেতনা যাদের সামনের দিকে, তারাই সৃষ্টি করে নতুন নতুন সভ্যতা। মানুষের কল্যাণের জন্য তারাই সৃষ্টি করে নতুন উপাদান। আর যারা কর্মহীন তারা জড়পদার্থের মতো অচল। এরা কখনো মানুষের কল্যাণের জন্য কিছু করতে পারে না। এরা অপরের উপকারে আসে না। এরা সমাজে উপেক্ষিত। নিজের যোগ্যতা প্রমাণের জন্য সংগ্রামে অগ্রসর হওয়াই প্রকৃত দায়িত্ব। যারা জীবনকে সংগ্রাম হিসেবে নিতে পারে না তারা জীবনের অর্থও খুঁজে পায় না।

মন্তব্য: জীবনের লক্ষ্যই হচ্ছে সামনের দিকে এগিয়ে যাওয়া। কাজই মানুষের জীবনে গতি আনে। যে গতিতে খুঁজে পাওয়া যায় প্রকৃত জীবনের অর্থ। অলস কিংবা অকর্মণ্য জীবনযাপন মৃত্যুরই নামান্তর।

৩০. চন্দ্র কহে, 'বিশ্বে আলো দিয়েছি ছড়ায়ে,
কলঙ্ক যা আছে তাহা আছে মোর গায়ে।'

মূলভাব: চাঁদের রুপালি আলোতে পৃথিবী আলোকিত হয়ে ওঠে। চাঁদ নিজের কলঙ্ক লুকিয়ে রেখে পৃথিবীকে কেবল আলোকিত করে যায়। সমাজে যারা মহৎ পরোপকারী ব্যক্তি তাঁরাও চাঁদের মতো নিজের দুঃখ, কষ্ট, যন্ত্রণা লুকিয়ে রেখে বিশ্বমানবের সেবা করে যান নিরন্তর।

সম্প্রসারিত ভাব: প্রকৃতির এক অনিন্দ্যসুন্দর উপহার হচ্ছে চাঁদ। যা পৃথিবীর মানুষের নিকট বহু আকাঙ্ক্ষিত এবং কল্পনাময়ী। কল্পিত, বিস্মিত চোখে মানুষ কেবল চাঁদকে দেখে। এই চাঁদ নিয়ে মানুষের ভাবনার অন্ত নেই, কৌতূহলেরও শেষ নেই। মানুষ শুধু দেখে এক থালা আলো, যে আলোতে সারা পৃথিবী এক মোহময় রূপে পরিণত হয়। এই চাঁদের বুকে নবযৌবনার মতো যেমন রয়েছে আলোর ঝলক, তেমনি কলঙ্কের দাগ। কিন্তু এই চাঁদ নিজের কলঙ্ককে যথাসম্ভব ঢেকে রেখে স্নিগ্ধ, শুভ্রতা ছড়িয়ে পৃথিবীকে দেয় রাশি রাশি আলো, যা দিয়ে ঘুচে যায় পৃথিবীর মালিন্যের অন্ধকার। সৌন্দর্যে খলখল করে ওঠে পৃথিবী। পৃথিবীর মহৎ মনীষীরাও তেমনি। ব্যক্তিগত জীবনে তাঁরা অপরিসীম দুঃখ, কষ্ট, ক্লেশ ভোগ করেন, অপমান সহ্য করেন। কিন্তু সবকিছু তাঁরা নিজেই সহ্য করেন। অপরকে বিন্দুমাত্র আঁচ লাগতে দেন না। তাঁরা তাদের স্বকীয় গুণাবলি দিয়ে সেসব দুঃখ, কষ্ট, ব্যথা, বেদনা আড়াল করে রাখেন। আন্তরিক মমতা দিয়ে অন্যের দুঃখ দূর করার চেষ্টা করেন। জীবনের ঝুঁকি নিতেও দ্বিধা করেন না। তাঁরাই দূর করেন অজ্ঞানতার অন্ধকার, পৃথিবীতে ছড়িয়ে দেন আলো। এঁরা নিজেদের মহৎ সাধনায় বিশ্বজনকে অনুপ্রাণিত করেন। নিজেদের হৃদয়ের বিশালতা দিয়ে মুছে দেন সংকীর্ণতা, ক্ষুদ্রতা ও মলিনতা। সভ্যতার ইতিহাসে হযরত মুহম্মদ (সা.), শ্রীকৃষ্ণ, বুদ্ধদেব, যিশু, চৈতন্যদেব প্রমুখ মনীষীগণ এর উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। তাঁরা সকলেই নিজেদের কষ্ট বুকে লুকিয়ে রেখে অন্যের জন্য ভেবেছেন। তাঁরা নিঃস্বার্থ আত্মদানের মাঝেই প্রকৃত সুখ খুঁজে পান। তাঁরা জীবনে অনেক দুঃখ দহনে জর্জরিত হয়েছেন। কিন্তু সেই দুঃখকে আবার জয়ও করেছেন হাসিমুখে। তাঁরা তাদের কালজয়ী চিন্তাচেতনা দিয়ে নব নব সৃষ্টির মাধ্যমে মানুষের জীবন করে তুলেছেন আনন্দময়।

মন্তব্য: মহামানবদের এই কষ্টের অবদানেই পৃথিবীতে খুলে গেছে নতুন সম্ভাবনার দুয়ার। পৃথিবী দেখেছে আলোর পথ। তাঁদের অনুসরণ করাই জীবনে সার্থকতা লাভ। তাঁরাই আলোর দিশারি।

৩১. চরিত্রই বল।

অথবা, চরিত্র জীবনের অমূল্য সম্পদ।

অথবা, চরিত্রেই মানুষের পরিচয়।

মূলভাব: চরিত্র মানবজীবনের সবচেয়ে মূল্যবান সম্পদ। চরিত্রহীন মানুষকে পশুর সঙ্গে তুলনা করা হয়। যার চরিত্র নেই, পৃথিবীতে তার কোনো মূল্য নেই।

সম্প্রসারিত ভাব : চরিত্র মানে কাজে-কর্মে, কথায়-চিন্তায় একটি পবিত্র ভাব। মানুষের যত প্রকার অলংকার আছে তন্মধ্যে চরিত্র প্রধান। 'চরিত্র' বললে কেবল যে শুধু সচ্চরিত্রকে বোঝায় তা নয়, কোনো মানুষের ব্যক্তিত্ব, সততা, নিয়মানুবর্তিতা, নীতিবোধ, ন্যায়পরায়ণতা এসবকেও বোঝায়। এই মিলিত উপাদানগুলো থাকলে সমাজে সে ব্যক্তি আদর্শ চরিত্রের মানুষ বলে পরিচিত হবেন। চরিত্রবান ব্যক্তি সত্যসন্ধ ও জিতেন্দ্রিয় হবেন। ইংরেজিতে একটি কথা আছে- "When money is lost, nothing is lost, when health is lost, something is lost, when character is lost, everything is lost. "কোনো মানুষের ধন-সম্পদ, গাড়ি-বাড়ি, শিক্ষাগত যোগ্যতা সবকিছুই মূল্যহীন হয়ে পড়ে যদি সে লোকের চরিত্র না থাকে। অন্যদিকে চরিত্রবান মানুষ সবার শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা অর্জন করতে পারে। ছেলেবেলা হতে কঠোর নিয়মানুবর্তিতার মধ্যে লালিত হওয়ার কারণে দরিদ্র বালক ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর উত্তরকালে মানুষের মতো মানুষ হয়েছিলেন। এর মূলে ছিল তাঁর নির্মল চরিত্র। অর্থ নয়, পদমর্যাদা নয়, ক্ষমতা নয়— কেবল সুদৃঢ় চরিত্রবলের ওপর নির্ভর করে তিনি তৎকালে সাহিত্য ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে, শিক্ষা প্রচারে এবং সমাজ-সংস্কারের ক্ষেত্রে এক বৈপ্লবিক পরিবর্তন সাধন করেছিলেন। চরিত্রবলের জন্যই তিনি আজ প্রাতঃস্মরণীয় মহাপুরুষ হিসেবে সম্মানিত। বস্তুত, মানুষ হিসেবে তাঁর তুলনা নেই।

মন্তব্য : প্রকৃতপক্ষে মানুষকে চেনা যায় তার ব্যক্তিত্বের গুণে, মনুষ্যত্ববোধের দীপ্তির জন্য। বলা দরকার যে, এসবের যোগফল হলো চরিত্র। আসলে চরিত্র হলো ঠিক যেন ইস্পাতের মতো ধারালো এক শক্তি। এ চরিত্র কোনো একজন মানুষকে 'মানুষ' হিসেবে চেনার প্রধান উপায়। চরিত্র মানবজীবনের মুকুটস্বরূপ। চরিত্রবলেই মানুষ সুন্দর ও সার্থক হয়ে ওঠে।

৩২. জগৎ জুড়িয়া এক জাতি আছে সে জাতির নাম মানুষ জাতি, একই পৃথিবীর স্তন্যে লালিত, একই রবি-শশী মোদের সাথী।

[সি. বো. '০৩; চ. বো. '১৫]

মূলভাব: সমগ্র পৃথিবীতে যেখানে যত মানুষের অস্তিত্ব ও অবস্থান আছে, তাদের সকলেই একটিমাত্র জাতি এবং অবিসংবাদিতভাবে সে জাতিটির নাম মানুষ জাতি।

সম্প্রসারিত ভাব: এ সুজলা-সুফলা শস্য-শ্যামলা বসুন্ধরার বুকেই মানুষ সমভাবে লালিতপালিত এবং সকলের জীবনদাতা একই। একই গুণ ও স্নিগ্ধ শীতল কিরণ-প্রদাতা চন্দ্র তাদের সমভাবে আলোকদানের মাধ্যমে সহাবস্থান করে। কিন্তু মানুষ অনেক সময় তা ভুলে যায়। ধর্ম, বর্ণ, ভৌগোলিক অঞ্চল ও বিত্তের ব্যবধান দ্বারা মানুষ বিভক্ত হয়ে যায় এবং সংকীর্ণ ও সাম্প্রদায়িক আচরণ করে। পৃথিবীতে ইংরেজ, মুসলমান, হিন্দু, বৌদ্ধ, জৈন, শিখ নামে বিভিন্ন ধর্ম, বর্ণ, গোত্র ও সম্প্রদায়ের লোক থাকলেও আসলে আমরা সকলেই মানবজাতি। আমাদের সভ্যতার নাম মানবসভ্যতা। মরমি কবি লালন ফকির যেমন জাতের বা জাতির কোনো রূপ দেখেননি তেমনি যারা বিশ্ব মানবতাবাদে বিশ্বাসী সেই জাতির নাম হচ্ছে মানবজাতি। এ পৃথিবীতে বিভিন্ন ধর্মের-গোত্রের-ভাষার ও বর্ণের লোক বাস করে। ধর্মের গন্ডিতে তারা নিজ নিজ ধর্মের অনুসারী হলেও সকলের মধ্যে একটা মানবতাবোধ আছে তাই আমরা মনুষ্য জাতি। প্রকৃতির রাজ্যে মানুষের শ্রেষ্ঠত্ব অবিসংবাদিত। প্রকৃতির সন্তান এ মানুষ তার সাধনা, জ্ঞান, মেধা ও মনন দিয়ে শ্রেষ্ঠত্বের আসন অর্জন করেছে। প্রকৃতির রাজ্যে আমরা একই উপাদানে গঠিত। একই পৃথিবীতে, একই আকাশের নিচে মাটির আঙিনায়, একই চন্দ্র সূর্যের আলোয় আমরা বাঁচি। সুখ-দুঃখ, আনন্দ ও অনুভূতি একই রকম। এখানে ধর্মে ধর্মে, গোত্রে গোত্রে, সমাজে সমাজে যে বিরোধ আছে তার বিরুদ্ধে জ্ঞানী-গুণী ব্যক্তিরা চিরকাল রুখে দাঁড়িয়েছেন, তাঁরা নানাভাবে শুনিয়েছেন মহামিলনের বাণী। বিভেদ ও অসাম্যের অবসান ঘটিয়ে মান্য মানুষকে শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য আহ্বান জানিয়েছেন।

মন্তব্য: আজও আমাদের দেশে মানবতার জয়গান গাওয়া হয়। বিশ্বের সকল মানুষ আমরা একে অন্যের ভাই, এ কথা যেন আমরা ভুলে না যাই।

SINCE-1993 NABARUN PUBLICATION

৩৩. জন্ম হোক যথা তথা কর্ম হোক ভালো।
অথবা, নহে আশরাফ আছে যার শুধু বংশ পরিচয়,
সেই আশরাফ জীবন যাহার পুণ্য কর্মময়।

মূলভাব: আভিজাত্যে বা বংশ পরিচয়ে মানুষের মর্যাদা বাড়ে না। মহৎ গুণাবলির জন্যই প্রকৃত মানুষ হিসেবে স্বীকৃত হয়।

সম্প্রসারিত ভাব: জন্মের ক্ষেত্রে মানুষের নিজের কোনো ভূমিকা থাকে না। ধনী বা দরিদ্র পরিবারে জন্ম হওয়াটা মানুষের নিজের ইচ্ছা বা কর্মের ওপর নির্ভরশীল নয়। কিন্তু কর্মজীবনে তার ভূমিকা ও অবদানের দায় তার নিজের ওপর বর্তায়। তাই প্রকৃত বিচারে বংশ পরিচয় তেমন গুরুত্ব বহন করে না। বরং কর্মে অবদানের মাধ্যমেই মানুষ পায় মর্যাদার আসন, হয় স্মরণীয় ও বরণীয়। আশরাফ বা অভিজাত বলে অনেকে বংশগৌরব বড়ো করে দেখে কিন্তু কাজ–কর্মে যদি কোনো গুণ প্রকাশ না পায়, তবে সে বংশগৌরবের কোনো অর্থ নেই। জন্ম কোথায় হলো তা দেখার বিষয় নয়। অভিজাত বংশে জন্মগ্রহণ করেও যদি কেউ অপকর্মে লিপ্ত থাকে, তবে কেউ তাকে শ্রদ্ধা করবে না। অপরপক্ষে, একজন লোক নিচকুলে জন্মগ্রহণ করেও তার কর্তব্য, কর্ম ও চারিত্রিক আদর্শের জন্য সকলের অকুণ্ঠ শ্রদ্ধা অর্জন করতে পারে। দেশের কাছে, দশের কাছে এবং সৃষ্টিকর্তার কাছে কোনো একজন মানুষের কর্মই হলো তার বড়ো পরিচয়। সরোবরের শ্যাওলা অপেক্ষা গোবরে পদ্মফুলের মর্যাদা অনেক বেশি। মুসলিম জাহানের সর্বপ্রথম মুয়াজ্জিন হজরত বেলাল (রা.) একজন ক্রীতদাসের সন্তান হয়েও নিজ কর্মের মাধ্যমে সকলের অকুণ্ঠ শ্রদ্ধা অর্জন করতে পেরেছিলেন। গরিব ঘরে জন্ম নিয়েও ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর আজও বিশ্বনন্দিত। শেষ বিচারের দিন আল্লাহ কারো বংশ দেখবেন না, দেখবেন তার কর্ম।

মন্তব্য: বংশ পরিচয় মানুষের জীবনকে মহিমান্বিত করে না। তাই কর্মের গুণেই মানুষ গুণান্বিত হয়।

৩৪. জন্মিলে মরিতে হবে অমর কে কোথা কবে
চিরস্থির কবে নীর হয় রে জীবননদে?

মূলভাব: মৃত্যু মানুষের অনিবার্য নিয়তি। এর থেকে পরিত্রাণের কোনো পথ নেই। মৃত্যু আছে বলেই জীবন এত বৈচিত্র্যময়।

সম্প্রসারিত ভাব: মানুষ চিরঞ্জীব নয়। একদিন সবাইকে মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করতেই হবে। মৃত্যুকে ঠেকিয়ে রাখার কোনো উপায় আজ পর্যন্ত আবিষ্কৃত হয়নি। তাই মৃত্যু অনিবার্য ও শাশ্বত বিধান। প্রকৃতির এই বিধি না মেনে কোনো উপায় নেই। মানবজীবন নদীর জলের মতো। নদীর জোয়ার–ভাটার মতো মানবজীবনেও হাসি–কান্না, সুখ–দুঃখ, উত্থান–পতন আবশ্যিকভাবে বিদ্যমান। এই পরস্পরবিরোধী জাগতিক নিয়মের বশবর্তী হয়েই মানুষ জীবন অতিবাহিত করে। নদীর জল যেমন কখনো স্থির থাকে না, তেমনি মানুষের জীবনও স্থির নয়। জন্ম দিয়ে মানুষের জীবনের শুরু আর মৃত্যুতে তার পরিসমাপ্তি। তাই মৃত্যুকে ভয় পাওয়ার কিছু নেই। শাশ্বত এ সত্যকে ইতিবাচকভাবে নিতে হবে। মৃত্যুকে এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা না করে কর্ম দিয়ে মৃত্যুকে জয় করতে হবে। কেননা মানুষের দেহ নশ্বর হলেও কর্ম অবিনশ্বর। কর্ম মানুষকে পৃথিবীতে অমর করে রাখে। তাই মৃত্যুকে আলিঙ্গন করতে হবে সানন্দে।

মন্তব্য: প্রতিটি জীবকেই একদিন মৃত্যুকে বরণ করে নিতে হবে। তাই মৃত্যুভয়ে ভীত না হয়ে মৃত্যুর পরও অমর হয়ে থাকার সাধনায় জীবনকে কাজে লাগাতে হবে।

৩৫. জাতীয় জীবনে সন্তোষ এবং আকাঙ্ক্ষা দুয়েরই মাত্রা বাড়িয়া গেলে বিনাশের কারণ ঘটে।

[রা. বো. '১১, '০৮]

মূলভাব: আকাঙ্ক্ষা এবং সন্তোষ একে অপরের পরিপূরক। আকাঙ্ক্ষা বলতে চাহিদা বা অভাবকে বোঝায়। চাহিদা বা অভাব মিটে গেলে সন্তুষ্টি আসে। একটি আকাঙ্ক্ষার নিবৃত্তি হলে আরেকটি আকাঙ্ক্ষার সৃষ্টি হয়। কিন্তু সন্তুষ্টি সবসময়ই আসবে এমন নিশ্চয়তা দেওয়া যায় না।

সম্প্রসারিত ভাব: সবকিছুরই পরিমিতিবোধ থাকা দরকার। কেননা সামর্থ্যের সাথে আকাঙ্ক্ষা নিবৃত্তির একটি সম্পর্ক আছে। আকাঙ্ক্ষা একাধিক থাকতে পারে, কিন্তু সামর্থ্য না থাকলে তা মেটানো সম্ভব নয়। কাজেই সামর্থ্যের কথা ভেবেই আকাঙ্ক্ষা বৃদ্ধির প্রবণতা পরিহার করতে হবে। ব্যক্তি, সমাজ তথা জাতীয় জীবনে আকাঙ্ক্ষার শেষ নেই। সময়ে আকাঙ্ক্ষা নিবৃত্তির সুযোগ থাকে। কিন্তু একের পর এক আকাঙ্ক্ষার কথা উত্থাপিত হলে তা মেটানোর জন্য মানুষ ঘুস, দুর্নীতি, অন্যায় ও অনৈতিক

কার্যকলাপে জড়িয়ে পড়ে। এতে সমাজ তথা জাতীয় জীবনে বিপর্যয়ের সৃষ্টি হয়। উন্নয়ন কার্মকাণ্ড মারাত্মকভাবে ব্যাহত হয়। ফলে জাতীয় জীবনে জিডিপির মাত্রা কাঙ্ক্ষিত পর্যায়ে উন্নীত হতে পারে না। এর ক্ষতিকর প্রভাব পড়ে সর্বত্র।একইভাবে জাতীয় জীবনে সন্তোষ বেড়ে গেলে বিপর্যয় নেমে আসে। কেননা জাতি হিসেবে আমরা যতটা কর্মঠ ও সংগ্রামী, ততটাই অলস ও অকর্মণ্য। অসন্তোষ আমাদের মনে তৃপ্তি এনে দেয়। এ তৃপ্তি নতুন উদ্দীপনা সৃষ্টি করলে খুবই ভালো। কিন্তু তা না হলে অধিক সন্তুষ্টি সমাজ তথা জাতীয় জীবনকে অলস, অকর্মণ্য ও পঙ্গু করে দিতে পারে; যা সৃষ্টি করতে পারে ভয়ানক বিপর্যয়। এতে সমস্ত উন্নতি ও অগ্রগতি যেমন বিপন্ন হবে, তেমনি জাতি ক্রমশ পৌছাবে ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে। আকাঙ্ক্ষা এবং সন্তোষের সমতাবিধান অত্যাবশ্যক। এ সমতা সম্পদ ও চাহিদার সাথে, এ সমতা আর্থিক সামর্থ্য ও আকাঙ্ক্ষার সাথে। আমাদের সচেতন থাকতে হবে আকাঙ্ক্ষার পর্যায় যেন সামর্থ্যের সীমা অতিক্রম না করে। কারণ এর সাথে জাতির উন্নতি ও অগ্রগতির বিষয়টা অগ্রগণ্য। আবার অধিক সন্তুষ্টি যেন জাতিকে উলটো দিকে টেনে না নিয়ে যায় সেদিকেও লক্ষ রাখতে হবে।

মন্তব্য : নতুন প্রাণশক্তি ও উদ্দীপনা জাতিকে বেশি সেবা দিতে আগ্রহী করে তুলে। তা হলেই সমস্ত দুর্নীতি ও অনৈতিক কার্যকলাপের ঊর্ধ্বে উঠে এসে আমরা মর্যাদাশীল জাতি হিসেবে বিশ্বে প্রতিষ্ঠা লাভ করতে সক্ষম হব।

৩৬. জাল কহে, 'পঙ্ক আমি উঠাব না আর।'
জেলে কহে, 'মাছ তবে পাওয়া হবে ভার।'

[কু. বো. '০৮]

মূলভাব: সাধনা ছাড়া জীবনে কোনো কিছুরই সফলতা আশা করা ঠিক নয়। উদ্দেশ্য সফল করতে হলে সাধনার প্রয়োজন।
সম্প্রসারিত ভাব: মাছ পানির নিচে বাস করে। মাছ ধরার জন্য জেলে পানির নিচে জাল ফেলে টানতে থাকলে কাদামাটির সঙ্গে মাছ ডাঙায় উঠে আসে। কাদামাটি থেকে মাছ তুলতে জেলেকে অনেক পরিশ্রম করতে হয়। কিন্তু কষ্ট না করলে কোনো কাজে সফলতা অর্জন হয় না। পানি হতে মাছ ধরা কষ্টকর; পানির বাধা, পাঁকের বোঝাকে অতিক্রম করে মাছ ধরা সম্ভবপর হয়। মহৎ সাফল্য সাধনাসাপেক্ষ। সুখ লাভ করতে হলে, কষ্টকে বরণ করে নিতে হয়। এ পৃথিবীতে মানুষকে কাজ করে বেঁচে থাকতে হয়। অস্তিত্বের সংগ্রামে লিপ্ত মানুষ বেঁচে থাকার প্রয়োজনে কাজ করে যায়। জড়তা জীবন নয়, চলমানতাই জীবন। এর ফলেই জীবনের গতি সঞ্চার হয়। পঙ্ক নির্মূল করতে না পারলে যেমন মাছ পাওয়া যায় না, তেমনি পরিশ্রম ছাড়া কোনো ফল আশা করা সম্ভব নয়। এ জীবনে বহু ঘাত–প্রতিঘাত, চড়াই–উতরাই আছে। হাসিমুখে আমাদের তা বরণ করে নিতে হবে। কাজের মধ্য দিয়েই পাড়ি দিতে হবে বন্ধুর পথ। দুঃখ, জ্বালা–যন্ত্রণার ভয়ে কেউ যদি অগ্রগমনে গতি হারায়, তাহলে জীবনযুদ্ধে বিজয়ী হওয়া কঠিন। বিজয়ী না হলে আকাঙ্ক্ষিত ফল লাভ করতে পারে না। যদি করে তবে তা বাতুলতা মাত্র। তেমনি সংসারে সফলতা লাভের আকাঙ্ক্ষায় অবশ্যই পরিশ্রম ও সাধনা করা অত্যাবশ্যক, তাকে জেলের মতোই দুঃখ–কষ্টরূপ পঙ্ক নির্মূল করতে হবে।
মন্তব্য : পঙ্ক নির্মূল না করতে পারলে মাছ পাওয়া যাবে না, বিনা পরিশ্রমে ফল লাভ করা যায় না। তাই বলা যায়, "কষ্ট না করলে কেষ্ট মেলে না।"

৩৭. জীবে প্রেম করে যেই জন
সেই জন সেবিছে ঈশ্বর।

[য. বো. '০৪; সি. বো., চ. বো. '০৬;, রা. বো. '১০; কু. বো. '১০; ব. বো. '১৫]

মূলভাব: মানুষ সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ জীব। মানুষকে সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ জীব হিসেবে আখ্যায়িত করার একটি বিশেষ কারণ রয়েছে। তা হলো অপর জীবের প্রতি দয়া দেখানো।
সম্প্রসারিত ভাব: যে ব্যক্তি স্রষ্টার সৃষ্ট জীবের প্রতি দয়া–মায়া প্রদর্শন করে সে–ই স্রষ্টার শ্রেষ্ঠ সেবক। আমাদের জগৎটাই সৃষ্টি হয়েছে সকল প্রকার জীবের সহাবস্থান নিয়ে। প্রাণিকুলে একটি প্রাণী ছাড়া অন্য প্রাণীর জীবন সংকটপূর্ণ। তাই প্রাকৃতিক ভারসাম্য বজায় রাখতে হলে মানুষকে সকল প্রাণিকুলের সাথে সদ্ভাব বজায় রেখে চলতে হবে। জীবজগতে সকল প্রাণী এক ঈশ্বরের সৃষ্টি। অতি নগণ্য ক্ষুদ্র প্রাণীও ঈশ্বরের মহিমা প্রচার করছে। তাই সেই জীবের সেবা করা মানে ঈশ্বরের সেবা করা। পৃথিবীতে মানুষ বিভিন্নভাবে সৃষ্টিকর্তার উপাসনা করে থাকে। এ উদ্দেশ্যে মানুষ ঘর–বাড়ি ছেড়ে দিয়ে বন–জঙ্গল, পাহাড়–পর্বত বিভিন্ন জায়গায় স্রষ্টার সন্ধান করে বেড়ায়। কেউ কেউ ধর্মের জন্য বিশৃঙ্খলা, মারামারিও করে। সবাই নিজেদের উপাসনালয়ে যায়।

কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ঈশ্বর তুষ্ট হয় জীবের সেবা করলে। কারণ ঈশ্বরের সৃষ্টি হলো জীব। জীবের মাঝেই ঈশ্বরের উপস্থিতি। ঈশ্বরের সৃষ্টিকে যে ভালোবাসে, ঈশ্বরও তাকে ভালোবাসে। তাই ঈশ্বরের সেবা করতে হলে বৈরাগী হওয়ার প্রয়োজন নেই। সমাজ, পরিবার সকলের সাথে থেকেই ঈশ্বরের সেবা করা যায়। স্রষ্টার সৃষ্টিকে খুশি করতে পারলেই স্রষ্টা খুশি হয়। ইতিহাসের পাতায়ও এর প্রমাণ রয়েছে। হরপ্পা ও মহেনজোদারো দুটি নগর। এখানে মানুষের পাশাপাশি পশুপাখি রাখা হয়নি বলে ঈশ্বরও তাদের কৃপা করেনি। সেখানের মানুষ শুধু নিজেদের কথা চিন্তা করেছে অন্যান্য উদ্ভিদ ও প্রাণিকুলের কথা চিন্তা করেনি। প্রাকৃতিক ভারসাম্য বিনাশ করেছে বলেই ঈশ্বর তাদের কপা করেনি। আর তাই মানুষের কল্যাণের জন্য কাজ করা ও অন্যান্য জীবের প্রতি যত্নশীল হয়ে তাদের ভালোবাসাই হলো ঈশ্বরকে ভালোবাসা।

মন্তব্য: সৃষ্টিজগতের সৃষ্টির মধ্যে নিজেকে বিলিয়ে দিতে পারাটাই সবচেয়ে বড়ো আরাধনা। মানুষের জন্যই তো মানুষ। জীবের সেবায় হাত প্রসারিত করলেই পৃথিবী হয়ে উঠবে মনোমুগ্ধকর, সুন্দর এবং বসবাসযোগ্য। ঈশ্বরের সৃষ্টি জীবের প্রতি দয়া প্রদর্শনই হলো শ্রেষ্ঠ ঈশ্বরের সেবা।

৩৮. জ্ঞানহীন মানুষ পশুর সমান।

[ব. বো. '১৩]

মূলভাব: জ্ঞানার্জনের মাধ্যমেই মানুষকে তার মনুষ্যত্ব অর্জন করতে হয়। যে ব্যক্তি জ্ঞানার্জন করেনি সে নির্বোধ; তার আচরণ পশুর সাথে তুল্য।

সম্প্রসারিত ভাব: মানুষকে বলা হয় সৃষ্টির সেরা জীব। এই শ্রেষ্ঠত্বের সম্মান সে লাভ করেছে একমাত্র জ্ঞানবুদ্ধির জন্য। অন্যান্য প্রাণীর সাথে মানুষের তফাত এই যে, মানুষ বিবেকবুদ্ধি দিয়ে সহজেই ভালো-মন্দ চিহ্নিত করতে পারে। অন্যান্য প্রাণীর মধ্যে এই উপাদানটি অনুপস্থিত। প্রতিটি মানুষের মধ্যেই জ্ঞানবুদ্ধি সুপ্ত অবস্থায় বিদ্যমান থাকে। তবে মানুষ পরিচর্যার মাধ্যমে জ্ঞান ও বুদ্ধির পরিপূর্ণ বিকাশ ঘটাতে পারে। প্রত্যেককে পরিপূর্ণ মানুষ হিসেবে গড়ে উঠতে হলে প্রতিটি মানুষেরই জ্ঞানচর্চা একান্ত আবশ্যক। জ্ঞানহীন মানুষ সর্বদা হিংসা, বিদ্বেষ, লোভ-লালসা, কামনা-বাসনা প্রভৃতি কু-প্রবৃত্তির দাসত্বে নিমগ্ন থাকে। আপন অস্তিত্বকে সে টিকিয়ে রাখতে পারে না বলে সে অজ্ঞানতার অন্ধকারে ধুকে ধুকে মরে। জ্ঞান অর্থাৎ শিক্ষা-দীক্ষা ও পান্ডিত্য মানবজীবনের অমৃত রসায়ন। জ্ঞানহীন মানুষ শক্তিহীন। পশু ও জন্তু-জানোয়ারের যেমন জ্ঞান-বুদ্ধি নেই, বিবেচনা নেই তেমনি শিক্ষা-দীক্ষাহীন লোকমাত্রই পশুর মতো নির্বোধ। জ্ঞানী মানুষ সমাজের মুকুটমণি- সমাজে অনেক রকমের মানুষের বসতি কিন্তু জ্ঞানী ও পান্ডিত্যের সম্মান ও মর্যাদা সর্বাপেক্ষা বেশি। কারণ তিনি জগৎ ও জীবন, জন্ম ও মৃত্যু, সৃষ্টি ও ধ্বংস- এসব বিষয়ে সচেতন। জ্ঞান ও প্রজ্ঞার আলোকে জ্ঞানী ব্যক্তি সবকিছু বিবেচনা করতে সমর্থ। পক্ষান্তরে নির্বোধ, বিবেক ও বিবেচনাহীন ব্যক্তি সংসারের ভালোমন্দ নিয়েই মাথা ঘামায় না। পশুর জীবন অর্থহীন, ভারবাহী গর্দভের তুল্য জ্ঞানবুদ্ধিহীন মানুষ তেমনি। জ্ঞান মানুষকে আত্মশক্তিতে বলীয়ান করে, পক্ষান্তরে জ্ঞানহীন মানুষ পশুর মতো অভিশপ্ত জীবনযাপনে অভ্যস্ত হয়।

মন্তব্য: সমাজে জ্ঞানহীন মানুষ ও পশুর মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। তাই সুন্দর ও সাবলীল জীবনধারণের জন্য প্রতিটি মানুষের জ্ঞানচর্চা একান্ত আবশ্যক।

৩৯. তাই আজ প্রকৃতির উপর আধিপত্য নয়, মানুষ গড়ে তুলতে চাইছে প্রকৃতির সঙ্গে মৈত্রীর সম্বন্ধ

মূলভাব: মানুষের সুখ-সমৃদ্ধি ও অগ্রগতি সাধনে প্রকৃতির দান অনস্বীকার্য। প্রকৃতিতেই মানবজীবন ও জীবজগতের বসবাস। তাই প্রকৃতির সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে তুলে তাকে মানবকল্যাণের কাজে লাগানো যায়।

সম্প্রসারিত ভাব : প্রকৃতির সম্পদ ভান্ডার অফুরন্ত। এ সম্পদ যথাযথভাবে ব্যবহার করলে মানুষের অভাব থাকবে না। কিন্তু প্রকৃতির বিভিন্ন ধরনের সম্পদ এ বিশ্বের মানবগোষ্ঠী বেহিসাবিভাবে ভোগ করে আসছে। একপর্যায়ে এ ভোগই প্রকৃতিকে ভারসাম্য হারাতে বাধ্য করেছে। উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে পরিবেশের কথা। বন প্রকৃতিরই পরিবেশ। কিন্তু এ বন উজাড় করে গাছপালা কেটে বা গাছপালা পুড়িয়ে ফেলা হচ্ছে। এটা কোনো মতেই অস্বীকার করার উপায় নেই যে, বৃক্ষ আমাদের বিভিন্নভাবে উপকারসাধন করে। এগুলো আমাদের কাঠ ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের জোগান দেয়, ছায়া প্রদান করে, অক্সিজেন ত্যাগ করে; যা মানুষের খুবই প্রয়োজন। তাছাড়া বন্যা ও খরা হতেও বৃক্ষ মানুষকে রক্ষা করে। কিন্তু তাৎক্ষণিক প্রয়োজনের কারণে মানুষ বন কেটে উজাড় করে ফেলছে। এ ধ্বংসাত্মক কর্ম আমাদের প্রাকৃতিক ভারসাম্যকে বিনষ্ট করে। যার ফলে ভূমিক্ষয় হয় এবং ফল ও কাঠ পেতে বিলম্ব ঘটে। যদি গাছপালা না থাকে তবে কোনো বৃষ্টিপাত হবে না। ফলে, গোটা বায়ুমন্ডলে বিরাট পরিবর্তন দেখা

দেবে। দেশ মরুভূমিতে পরিণত হতে পারে। সর্বোপরি দেশটি তার সবুজতা হারাবে। প্রাকৃতিক সম্পদের অকল্যাণকর ও অশুভ ব্যবহার মানবসভ্যতার জন্য হুমকি হয়ে দাঁড়াচ্ছে। বিপদাপন্ন মানবকুল বুঝতে পেরেছে প্রকৃতির অবদানেই তারা বেঁচে আছে। তারা বুঝতে পেরেছে, বৃক্ষ ছাড়া পৃথিবীতে আমাদের অস্তিত্বের কথা ভাবাই যায় না। আজকাল মানুষ স্বতঃস্ফূর্তভাবে বৃক্ষরোপণ করতে এগিয়ে আসছে। কারণ তারা প্রকৃতির সঙ্গে মৈত্রীর বন্ধন সুদৃঢ় করতে চায়। একটা বৃক্ষ ভবিষ্যৎ বংশধরদের জন্য একটা বড়ো সঞ্চয়ও বটে।

মন্তব্য: মানবগোষ্ঠী প্রকৃতির সঙ্গে বৈরী সম্পর্কের অবসান ঘটিয়ে গঠন করতে চাচ্ছে বন্ধুত্বের সম্পর্ক। প্রকৃতি থেকে সম্পদ পেতে হলে প্রকৃতির সঙ্গে সখ্যতা গড়ে তুলতে হবে। তবেই লাভবান হওয়া যাবে। মানবসমাজের উচিত প্রকৃতির সঙ্গে মৈত্রীর সম্পর্ক গড়ে তোলা।

৪০

তুমি অধম, তাই বলিয়া আমি উত্তম না হইব কেন?

[ঢা. বো. '১০; ব. বো. '১০; সি. বো. '১০, '০৮; য. বো. '০৬]

অথবা, কুকুরের কাজ কুকুরে করেছে কামড় দিয়েছে পায়,
তাই বলে কুকুরকে কামড়ানো কি মানুষের শোভা পায়?

মূলভাব: স্রষ্টার অন্যতম সৃষ্টি মানুষ চিন্তাশীল ও বিবেকবান। তাঁর বিবেক ও চিন্তাশক্তি স্বাধীন ও শক্তিশালী। তাঁর উত্তম বা অধম হওয়ার পেছনে পারিপার্শ্বিকতার যতই প্রভাব থাকুক না কেন, তা সে অতিক্রম করতে পারে। যথার্থভাবে স্বীয় বিবেকের যথাশক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে মানুষ নিজের ওপর থেকে অধমের কুপ্রভাব অনায়াসে ঝেড়ে ফেলে দিয়ে নিজেকে উত্তমের স্তরে উন্নীত করতে পারে। অন্যের অন্যায় ও অশুভ আচরণ কখনো মানুষের অনুকরণীয় আদর্শ হতে পারে না।

সম্প্রসারিত ভাব: কলুষময় পরিবেশের মধ্যে থাকলেও প্রকৃত মানুষের সাধনা হওয়া উচিত সত্য, ন্যায় ও মানবিতকার আদর্শে জীবন গঠন। মনুষ্যত্বের এই সাধনায় মানুষ প্রকৃত মানুষ হয়ে উঠতে পারে। পরের সুকৃতিতে অনুপ্রাণিত হওয়া প্রশংসনীয় কিন্তু পরের স্বার্থপরতায় প্রভাবিত হওয়া অনাকাঙ্ক্ষিত। জীবনে প্রতিনিয়ত ভালো আর মন্দ দিয়ে প্রভাবিত হচ্ছে মানুষ। নিজেকে মহৎ গুণাবলির আদর্শে পরিচালিত করতে পারলেই জীবনে সার্থকতা লাভ করা যায়। তাই চারদিকের অন্যায়–অবিচার থেকে নিজেকে রক্ষা করে মানবিক গুণে সমৃদ্ধ করতে হবে জীবনকে। অপরের মন্দকর্ম কখনো আদর্শ হিসেবে বিবেচিত হতে পারে না। চরিত্র–বৈশিষ্ট্যে ও মানসিকতার বিচারে সংসারে সব মানুষ অভিন্ন চরিত্রের হয় না, মানুষের মধ্যে ভালোও আছে মন্দও আছে। সৎও আছে অসৎও আছে। এদের মধ্যে উত্তম মানুষই হলো সমাজের আদর্শ। এঁরা চিন্তা ও কর্মে সত্য ও ন্যায়ের অনুসারী, এদের জীবনযাপন সহজ–অনাড়ম্বর। পক্ষান্তরে যারা অধম তারা স্বার্থান্বেষী, অর্থলোলুপ। সমাজের মঙ্গলের চেয়ে ছলে–বলে–কৌশলে অন্যায় উপায়ে নিজের স্বার্থ হাসিলই এদের একমাত্র লক্ষ্য। আন্তরিক ইচ্ছা থাকলে মানুষ শত অধমের মধ্যে থেকেও নিজে উত্তম হতে পারে। কারণ প্রকৃত উত্তমের বিবেক কখনো দুর্বল নয়, 'উত্তম নিশ্চিন্তে চলে অধমের সাথে' তাতে অধমেরই তাঁর দিকে প্রভাবিত হওয়ার কথা, উলটোটা নয়। উত্তম হওয়ার সাধনাই মনুষ্যত্বের সাধনা। কুকর মানুষকে কামড়াবে বলে মানুষও কুকুরকে পালটা কামড়াতে যাবে– এমন নয়। অধমের কার্যকলাপের বিপরীতে উত্তমের কার্যকলাপের আদর্শ স্থাপনই মনুষ্যত্বের পরিচায়ক।

মন্তব্য: মানুষের সাধনা হওয়া উচিত উত্তম হওয়ার সাধনা। প্রকৃত মানুষ হতে হলে অন্যের খারাপ ব্যবহারে প্রভাবিত হলে চলবে না। মহৎ অভিপ্রায় সফল করে তুলতে হলে এই সহিষ্ণুতা অপরিহার্য। প্রকৃত উত্তম তার মনের দুর্বার শক্তি দিয়ে অধমের বিরুদ্ধে নিজের প্রতিরোধের মূলমন্ত্র উচ্চারণ করেন– তুমি অধম, তাই আমাকে উত্তম হতে বাধা কোথায়?

৪১. সততাই সর্বোৎকৃষ্ট পন্থা

[য. বো. '০৮; ব. বো. '১৪]

মূলভাব: মানবজীবনে সততা পরশপাথরের মতোই মূল্যবান। কিন্তু সততাকে অর্জন করা একটি ইস্পাত কঠিন কাজ। শত কষ্টের মধ্যেও যিনি এটি অর্জন করেন, পৃথিবীতে তার প্রতিষ্ঠা পাওয়া অনেক সহজ।

সম্প্রসারিত ভাব: বিশ্বপরিমন্ডলে ভালো–মন্দ, সৎ–অসৎ, সত্য–মিথ্যা পাশাপাশি অবস্থান করে। এ জগতে যেমন সাধু, সত্যবাদী মানুষ রয়েছে, তেমনই রয়েছে ভণ্ড, মিথ্যাবাদীও। জীবনের চূড়ান্ত সাফল্য লাভের জন্য প্রয়োজন সততা আর কর্মে একনিষ্ঠ সাধনা। তাই সৎ ব্যক্তি স্বীয় সততার বলেই মানুষের বিশ্বাসভাজন হয় এবং প্রভূত সম্মান অর্জন করেন। অন্যদিকে, অসৎ

ব্যক্তিরাও সম্মান, প্রভাব ও প্রতিপত্তি অর্জন করে থাকে। কিন্তু তাদের উন্নতি সাময়িক ও ক্ষণস্থায়ী। অসৎ ব্যক্তি অবৈধ পথে যত অর্থ–বিত্ত–সম্পদ অর্জন করুক– তা সমাজে ঘৃণিত। পক্ষান্তরে, গরিব ও দুঃখী মানুষ যদি সততার মধ্য দিয়ে জীবন অতিবাহিত করেন, তবে সকলেই তাদের শ্রদ্ধা করে। ব্যাবসাবাণিজ্য, রাজনীতিসহ প্রভৃতি ক্ষেত্রেও সৎ পথের মানুষেরা জীবনে উন্নতির স্বর্ণ–শিখরে পৌঁছাতে পারে। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের প্রতি দৃষ্টিপাত করলে এ কথাটি সহজেই অনুধাবন করা যায়। কিন্তু তারপরেও আজকের এই আধুনিক বিশ্বে সততার অভাব। আবার নানা জায়গায় সততা মূল্যহীন হয়ে পড়েছে। সৎ, ন্যায়নিষ্ঠ, জ্ঞানী মানুষ সমাজে চরমভাবে অবহেলিত। অথচ যেখানে অসৎ, কপট, ভণ্ড ব্যক্তিরা প্রতাপের সাথে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ মানুষ হিসেবে নিজের প্রচারণা চালায়। তাই জীবনানন্দ দাশ ভণ্ড, কপটদের সম্বন্ধে যথার্থ ক্ষোভেই উল্লেখ করেছেন : 'যারা অন্ধ, সবচেয়ে বেশি আজ চোখে দ্যাখে তারা'। তদুপরি পৃথিবীতে অনেক সৎ, ন্যায়বান ও গুণী লোক রয়েছে। যারা মানুষের কল্যাণে এখনো নিবেদিতভাবে কাজ করে যায়। এছাড়াও ইতিহাসের পাতায় আরও অনেক জ্ঞানী–গুণী মনীষীর কথা জানা যায়, যাঁরা জীবনের চরম দুঃখদুর্দশার মধ্যে থেকেও কখনো অসৎ পথ অবলম্বন করেননি। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, মহানবি হযরত মুহম্মদ (সা.) তাঁর শত্রুদের কাছ থেকেই জীবনের প্রথম 'আলামিন' বা বিশ্বাসী উপাধি লাভ করেন। এছাড়াও বড়োপির হযরত আব্দুল কাদের জিলানিসহ অসংখ্য মনীষী ব্যক্তিজীবনে কখনোই মিথ্যাকে প্রশ্রয় দেননি; বরং অবর্ণনীয় দুঃখকষ্টেও সততার পথেই জীবনকে উৎসর্গ করেছেন। তাই তাঁরা এ পৃথিবীতে অমরত্ব লাভ করেছেন।

মন্তব্য: মানবজীবনে সততা অন্যতম একটি মহৎ গুণ। আর সত্যের মধ্যে মানবজীবনের পরম সার্থকতা নিহিত থাকে। সততাই মানবজীবনকে পরিপূর্ণ করে। জীবনের নানা দুঃখ–কষ্ট, ব্যথা–বেদনা, ত্যাগ–তিতিক্ষা অতিক্রম করে সত্যের পথে চলতে হয়।

৪২. দণ্ডিতের সাথে
দণ্ডদাতা কাঁদে যবে সমান আঘাতে
সর্বশ্রেষ্ঠ সে বিচার।

[ঢা. বো. '০০; কু. বো. '০৬; রা. বো. '০৮;, য. বো.'১০, '০৪; ব. বো. '১০; চ. বো. '১২]

মূলভাব: সমাজের দণ্ডবিধির প্রচলন বহু পূর্বকাল থেকেই আছে; প্রাচীন গ্রন্থাদিতে এই দণ্ডবিধির উল্লেখ বহুভাবেই পাওয়া যায়। সমাজ রক্ষার জন্য দুষ্কৃতকারীর দণ্ডবিধান অবশ্য কর্তব্য। যেকোনো শাস্তিই কষ্টদায়ক। সে কষ্টে যদি বিচারক সংবেদনশীল ও ব্যথিত হন তবেই সে বিচার শ্রেষ্ঠ বিচার বলে অভিহিত হয়।

সম্প্রসারিত ভাব: শাস্তিদানের ব্যবস্থা না থাকলে সমাজ বিশৃঙ্খল অবস্থায় পরিণত হয়ে যেত। মানুষের মধ্যে দুষ্প্রবৃত্তিসকল ভয়ে দমিত হয়ে থাকে। দুষ্প্রবৃত্তি প্রকাশ্যে বাধা না পেলে অধিকাংশ স্থলে মানুষ বর্বর পশুতে পরিণত হতে পারে এবং উচ্ছৃঙ্খল জীবনযাপনে অভ্যস্ত হতে পারে। আমাদের বিস্মৃত হলে চলবে না যে, সমস্ত সভ্য ও নীতিবান মানুষের মতোই অপরাধকারীরও মনে একটা মনুষ্যত্ববোধ আছে। অপরাধ হয়তো সে করে কখনো প্রয়োজনের তাড়নায় কিংবা অভ্যাসের বশে; কিন্তু কোনো একসময় সে তার অপরাধের জন্য অনুশোচনাবোধ করে। এই অনুশোচনার দ্বারা তার অন্তরের দ্বার উন্মুক্ত হয়ে যায়– আর সেই পথেই তার অন্তরের পরিবর্তন একান্তভাবেই সম্ভব। কিন্তু আমরা যদি তার অন্তরের পরিবর্তন করার চেষ্টা না করে কেবল তাকে শাস্তি দিই, তবে তার মধ্যে মনুষ্যত্ববোধের পরিবর্তে বর্বরতা ও পশুত্ব জাগ্রত হয়ে উঠবে। যে ভ্রমে পতিত হয়, ঋত পথ তাহারই প্রাপ্য। অপরাধীর অন্তরের পরিবর্তনের মাধ্যমে তার মনে অনুশোচনা জাগাতে হবে এবং তাকে উন্নত পরিবেশে থাকার সুযোগ দিয়ে সৎ শিক্ষা দিতে হবে। যে সমস্ত কারণ তাকে ওই পাপ কাজে প্ররোচনা দিয়েছে সেগুলোকে দূরীভূত করে তাকে স্বাভাবিক সুস্থ মানুষ করে তুলার চেষ্টা করতে হবে। দণ্ডবিধানের মুখ্য উদ্দেশ্য তাকে দুষ্কৃতির কবল থেকে মুক্ত করা, অন্তরে তার নৈতিকবোধ জাগ্রত করা; তাকে বাইরের শাসন দ্বারা আহত করা নয়। দণ্ডবিধানের মধ্যে যেন মানুষকে চিরকালের জন্য লাঞ্ছিত করার নিষ্ঠুর প্রবৃত্তি না থাকে, যেকোনো উপায়ে পুনরায় সে যেন তার পূর্বেকার স্বাভাবিক জীবনে ফিরে যেতে পারে। কারণ, এ কথা সত্য যে মানুষ তার পাপ–প্রবৃত্তির সর্বনিম্ন স্তর থেকেও উঠে আসতে পারে। দণ্ডিতকে তাই চিরকালের জন্য শাস্তি দেওয়ার প্রয়োজন নেই। প্রসঙ্গক্রমে স্মরণীয় যে, অনেক সজ্জন ব্যক্তি কোনো এক অজ্ঞাত রহস্যের প্রেরণায় অনেক সময় অকস্মাৎ অপরাধ করে বসেন। এঁদের দণ্ড পেতে হবে বইকি; কিন্তু দণ্ডদানই বড়ো কথা নয়। যদি তাঁদের স্বাভাবিক জীবনে আর ফিরে আসার সুযোগ না থাকে, তবে সেই দণ্ডদানের সার্থকতা কোথায়? তাই যিনি দণ্ডদাতা, তাঁকে দণ্ডদানের সময় সমব্যথী মন নিয়ে সহানুভূতির স্পর্শ দিয়ে বিষয়টি চিন্তা করতে হবে। তিনি নিজেকে আসামির কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়ে যদি বিচারকের ভূমিকা পালন করেন, তবেই সেই

SINCE 1993 NABARUN PUBLICATION

বিচার শ্রেষ্ঠ বিচার। বিচারকের মনে যেন চিরন্তন মনুষ্যত্ববোধের আদর্শ জাগ্রত হয়ে ওঠে; তবেই সেই বিচারক প্রকৃত বিচারের অধিকারী। অপরাধ ব্যক্তিজীবনের কোনো বিচ্ছিন্ন ক্রিয়া নয়; সমগ্র সমাজব্যবস্থায় কোনো না কোনো সূত্র তাতে জড়িত থাকে।

মন্তব্য: তাই অপরাধীকে সাময়িকভাবে দণ্ডবিধানের ব্যবস্থা করা যেতে পারে। কিন্তু সেই দণ্ডবিধানের প্রকৃত মূল্য সংস্কারের প্রয়োজনে; অপরাধকারীকে আঘাতের উদ্দেশ্যে নয়। প্রকৃত বিচারের সার্থকতা সেখানেই।

৪৩. দশে মিলে করি কাজ, হারি জিতি নাহি লাজ।

মূলভাব: যেকোনো কর্মেরই সফলতা ও বিফলতা আছে। মানুষ কোনো কাজে সফলতা লাভ করলে নিজেকে গৌরবান্বিত বলে মনে করে। ফলে তার মনে সুখানুভূতি জাগ্রত হয়।

সম্প্রসারিত ভাব: কোনো কাজে ব্যর্থতা এলে মানুষের মন খারাপ হয়ে যায়। বস্তুত কাজের ধরন দুরকম হতে পারে। যেমন– কোনো কার্য সমাধান করার একক দায়িত্ব গ্রহণ এবং যৌথভাবে কোনো কর্মকাণ্ডে আত্মনিয়োগ করা। এককভাবে কার্য সমাধান করার ফলে একক গৌরব লাভ সম্ভবপর হয়। কিন্তু ব্যর্থতার গ্লানিও তাকে একাই বহন করতে হয়। আর যৌথভাবে কোনো কার্য সম্পাদন করলে সফলতা–বিফলতার সমান ভাগীদার হতে হয়। ব্যর্থতার সম্পূর্ণ গ্লানি একাই বহন করতে হয় না। কারণ সে কাজের হার–জিতে ব্যক্তিবিশেষের কোনো দায়–দায়িত্ব থাকে না।

মন্তব্য : যৌথভাবে কাজ করার সবচেয়ে বড়ো সুবিধা হচ্ছে কাজের ভবিষ্যৎ ভেবে একাকী কাউকে আগাম দুশ্চিন্তায় জর্জরিত হতে হয় না। সর্বদা দুর্ভাবনা থেকে নিজেকে রক্ষা করা যায়। আবার কার্য শেষে ব্যর্থতা এলেও লজ্জা দেওয়ার কেউ থাকে না।

৪৪. দাও ফিরে সে অরণ্য লও এ নগর।

[কু. বো. '০১; সি. বো. '০৯; ঢা. বো. '১২; দি. বো.'১৫]

মূলভাব: বর্তমান যুগ বিজ্ঞানের যুগ। বিজ্ঞান আধুনিক নগরসভ্যতাকে দিয়েছে বেগ, কিন্তু কেড়ে নিয়েছে আবেগ। যান্ত্রিক মূল্যবোধ মানুষকে বিপর্যস্ত করে তুলেছে। মানুষ আজ মুক্তি চায়। ফিরে যেতে চায় ছায়া সুনিবিড় গ্রামীণ পরিবেশে।

সম্প্রসারিত ভাব: মানবসভ্যতার বিজয়তোরণ দিনদিন উন্নত হচ্ছে। এ কথা মিথ্যা নয়। তবে সেই সঙ্গে যে মানুষের মানবিক ঔদার্য ও প্রাকৃতিক সুষমা দিনদিন অবলুপ্ত হচ্ছে এ বিষয়টি আমরা দেখছি না অথবা দেখেও না দেখার ভান করছি। আধুনিক যন্ত্রসভ্যতা আমাদের অনেক উঁচুতে নিয়ে গেছে, আমাদের অগ্রগতি বদলে দিয়েছে। আমাদের চিন্তাধারার রূপ পরিবর্তন করেছে। কিন্তু আমাদের ভুলিয়ে দিয়েছে আমাদের প্রাচীন গ্রামীণ সভ্যতা; কিন্তু বিজ্ঞানের অগ্রগতিতে মানুষ আজ নিজের প্রয়োজনে যন্ত্রের হাতে বন্দি। মানুষ নিজের প্রয়োজনেই আজ যন্ত্রের মাঝে হারিয়ে গেছে। যান্ত্রিক উপকরণ মানুষকে গতি দিয়েছে, কেড়ে নিয়েছে স্থিতি। ঝরনার পরিবর্তে তৈরি হয়েছে কৃত্রিম ফোয়ারা। চাঁদের আলো আর কেউ দেখে না, আধুনিক কৃত্রিম বিভিন্ন আলোতে চোখ ধাঁধিয়ে যায়। দখিনা বাতাসে প্রাণ জুড়ানোর মতো অবস্থা এখন আর নেই। সেই স্থান কেড়ে নিয়েছে বৈদ্যুতিক পাখা, অত্যাধুনিক এয়ারকুলার। মানুষ চাইলেই হাতের কাছে পায় সবকিছু। কিন্তু মনের তৃপ্তি এসবে হয় না। মানুষের মায়ামমতা দিনদিন কমে যাচ্ছে। পরিবারের মতো সংগঠনও ভেঙে যাচ্ছে। সন্তানের কাছে বৃদ্ধ মা–বাবার ঠাঁই নেই। স্বামী–স্ত্রীর ছোটো সংসারেও শান্তি নেই। জীবনে মানুষের প্রতি মানুষের ভালোবাসা কর্পূরের মতো উবে যাচ্ছে। মনের শান্তি কমে যাচ্ছে। বিবাহ প্রথার বদলে মানুষ বেছে নিচ্ছে লিভ টুগেদারের মতো পাশবিক জীবন। বতমানে মানুষের উন্নতির জন্য চলে চরম প্রতিযোগিতা। সেই উন্নতির জন্য যত নিচে নামতে হয় মানুষ ততো নামে। মারামারি, হানাহানি, হিংস্রতা সবকিছু মানুষের মধ্যে বিরাজ করে। এইসব জটিল নির্মম, নিষ্ঠুর যান্ত্রিক জীবন ছেড়ে মানুষ ফিরে যেতে চায় সবুজ শ্যামল পরিবেশে।

মন্তব্য: নিজেদের তৈরি বেড়াজালে মানুষ আজ নিজেই বন্দি। মানুষ ক্লান্ত হয়ে পড়েছে এই সভ্যতায় এসে। তাই মানুষ মুক্তি চায়, মুক্তির জন্যই মানুষের এত আকুতি।

৪৫. দুঃখের মতো এত বড়ো পরশ পাথর আর নেই। *[দি. বো. '১১; রা. বো. '১০, '০১]*

মূলভাব: পরশপাথরে লোহাও সোনা হয়ে যায়। বাস্তব জীবনে পরশপাথর নেই কিন্তু দুঃখ তো আছে। দুঃখের পরশপাথরেই মানুষের জীবন সোনা হয়ে ওঠে। দুঃখের পরশেই মানুষের বিবেক মহান হয়।

সম্প্রসারিত ভাব: দুঃখবোধ থেকেই জ্ঞানের উন্মেষ ঘটে। দুঃখের শেষে যে সুখ আবির্ভূত হয় তা অতুলনীয়। দুঃখের আগুনে পুড়ে পুড়েই মানুষ খাঁটি সোনায় পরিণত হয়। দুঃখেই মানুষ অনুভূতিপ্রবণ হয়ে ওঠে। দুঃখ মানুষের মন থেকে গ্লানি ক্লেদ মুছে দিয়ে

মানুষকে নির্মল সুন্দর করে তোলে। ব্যক্তিগত জীবনের দুঃখ যখন সমষ্টিগতভাবে রূপায়িত হয় তখনই মানুষ মহামানব হয়ে ওঠে। কিশোর কবি সুকান্ত ভট্টাচার্য এত দুঃখ ভোগ করেছেন বলেই সুকান্তের কবিতা এত বাস্তব। দুঃখকে অন্তরে লালন করেছিলেন বলেই গৌতম 'বুদ্ধ' হতে পেরেছিলেন। হযরত মুহাম্মদ (সা.) হতে পেরেছিলেন 'মহামানব'। যিশু হয়েছিলেন মুক্তির নির্ভীক সাধক। দুঃখ, দারিদ্র্যের এক জলন্ত উদাহরণ কাজী নজরুল ইসলাম। জীবনে চলার প্রতিটি পদে দুঃখ ছাড়া জীবন স্বাদহীন ও বৈচিত্র্যহীন। অন্ধকার ছাড়া যেমন আলোর কোনো মূল্য নেই, মরণ না থাকলে যেমন জীবনে বেঁচে থাকার কোনো সার্থকতা নেই তেমনি দুঃখ ছাড়াও সুখের কোনো মূল্য নেই। লাগামহীন আনন্দে ভাসতে ভাসতে মানুষ জীবন জগৎ, প্রকৃতি সব ভুলে যায়। কোনো সমস্যাই স্পর্শ করে না। দুঃখ, দারিদ্র্যের চরম অনুভূতিতে তা করা সম্ভব হয় না। দুঃখের মধ্য দিয়েই মানুষ প্রকৃত মানুষ হয়ে ওঠে। নিরবিচ্ছিন্ন সুখ কখনো প্রকৃত সুখ হতে পারে না। পৃথিবীতে সকল প্রকার মূল্যবান ধন–সম্পদ দুঃখের বিনিময়েই অর্জিত হয়েছে। জীবনে যেকোনো সময়েই দুঃখ আসতে পারে। আর এ দুঃখের মধ্য দিয়েই মানুষ নিজেকে পরীক্ষা করার সুযোগ পায়। নিজের আত্মশক্তি বাড়ানোর সুযোগ পায়।

মন্তব্য: কোনো বড়ো কিছুই দুঃখ ছাড়া হয় না। দুঃখই মানুষকে মহান করে। তাই দুঃখ মানুষকে যথার্থ মানুষ হিসেবে গড়ে তোলে। জীবনে দুঃখ না আসলে কখনোই প্রকৃত সুখের স্বাদ গ্রহণ করা সম্ভব নয়।

৪৬

৪৬. স্বাধীনতা হীনতায় কে বাঁচিতে চায় হে

কে বাঁচিতে চায়? বল

দাসত্ব শৃঙ্খল কে পরিবে পায় হে

কে পরিবে পায়?

অথবা, দুধ–কলায় সমৃদ্ধ সোনার খাঁচা অপেক্ষা ঝঞ্ঝাবিক্ষুব্ধ

অজানা আকাশ পাখির অনেক প্রিয়।

মূলভাব: স্বাধীনতা প্রত্যেকের কাছেই বহু কাঙ্ক্ষিত বস্তু। পরাধীন হয়ে কেউ থাকতে চায় না। সেই পরাধীন জীবন যতই শান্তির ও নিশ্চিন্তের হোক না কেন। তাই বনের পাখির কাছে সোনার খাঁচার চেয়েও মুক্ত আকাশ অনেক প্রিয়।

সম্প্রসারিত ভাব: মুক্ত আকাশে উড়ে বেড়ানোতেই পাখির প্রকৃত আনন্দ। মানুষ পাখির মতো স্বাধীনতাপ্রিয়। প্রতিটি মানুষই নিজের ইচ্ছায় স্বাধীনমতো চলতে চায়। কিন্তু জীবনের বিভিন্ন রকম প্রতিবন্ধকতা ও মানুষের চিন্তা–ভাবনা মানুষকে বন্দি করে রাখে; হাতের ক্রীড়নক করে রাখে। পরাধীনতা মানুষের জন্য অনেক বড়ো একটা অভিশাপ। এই পরাধীনতা একটা শৃঙ্খলের মতো। মুক্ত জীবনের আকাঙ্ক্ষায় যেমন দুধকলা দিয়ে পোষা সোনার খাঁচার পাখিও আকাশের বুকে ডানা মেলার জন্য ব্যাকুল হয়ে ওঠে, তেমনি দাসত্ব শৃঙ্খলে বন্দি পরাধীন মানুষও মুক্ত জীবনের দুর্বার আকাঙ্ক্ষায় স্বাধীন হতে চায়। মানুষের কাছে এমনকি পাখির কাছেও দীর্ঘ পরাধীন জীবনের চেয়ে ছোটো স্বাধীন জীবনের মূল্য অনেক বেশি। মুক্ত আকাশের কত পাখি মানুষের শখের সোনার খাঁচায় বন্দি– তারা মানুষের কাছ থেকে আদর–যত্ন, সেবা–শুশ্রষা সবই পায় তবুও তাদের যে আত্মতৃপ্তি সেটা লাভ করে না। মুক্ত আকাশে তাদের হয়তো খাদ্য, বাসস্থান ও সেবা–শুশ্রূষার অনিশ্চয়তা বিদ্যমান। তবুও দুধকলা–সমৃদ্ধ সোনার খাঁচার চেয়ে মুক্ত আকাশ অনেক ভালো। তাই মুক্ত জীবনের আকাঙ্ক্ষা নিয়ে পাখি যেমন খাঁচা ছেড়ে আকাশের দিকে ডানা মেলে উড়তে চায় তেমনি মানুষও স্বাধীনতা লাভের আকাঙ্ক্ষায় পরাধীনতার বন্ধন ছিন্ন করতে মরিয়া হয়ে ওঠে। আপাতদৃষ্টিতে স্বাচ্ছন্দ্যময় পরাধীন জীবনের চেয়ে কষ্টকর স্বাধীন জীবন অনেক ভালো। জীবনের চেয়েও বেশি মূল্যবান স্বাধীনতা। তাইতো যুগে যুগে দুনিয়ার মানুষ পরাধীনতার শৃঙ্খল থেকে মুক্ত হতে যুদ্ধ করে জীবন বিসর্জন দিয়েছে। পরাধীনতার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছে। কিন্তু চারপাশের হিংস্র, বর্বর শক্তি মানুষকে পরাধীন করে রাখার জন্য তৎপর হয়ে থাকে। শুধু ব্যক্তিগত জীবনেই নয়, জাতীয় জীবনেও মানুষ স্বাধীনতা চায়। ব্রিটিশ শাসনের জন্য বাঙালি প্রায় দুইশ বছর আত্মবিকাশের সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয়েছে। পাকিস্তানি শাসনামলেও বাংলাদেশ সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিকভাবে শাসিত হয়েছে। তাই স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষায় বাঙালি জাতি ১৯৭১–এ জীবনের ঝুঁকি নিয়ে, রক্ত ঝরিয়ে যুদ্ধ করেছে স্বাধীনতার জন্য– মুক্তির জন্য। কারণ মুক্ত পাখির মতো স্বাধীন জীবনযাপন করাই মানুষের সহজাত ধর্ম।

মন্তব্য: জন্ম থেকেই মানুষ স্বাধীন সত্তার অধিকারী। স্বাধীনতা আমাদের মুক্তির স্বাদ দিয়েছে, দিয়েছে আত্মজাগরণের সুযোগ। জাতি হিসেবে নিজের পায়ে দাঁড়ানোর শক্তি ও সাহস দিয়েছে স্বাধীনতা। তাই স্বাধীনতায়ই আনন্দ, পরাধীন হয়ে থাকা মৃত্যুর নামান্তর।

৪৭. দুর্জন বিদ্বান হলেও পরিত্যাজ্য।

[য. বো., চ. বো. '০২; রা. বো. '১৫, '১৩, '০৪; য. বো. '১৫, '০৬; ঢা. বো. '০৭, '০১; কু. বো.,ব. বো., সি. বো. '১৩, '০৯; দি. বো. '১৩]

অথবা, সর্পের মস্তকে মণি থাকিলেও তাহা কি ভয়ংকর নহে?

মূলভাব: 'দুর্জন' অর্থ– দুরাত্মা, দুর্বৃত্ত, খারাপ লোক ইত্যাদি। আর বিদ্বান হলো– পণ্ডিত, সুশিক্ষিত, জ্ঞানী ইত্যাদি। দুর্জন বিদ্বান হলেও নিন্দনীয়, এরূপ ব্যক্তির সঙ্গ বর্জনীয়। কেননা, তার কাছ থেকে উপকার পাওয়ার চেয়ে বরং ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা বেশি।

সম্প্রসারিত ভাব: বিদ্যা অমূল্য সম্পদ, এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। তাই বিদ্বান ব্যক্তি সমাজে সবচেয়ে সম্মানিত ও শ্রদ্ধার পাত্র। তাঁরা দেশ ও জাতির সম্পদ। বিদ্যা ও শিক্ষা বিদ্বান ব্যক্তির সবচেয়ে বড়ো গুণ। এটা জ্ঞানী লোকের ভূষণ। বিদ্বান ব্যক্তির হৃদয় ও মন সর্বদাই আলোকিত ও পবিত্র থাকে। তাঁকে সবাই সম্মান ও শ্রদ্ধা করে। কিন্তু বিদ্বান ব্যক্তি যদি দুর্জন বা চরিত্রহীন হয় তবে সে সমাজের শত্রু। সে সমাজকে কলুষিত করে। তাকে সবাই ঘৃণা করে ও পরিত্যাগ করে। ইংরেজিতে একটি প্রবাদ আছে– "The crown and glory of life is character". মানুষের মৌল মানবিক উৎকর্ষ গুণগুলোর সমন্বিত রূপকে চরিত্র বলা হয়। দুর্জন ব্যক্তি চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের এসব যাবতীয় গুণাবলি বিবর্জিত, হীন ব্যাবহারিক বৈশিষ্ট্যের অধিকারী। Education is the backbone of a nation. শিক্ষা মানবজীবনের অমৃত রসায়ন। পৃথিবীর ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, জাতি ও দেশ বিদ্যাশিক্ষায়, জ্ঞানে–গুণে যত বেশি উন্নত, সে জাতি ও দেশ তত বেশি উন্নত ও সমৃদ্ধ। স্বয়ং সৃষ্টিকর্তাও মানুষ সৃষ্টি করে সর্বাগ্রে তাদের জ্ঞান দান করেন এবং বিদ্যাশিক্ষার প্রতি সর্বাধিক গুরুত্বারোপ করেন। ইসলাম ধর্মেও বলা হয়েছে–"বিদ্বানের কলমের কালি শহিদের রক্তের চেয়েও পবিত্র"। কিন্তু এ বিদ্বান ব্যক্তি যদি দুর্জন বা দুষ্ট বুদ্ধিসম্পন্ন হয়, চরিত্রহীন ও লম্পট হয়; তবে এর চেয়ে দুঃখজনক আর কিছু হতে পারে না। এটা জাতির জন্য দুর্ভাগ্যজনক এবং দুষ্টক্ষত, যা দুরারোগ্য ব্যাধির মতো সমগ্র সমাজদেহকে কলুষিত করে। তারা সমাজের ক্ষতি ছাড়া ভালো কিছু করতে পারে না। তাদের সংস্পর্শে অন্যরা ক্ষতিগ্রস্ত হয়। একজন দুশ্চরিত্র বিদ্বান তার বিদ্যাকে খারাপ কাজে প্রবৃত্ত করে। এতে করে সমাজে নেমে আসে অভিশাপ, যার বিষবাষ্পে সমাজ পুড়ে ছারখার হয়ে যায়। একটা বহুল প্রচলিত প্রবাদ আছে– "সৎ সঙ্গে স্বর্গবাস, অসৎ সঙ্গে সর্বনাশ।" সঙ্গদোষে মানুষ তাদের সর্বস্ব হারায়। বিষধর সাপের মূল্যবান মণি সংগ্রহ করতে পারলে সম্পদের অধিকারী হওয়া যায়। কিন্তু তাই বলে মণি লাভের জন্য বিষধর সাপের সাহচর্য লাভ করা সমীচীন নয়। অনুরূপ, বিদ্যা মূল্যবান বস্তু হলেও তা লাভের জন্য বিদ্বানের দুর্জনের নিকট গমন বিধেয় নয়। চরিত্র একবার নষ্ট হলে মানুষ হিতাহিত ও ভালোমন্দ জ্ঞানশূন্য হয়। অর্থাৎ তার চরিত্রে কোনো ভালো গুণ অবশিষ্ট থাকে না। কেননা, When money is lost, nothing is lost; When health is lost, something is lost; When character is lost, everything is lost.

মন্তব্য: চরিত্রহীন ও মনুষ্যত্বহীন মানুষ বিদ্বান হলেও দুশমন। অতএব, চরিত্রহীন বা দুর্জন বিদ্বান ব্যক্তির সাহচর্য সর্বদাই আমাদের পরিত্যাগ করা উচিত।

৪৮. দুর্নীতি জাতীয় জীবনে অভিশাপস্বরূপ। *[ব. বো. '০৫; সি. বো. '০৬, '০৪]*

অথবা, দুর্নীতি জাতীয় উন্নতি ও অগ্রগতির বড়ো অন্তরায়।

মূলভাব: মানুষ সামাজিক ও রাজনৈতিক জীব। এ কারণে তাঁর মধ্যে স্বভাবজাত কিছু বৈশিষ্ট্য রয়েছে, যা তাকে অন্য প্রাণী থেকে স্বতন্ত্র করে। মানুষের প্রয়োজনেই সমাজের সৃষ্টি। মনুষ্যত্ব, সততা, কর্তব্যনিষ্ঠা, শ্রম, চরিত্রবান, সময়নিষ্ঠ, অধ্যবসায় ও ন্যায়–নীতির সংমিশ্রণে জীবন গড়াই মানুষের আদর্শ হওয়া উচিত।

সম্প্রসারিত ভাব: বর্তমানে মানুষ ব্যক্তিগত স্বার্থসিদ্ধির জন্য রাষ্ট্র ও সমাজের প্রচলিত নিয়ম–কানুন অমান্য করে দুর্নীতির আশ্রয় গ্রহণ করে। ফলে জাতীয় জীবনে নেমে আসে ঘোর অমানিশা। বাংলাদেশসহ বিশ্বের অধিকাংশ দেশে দুর্নীতি আজ একটি জটিল সামাজিক সমস্যা হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছে। নানা রকমের দুর্নীতি দেখতে পাওয়া যায়। বর্তমানে দুর্নীতি এত ব্যাপকভাবে প্রসার লাভ করেছে যে, অবৈধভাবে সুযোগ–সুবিধা আদায় করার প্রবণতা সমাজের প্রায় সর্বস্তরে দেখতে পাওয়া যায়। দুর্নীতি

জাতীয় জীবনের এক বিরাট দুষ্টক্ষত। জাতির আশা–আকাঙ্ক্ষা বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে দুর্নীতি মারাত্মক প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করে। সত্য ও ন্যায়ের পথই হচ্ছে আসল পথ। কিন্তু সেই পথকে পরিহার করে কোনো দেশের মানুষ যদি অন্যায় ও মিথ্যাকে আঁকড়ে ধরে, যদি দুর্নীতির করালগ্রাসে নিমজ্জিত হয় তাহলে জাতীয় উন্নয়নের আর কোনো সম্ভাবনা থাকে না। দুর্নীতির মাধ্যমে সেখানে স্বার্থের যে নোংরা খেলা চলে তাতে জাতীয় উন্নয়নের সকল দ্বার রুদ্ধ হয়ে যায়। তখন সমাজ হয় কলুষিত এবং জাতির সামনে নেমে আসে ভয়াবহ দুর্যোগ। দুর্নীতির জন্যই জাতীয় জীবনের সর্বত্র এক অস্বস্তিকর পরিবেশ বিরাজ করে। পরস্পরের প্রতি হিংসা–বিদ্বেষ, মিথ্যাচার, অনাচার, ব্যাভিচার ইত্যাদি অশুভ তৎপরতা বহুগুণে বেড়ে যায়। সন্ত্রাস, হত্যা, চরি, ডাকাতি, ছিনতাই রাহাজানি ইত্যাদির ফলে সৃষ্টি হয় এক অসহনীয় নারকীয় পরিবেশ। লোভ–লালসার বিষাক্ত বহ্নিতে সমগ্র দেশ দাউদাউ করে জ্বলতে থাকে, সমস্ত জাতি তখন পরিত্রাণের পথ খোঁজে। কিন্তু বাতিঘর তাদের সহজে দেখাতে পারে না সঠিক পথের ঠিকানা। একজন দুর্নীতিপরায়ণ ব্যক্তি কখনোই সুস্থ–স্বাভাবিক চিন্তা করতে পারে না; সে দেশ ও দশের মঙ্গলের কথা না ভেবে স্বার্থচিন্তায় মগ্ন হয়। তখন তার কাছে ধর্মীয় ও মানবিক মূল্যবোধ গৌণ হয়ে ওঠে; সততা সেখানে হয় লাঞ্ছিত ও অসহায়। বিবেক সেখানে বিবর্জিত। সে বেছে নেয় অন্যায় ও অসত্যের পথ। এভাবে দেশ ও সমাজ ক্রমেই ধ্বংসের দিকে এগিয়ে যায়।

মন্তব্য: যে দেশ ও জাতি যত দুর্নীতিমুক্ত, সে দেশ ও জাতি উন্নয়নের ক্ষেত্রে তত এগিয়ে আছে। দুর্নীতির কুৎসিত রূপ বিশ্বের উন্নয়নশীল ও অনুন্নত দেশেই বেশি পরিলক্ষিত হয়। তাই জাতি গঠনের জন্য প্রয়োজন দুর্নীতিমুক্ত সুস্থ মানসিকতার সমাজ ও মানুষ।

৪৯. দেরিতে বিচার ন্যায়বিচারকে প্রলম্বিত করে

মূলভাব: বিচার নিয়ে দেরি করা হলে ন্যায়বিচার ক্ষতিগ্রস্ত হয়। মানুষের ন্যায়বিচার পাওয়ার স্বাভাবিক অধিকার রয়েছে। সকল ধর্মে এবং সকল দেশের সংবিধানে মানুষের এ অধিকার বেশ শক্তিশালীভাবে অনুমোদিত।

সম্প্রসারিত ভাব: যত তাড়াতাড়ি একজন মানুষ ন্যায়বিচার পাবে সেটাই মঙ্গলজনক হবে। ন্যায়বিচারের যে দাবি তা দেরি না করে খুব তাড়াতাড়ি মেটানো উচিত। বিচারকার্যের ব্যাপারে দীর্ঘসূত্রতা এর উদ্দেশ্যকে ব্যাহত করতে পারে। ন্যায়বিচার সাক্ষ্য, উপসর্গসহ অন্যান্য অবস্থার ওপর নির্ভর করে। ন্যায়বিচারের ক্ষেত্রে দেরি করা উচিত নয়। যেহেতু বিচার পাওয়ার অধিকার আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত; এটা কোনো অকাট্য যৌক্তিক কারণ ছাড়া দেরিতে উপস্থাপন করা উচিত নয়। যদি এটা দেরি করা হয়, সাক্ষ্যের সাথে জড়িত যুক্তির এবং অন্যান্য উপাদানের শক্তির বিশ্বাসযোগ্যতা নষ্ট হতে পারে অথবা সাক্ষীরা বিপথে পরিচালিত হতে পারে। লোভের বশবর্তী হয়ে সত্যকে মিথ্যায় পরিণত করতে পারে সাক্ষীরা। টাকার জোরে ধনীরা বিচারকে নিজের আয়ত্তে নিয়ে আসতে পারে। অথবা একজন সৎ সাক্ষীর জীবন হুমকির সম্মুখীন হতে পারে। তাকে মেরে মিথ্যা সাক্ষী নিয়োগ করতে পারে। আইনের ফাঁকফোকর দিয়ে সত্যকে লুকিয়ে অন্যায়ভাবে ন্যায়বিচারকে কলুষিত করতে পারে। কিন্তু বিচার সবসময় আইনসংগত হওয়া উচিত। সুষ্ঠু বিচার যদি প্রলম্বিত হয় তাহলে এক শ্রেণির জনগণের সাহস বেড়ে যাবে এবং তারা অন্যায় করতেই থাকবে। এতে রস্ট্রের তথা পুরো জাতি ক্ষতিগ্রস্ত হবে। তাই বিচারকার্য যত দ্রুত হওয়া সম্ভব তাই করা উচিত। বিচার সবসময় ন্যায় এবং আইনসম্মত হওয়া উচিত।

মন্তব্য: দ্রুত বিচারকার্য সম্পন্ন না হলে বিচার ন্যায়বিচার হয় না। ন্যায়বিচার পেতে হলে দ্রুত বিচারকার্য পরিচালনা করতে হবে। তবেই জাতি আশার আলো দেখতে পাবে।

৫০. দ্বার বন্ধ করে দিয়ে ভ্রমটারে রুখি,
সত্য বলে, "আমি তবে কোথা দিয়ে ঢুকি?"

মূলভাব: মানবজীবনে সত্য–মিথ্যা, ভালো–মন্দ একই সুতোয় গাঁথা। মিথ্যা অসুন্দর বলেই মানুষ সত্যের সুন্দরকে উপলব্ধি করে, মিথ্যাকে তাড়িয়ে সত্যের দীক্ষা নেয়। তাই সত্য ও সুন্দরকে চিনে নেওয়ার জন্য মিথ্যার ভূমিকা রয়েছে।

সম্প্রসারিত ভাব: মানবজীবনে সত্যের সন্ধান একান্তভাবে কাম্য। কিন্তু এ সত্য অন্বেষণের কাজটি মোটেই সহজবোধ্য নয়। আলোর সঙ্গে অন্ধকার যেমন জড়িত তেমনি সত্যও নানা প্রকার ভুলভ্রান্তি ও মিথ্যা দ্বারা আবৃত। একটিকে এড়িয়ে অন্যটির সন্ধান করা বৃথা। সত্য উদ্‌ঘাটনের জন্য প্রয়োজন গভীর অন্তর্দৃষ্টি ও কঠোর সাধনা। জীবনে বাস্তব অভিজ্ঞতার দুর্গম পথে চলতে চলতে ভুলভ্রান্তি ও মিথ্যাকে সম্যকভাবে চিহ্নিত করে মানুষকে সত্যের মুখোমুখি দাঁড়াতে হয়। মানুষের চলার পথে নানা ভুলভ্রান্তি

আসে, সত্যের সন্ধানীরা সে ভুলভ্রান্তি যাচাই করে। ভুলকে স্বাভাবিকভাবে গ্রহণ করে বারবার চেষ্টা করে তারা ভুলকে চিনতে পারে। তখন সত্য সহজরূপে ধরা দেয়। যারা ভ্রান্তিকে অস্বীকার করে সত্য লাভ করতে চায় তারা সত্যের সন্ধান কখনো পায় না। বাস্তব জীবনের সম্মুখীন হতে হলে অনেক সময় অকৃতকার্যতা আসবে, ব্যর্থতা আসবে। এ অকৃতকার্যতা, ব্যর্থতা যেমন চরম সফলতার প্রতিবন্ধক নয়, তেমনি ভুলভ্রান্তিও সত্যের প্রতিকূল নয়। রাত্রি ছাড়া যেমন দিন উদ্ভাসিত হয় না তেমনি ভুল ছাড়া সত্যও উদ্ভাসিত হতে পারে না। ভুল করতে করতেই একসময় মানুষ সত্যের অন্দরমহলে প্রবেশ করার সিংহদ্বারটির সন্ধান পায়। ভুল কন্টকাকীর্ণ পথ মাড়িয়েই সত্যের কুসুমাস্তীর্ণ পথের সন্ধান মিলে। ভুলের ভয়ে, মিথ্যার আশঙ্কায় মনের দরজা বন্ধ করে রেখে যদি বাইরের অভিজ্ঞতাকে দূরে সরিয়ে রাখা হয় তবে কোনোদিনই সত্যের সন্ধান পাওয়া যাবে না। আলো আছে এটা তখনই অনুভূত হয় যখন অন্ধকার পাশাপাশি থাকে। মিথ্যার উপস্থিতিই সত্যকে দৃশ্যমান কিংবা উপলব্ধিময় করে তোলে। কাজেই ভুল কিংবা মিথ্যাকে অস্বীকার করে কেউ যদি সত্যের সাধনা করে তাহলে সে বোকার স্বর্গে বাস করে। মিথ্যা ও ভুলকে স্বীকার করেই সত্যানুসন্ধানী হতে হবে।

মন্তব্য: ছোটোখাটো ভুলভ্রান্তি সত্যকে পাওয়ার পথে প্রতিবন্ধক বা অন্তরায় নয়; বরং ভুলভ্রান্তি থেকে বাস্তব অভিজ্ঞতা লাভ করেই মানুষ প্রকৃত সত্যকে উদ্‌ঘাটন করে। তাই চেতনালোকের দরজাকে অবারিত রাখা উচিত।

৫১. ধনের মানুষ অপেক্ষা মনের মানুষই বড়ো।

[সি. বো. '০৪]

মূলভাব: মানবতাবোধ ও মনুষ্যত্বচেতনা মানবচরিত্রের ভূষণ। জাগতিক কামনা, বাসনা, যাবতীয় পাপ–পঙ্কিলতা ব্যাপ্ত ইচ্ছাগুলোকে জাগ্রত করে।

সম্প্রসারিত ভাব: মানবতার সেবায় আত্মনিয়োগ করাই সমীচীন। ধনসম্পদ বলে মানুষ ধনী হয়। কিন্তু প্রকৃত মানুষ হতে পারে না। বরং অগাধ বিত্তবৈভব আরও লোভের সৃষ্টি করে। আর লোভে পাপ, পাপে মৃত্যু। ধন মানুষকে সমাচ্ছন্ন ও মোহাচ্ছন্ন করে রাখে। জীবন ও জীবিকার তাড়নায় ইহলোককে সার্থক করে পরলোকে জাহান্নামবাসী হওয়া কোনো বাস্তব বুদ্ধিসম্পন্ন মনুষ্যসন্তানের জন্য কাম্য হতে পারে না। তাই ধনের পরিবর্তে মনুষ্যত্বের চর্চা করা বিধিসম্মত। যে ব্যক্তি মূর্খ, কোনো প্রকার জ্ঞানের অধিকারী নয়, সে যদি ধনসম্পদশালী হয়, তবে মানুষ তাকে মৌখিক সমাদর করলেও সম্মান করে না। সম্মুখে তাকে কিছু না বললেও পশ্চাতে তার মূর্খতা নিয়ে তারা উপহাস করে। কিন্তু যেসব ব্যক্তি জ্ঞানী, প্রতিভাবান, চরিত্রবান এবং পবিত্র হৃদয়ের অধিকারী, তাঁদের দেখলে মানুষের মাথা আপনা–আপনিই অবনত হয়ে আসে। এসব মহৎ মনুষ্যসন্তান মানুষের কাছে কখনো সমাদর প্রত্যাশা করেন না। কিন্তু জাগতিক মানুষ তাঁদের ভক্তিভরে স্মরণ করে এবং চিরকালের পাতায় স্বর্ণাক্ষরে নাম লিখে রাখে। পক্ষান্তরে, ধনসম্পদশালী প্রতিপত্তি ক্ষণস্থায়ী। মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে তার নাম পৃথিবী থেকে মুছে যায়। এমনকি স্বজনদের স্মরণেও সে চিরতরে লুপ্ত হয়।

মন্তব্য: ধনসম্পদশালী ব্যক্তিবর্গ মানুষের ওপর বাহ্য প্রভাব বিস্তার করলেও, তাঁদের হৃদয়ভান্ডারে প্রবেশ করতে ব্যর্থ হন। তাই তারা ধনের মানুষ হলেও মনের মানুষ নয়।

৫২. ধৈর্য ধর ধৈর্য ধর, বাঁধ বাঁধ বুক
সংসারে সহস্র দুঃখ আসিবে আসুক।

[রা. বো. '১২; ব. বো. '০৮]

মূলভাব: পৃথিবীতে যেমন সুখ আছে, তেমনি দুঃখও আছে। সুখ–দুঃখ ঘেরা মানুষের জীবন। এখানে সুখ যেমন চিরন্তন, দুঃখও তেমনি নিত্য। তাই সংসার সাগরের দুঃখতরঙ্গ অতিক্রম করার একমাত্র উপায় হচ্ছে ধৈর্যধারণ করা।

সম্প্রসারিত ভাব: সুখের বা আনন্দের স্পর্শ পেতে হলে অনেক দুঃখ–কষ্ট, নিরানন্দময় পরিবেশের মধ্য দিয়ে অগ্রসর হতে হবে। ঝড়–ঝঞ্ঝা, দুঃখ–কষ্ট দেখে পিছপা হলে সাফল্যের স্বর্ণমার্গে মাথা তুলে দাঁড়ানো কখনোই সম্ভব হবে না। মুখ বুজে ধৈর্য ধরে কাজ করে গেলে সেই কাজের সুফল একদিন অবশ্যই লাভ করা যাবে। দুঃখের আঁধার কেটে ভেসে ওঠবে সুখের সোনালি সকাল। জাগতিক পরিধিতে সংসার জীবনে অনেক অভাব দেখা দেয়, অনেক দুঃখ এসে ভিড় করে। এসময় দুঃখ ভারাক্রান্ত হয়ে হাল ছেড়ে দিলে চলবে না। ধরতে হবে ধৈর্য, আশায় বাঁধতে হবে বুক এবং করতে হবে প্রাণান্ত চেষ্টা। কথায় আছে, সবুরে মেওয়া

ফলে। তাই আমাদের উচিত দুঃখ–কষ্টে দিশেহারা হয়ে হাল ছেড়ে না দিয়ে ধৈর্যধারণ করা। ধৈর্য হলো দুঃখ–সাগরের ভেলা, সাফল্যের বীজমন্ত্র, সুখ লাভের পরশপাথর। পৃথিবীতে যত সফলতা ও বিজয় সূচিত হয়েছে, তার পেছনে রয়েছে অসীম ধৈর্য। দীর্ঘ সময় ধরে ধৈর্য ও আস্থার সাথে কাজ করলে, সাধনায় মগ্ন হলে সেটাতে সফলতা আসবেই। আবার যেকোনো কাজ শেষ করার সাথে যথেষ্ট অভাব রয়েছে। আমরা কাজ শেষ হতে না হতেই ফলের প্রত্যাশায় অস্থির হয়ে উঠি। হাতে হাতে ফল পাওয়ার প্রবণতাও আমাদের পরিহার করা উচিত। কেননা তাতে শারীরিক ও মানসিক ক্ষতি যেমন হয়, তেমনি সমাজও অস্থিরপ্রবণতায় ক্ষতিগ্রস্ত হয়। নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার সাথে কাজ করলে ফলাফলের জন্য অস্থির হওয়ার কোনো প্রয়োজন নেই, বরং তাড়াহুড়ো করলে নিশ্চিত সাফল্যও পণ্ড হয়ে যেতে পারে।

মন্তব্য: কাজেই দুঃখ–বেদনা, বাধা–বিপত্তি, বিপদাপদে কিছুমাত্র ভয় না পেয়ে ধৈর্যের সাথে যেমন মোকাবিলা করা সমীচীন, একইভাবে নিষ্ঠার সাথে কর্মসম্পাদনের পর ফলাফলের জন্য অস্থির না হয়ে ধৈর্যধারণ করাই শ্রেয়।

৫৩. ধ্বনিটিরে প্রতিধ্বনি সদা ব্যঙ্গ করে,
ধ্বনির কাছে ঋণী সে যে পাছে ধরা পড়ে। *[দি. বো. '১০]*

মূলভাব: ধ্বনি থেকেই প্রতিধ্বনির সৃষ্টি। ধ্বনি যখন উৎসের দিকে ফিরে এসে বাজতে থাকে তখনই সেটা প্রতিধ্বনি। যার আলাদা কোনো অস্তিত্ব নেই।

সম্প্রসারিত ভাব: প্রতিটি প্রতিধ্বনিই ধ্বনির কাছে ঋণী। কিন্তু অকৃতজ্ঞ প্রতিধ্বনি সেটা কখনো স্বীকার করে না। সে কখনো নিজের অস্তিত্ব প্রমাণ করতে পারে না। ধ্বনিই তাকে জীবনদান করে। প্রতিধ্বনির কাজ হচ্ছে ধ্বনিকে ব্যঙ্গ করা। এ ব্যঙ্গোক্তির মধ্য দিয়েই সে নিজেকে স্বয়ংসম্পূর্ণ প্রমাণ করতে চায়। ঋণ শোধ করার ভয়ে সে ঋণ অস্বীকার করে। প্রতিধ্বনি এজন্যই ধ্বনিকে নকল করে নিজেকে আসল বলে চালাতে চায়। প্রতিধ্বনির চরম অকৃতজ্ঞতার বহিঃপ্রকাশ এটা। আমাদের সমাজেও প্রতিধ্বনির মতো এরকম অকৃতজ্ঞ মানুষের অভাব নেই। যারা বেঁচে থাকে অন্যের আশ্রয়ে এবং যার আশ্রয়ে বেঁচে থাকে তাকেই অস্বীকার করে। অস্বীকার তো করেই, সাথে উপকারীর অপকার করার চেষ্টা করে। আবার বিপদে পড়লে তাদেরই শরণাপন্ন হয়। বিপদ কেটে গেলে তারাও কেটে পড়ে। অথচ এরা উপকারীর অনুগ্রহসিক্ত হয়ে চরম দুরবস্থায় কোনো রকমে বেঁচে ছিল। এরকম মানুষ অন্যের কল্যাণের কথা ভাবতে পারে না। এরা দেশ, জাতি এবং সমাজের শত্রু। এদের দ্বারা কারও কোনো ভালো তো হয়ই না; বরং সমাজস্থ ভালো মহৎ মানুষের অপ্রীতিকর অবস্থায় পড়তে হয়। মহৎ লোকেরা কখনো মানবকল্যাণ থেকে বিরত থাকেন না। অকৃতজ্ঞদের চাতুর্যপূর্ণ আচরণ উপেক্ষা করেই তারা সমাজের জন্য কাজ করে যান, সমাজের উপকারে প্রাণ নিবেদন করেন।

মন্তব্য: প্রতিধ্বনির ব্যঙ্গবিদ্রূপ উপেক্ষা করে ধ্বনি নিজের অস্তিত্ব ঘোষণা করতে দ্বিধা করে না। অকৃতজ্ঞ ব্যক্তিরাও উপকারীর প্রতি খড়্গহস্ত হতে দ্বিধা করে না। তবে তাদের জন্য পৃথিবী থেমে থাকে না।

৫৪. নদীর এ পার কহে ছাড়িয়া নিশ্বাস,
'ও পারেতে সর্বসুখ আমার বিশ্বাস।'
নদীর ওপার বসি দীর্ঘশ্বাস ছাড়ে
কহে, 'যা কিছু সুখ সকলি ওপারে।'

মূলভাব: মানুষের জীবন সংক্ষিপ্ত, আকাঙ্ক্ষা অনন্ত। কোনো মানুষই তার নিজের সুখ–সম্পদে পরিতৃপ্ত নয়। নিজের চেয়ে অন্যের ঐশ্বর্য ও সুখকে বড়ো করে দেখা তার স্বভাব। সে নিজেকে অপরের তুলনায় ছোটো ভেবে গোপন অভিমানে বিক্ষুব্ধ হয়। সে কখনো নিজের যা আছে তা নিয়ে সন্তুষ্ট থাকতে পারে না।

সম্প্রসারিত ভাব: মানুষ কখনো নিজের অবস্থান নিয়ে আত্মতৃপ্তি লাভ করে না। নিজের হাতের গণ্ডির বাইরেই যেন সব সুখ অবস্থান করে। মানুষ সুখের জন্য সবসময় পাগল। যা পায় তাতে তার তৃপ্তি নেই। মানুষের আশা–আকাঙ্ক্ষা অন্তহীন। সে অন্তহীন আশা–আকাঙ্ক্ষার পেছনে মানুষ নিরন্তর ধাবমান। মানুষের চাহিদার যেমন শেষ নেই, তেমনি তার ছুটে চলারও অন্ত নেই। মনে হয় যা পাওয়া গেছে তার চেয়ে অনেক বেশি আছে না পাওয়ায়। মানুষ হাতের কাছে যা পায় তার প্রকৃত মূল্য দিতে পারে না। সহজে পাওয়া যায় বলে তার দামও কমে যায়। নদীর দুই পার একই বৈশিষ্ট্যের অধিকারী হলেও এক পার অপর পারের চেয়ে

সর্বদা বেশি সুখের উৎস বলে মনে করে। পরের সম্পদ, অর্থ এবং সুখের প্রতি মানুষের আকর্ষণ দুর্নিবার। নিজের চেয়ে পরের ঐশ্বর্য ও সুখ বড়ো করে দেখতে সে অভ্যস্ত। সুখ ও ঐশ্বর্য যেন মায়ামৃগ; সে মানুষকে হাতছানি দিয়ে ডাকে এবং মানুষ অন্ধ আবেগে তার পেছনে ছোটে। এ সন্ধানের শেষ নেই। মানুষকে এমনি এক ভয়ানক মোহে পেয়ে বসেছে। নিজের মধ্যে সে সুখের সন্ধান পায় না বলে অন্যের মধ্যে সুখের অনুসন্ধান করে। এপার ওপারে সর্বসুখ আশা করে। কিন্তু ওপারও যে মায়ামৃগের মতো; অধরাকে কিছুতেই ধরা যায় না। মানুষের সবসময় নিজের যা কিছু আছে, তা নিয়ে সন্তুষ্ট থাকা উচিত। অপরের ভেতর সর্বসুখ কল্পনা না করে নিজের প্রতি আস্থাশীল হতে হবে। তাহলে মানুষ তার নিজের ভেতরই এক স্বপ্ন–সুখের বাগান খুঁজে পাবে।
মন্তব্য: সবার জীবনেই আসে কিছু অপ্রত্যাশিত সুযোগ। আবার অনেকেই অনেক কিছু থেকে বঞ্চিত হয়। এই সরল সত্য উপলব্ধি না করে মানুষ অন্যের অবস্থার প্রতি ঈর্ষান্বিত হয়। কিন্তু মানুষকে সবসময় নিজস্ব যা কিছু আছে তা নিয়ে সন্তুষ্ট থাকতে হবে। আত্মসন্তুষ্টির পূর্বশর্ত নিজের প্রতি প্রগাঢ় আস্থাশীলতা।

৫৫. নাম মানুষকে বড়ো করে না, মানুষই নামকে বড়ো করে।

মূলভাব: দম্ভ আভিজাত্যের গর্ব মানুষকে বড়ো করে না, বংশমর্যাদার পরিচয়ে মানুষ প্রতিষ্ঠিত হয় না। মানুষ প্রতিষ্ঠিত হয় নিজের পরিচয়ে। অতীতের গর্বে গর্বিত হওয়ার প্রবণতা মানুষকে ছোটো করে। নিজের কর্ম ও যোগ্যতা দিয়ে শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করাই আসল কথা।

সম্প্রসারিত ভাব: গৌরবের অহংকার আর আভিজাত্য মানুষের গুণাবলিকে নষ্ট করে দেয়, উঁচু বংশে জন্মগ্রহণ করে কেউ গর্ববোধ করতে পারে না। কারণ বংশ মানুষকে খ্যাতি দেয় না। মানুষকে খ্যাতি দেয় নিজের কৃতকর্ম। মনে অহংকারবোধ থাকলে পৃথিবীতে উঁচু–নিচু ভেদাভেদ ও বৈষম্য সৃষ্টি হয়। মানুষকে সম্মান না করা, ছোটো বলে কাউকে অবহেলা করা– এইসব অন্যায় কাজ। সব মানুষকেই সৃষ্টি করেছেন এক বিধাতা, একই রক্তমাংস সবার শরীরে। বেঁচে থাকার অধিকার সকলের সমান। অর্থ প্রতিপত্তির বলে যে ব্যক্তি টিকে থাকতে চায়, সে ব্যক্তি যথার্থ মানুষ নয়। মানুষের সত্যিকারের প্রতিষ্ঠা তার কর্মে। ইতিহাসে এমন অনেক দৃষ্টান্ত রয়েছে যাঁরা নিচু বংশে জন্মগ্রহণ করেও পৃথিবীর বুকে টিকে আছেন যুগের পর যুগ। কাজী নজরুল ইসলাম তাঁর মধ্যে অন্যতম। তিনি একটি দরিদ্র, সাধারণ পরিবারে জন্মগ্রহণ করেও ইতিহাসে অবিস্মরণীয়। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বিখ্যাত ঠাকুর পরিবারে জন্মগ্রহণ করেছেন বলেই স্মরণীয় হননি, তিনি তাঁর পারিবারিক পরিচয় ছাপিয়ে বিখ্যাত হয়েছেন শুধু তাঁর সাহিত্যকর্মের জন্য। এ থেকেই বোঝা যায়, মানুষই পারে নিজের নামকে বড়ো করতে, নিজের কর্মকে প্রতিষ্ঠা করতে। যেসব বড়ো বড়ো মনীষীরা পৃথিবীটাকে এত সুন্দর করে গড়ে তুলেছেন, পৃথিবীটাকে সাজিয়েছেন তাঁরা সকলেই বংশ ও মর্যাদাতে খুব বড়ো ছিলেন না। কিন্তু নিজের কর্মে ও চেষ্টায় তাঁরা বড়ো হয়েছেন। বড়ো বড়ো বাগানের গন্ধহীন ফুলের চেয়ে কাদার পদ্মই আমাদের কাছে বেশি পছন্দনীয়।
মন্তব্য: মানুষের আভিজাত্য তার বংশপরম্পরার ওপর নির্ভর করে না। এটা নির্ভর করে তার মহৎকর্মের ওপর। মানুষ এই কর্মের জন্যই যুগে যুগে বেঁচে থাকে সাধারণের মনের মধ্যে। মরেও অমর হয়ে থাকে শুধু তাদের মহৎ কীর্তির জন্য।

৫৬. নানান দেশের নানান ভাষা
বিনা স্বদেশী ভাষা মিটে কি আশা?

মূলভাব: মাতৃভাষা অমৃততুল্য। একমাত্র মাতৃভাষার মাধ্যমেই মনের ভাব সহজে প্রকাশ করা যায়। অন্য ভাষা সমৃদ্ধশালী হলেও তা মানুষের মনের পিপাসা মেটাতে পারে না। মানবমনের ভাব প্রকাশ ও মেধা বিকাশের শ্রেষ্ঠ মাধ্যম হলো সুধাময় এ মাতৃভাষা।
সম্প্রসারিত ভাব: প্রতিটি দেশেরই একটা নিজস্ব মাতৃভাষা আছে, যে ভাষায় সে দেশের মানুষ কথা বলে, ভাব প্রকাশ করে। সবার কাছে তার মায়ের ভাষা একান্ত প্রিয়। একটা শিশু জন্মের পর তাঁর মায়ের ভাষাতেই কথা বলতে শেখে এবং নিজেকে বিকশিত করতে থাকে। ফলে মাতৃভাষা তাঁর নিকট হয়ে ওঠে আপন ও মধুময়। আমরা বাঙালি। আমাদের মাতৃভাষা, ভালোবাসার ভাষা বাংলা। এ ভাষাতেই আমরা কথা বলি, মনের ভাব প্রকাশ করি সানন্দচিত্তে। আমরা আমাদের মাতৃভাষা বাংলাকে শ্রদ্ধা করি। কিন্তু এমন অনেকেই আছে যারা মাতৃভাষার প্রতি বিশেষ শ্রদ্ধাশীল নয়। তারা বাংলাভাষাকে অনুন্নত ও দুর্বল ভাষা বলে অবজ্ঞা করে। তারা অনেকেই বিদেশি উন্নত ভাষাকে গভীরভাবে ভালোবাসে এবং সে ভাষাকেই তাদের অবলম্বন বলে মনে করে। তারা এসব উন্নত ভাষায় জ্ঞান, বিদ্যাশিক্ষা অর্জন করে, উন্নত সংস্কৃতিমান আধুনিক মানুষ হিসেবে প্রতিষ্ঠা পেতে চায়। কিন্তু তাতে অনেকেই

ব্যর্থ হয়। কারণ কোনো বিদেশি ভাষাই তাকে তার মায়ের ভাষার মতো সুখ আর মনের পিপাসা মেটাতে সক্ষম হয় না। বিদ্যাচর্চার ক্ষেত্রে অবশ্য মাতৃভাষার পাশাপাশি বিদেশি ভাষা শেখার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। পৃথিবীর বিভিন্ন ভাষায় দক্ষতা অর্জন করে জ্ঞানের পূর্ণতাদানের জন্যই কেবল বিদেশি ভাষা শেখা দরকার। কিন্তু আমরা যদি মাতৃভাষার থেকে বিদেশি ভাষার প্রতি বেশি আকৃষ্ট হই তখন মাতৃভাষাকে মাশুল দিতে হয়। যেমন দিয়েছিলেন বাংলা ভাষার অমর প্রতিভাধর কবি মাইকেল মধুসূদন দত্ত। তাঁর প্রদীপ্ত মুখের জীবনভাষ্যই আমাদেরকে প্রমাণ করিয়ে দেয় মাতৃভাষার মূল্য। কবি তাঁর ভুল বুঝতে পেরে শেষ জীবনে মাতৃভাষার প্রতি গভীর অনুরাগ প্রকাশ করে গেছেন। যারা মাতৃভাষার প্রতি শ্রদ্ধাশীল নয় তাদের স্বদেশ ত্যাগ করে বিদেশেই পাড়ি জমানো দরকার। মায়ের বুকের দুধ ছাড়া যেমন শিশুর তৃপ্তি মেটে না, তেমনি মাতৃভাষা ছাড়া অন্য কোনো ভাষায় পূর্ণাঙ্গভাবে মনের অভিব্যক্তি প্রকাশ বা পরিপূর্ণ জ্ঞান লাভ সম্ভব হয় না। মাতৃভাষা এতই প্রিয় যে, এ বাংলাভাষার জন্যে আমাদের অনেকেই প্রাণ দিয়েছেন। প্রতিষ্ঠিত করেছেন বাংলাকে জাতীয় ভাষারূপে।

মন্তব্য: মাতৃভাষাকে ভালোবাসা ও এর মর্যাদা সমুন্নত রাখা আমাদের সকলের পবিত্র দায়িত্ব। যে জাতি শিক্ষা–দীক্ষা, জ্ঞানচর্চা, গবেষণা ইত্যাদি কাজে যত বেশি মাতৃভাষার চর্চা করেছে সে জাতি তত বেশি উন্নত হয়েছে। মাতৃভাষার ব্যাপক চর্চা ও বিকাশ ছাড়া জাতীয় উন্নতি সম্ভব নয়।

৫৭. বুদ্ধি যার বল তার

মূলভাব: মানুষই একমাত্র প্রাণী যে কেবল প্রাণেরই অধিকারী নয়, একই সঙ্গে মেধা, মনন ও বুদ্ধিমত্তারও অধিকারী।

সম্প্রসারিত ভাব: গোটা প্রাণীকূলে মানুষের শ্রেষ্ঠত্বের প্রধান কারণ তার বুদ্ধিমত্তা। সৃষ্টির সূচনালগ্নে মানুষ প্রতিকূল প্রকৃতি ও বন্য জীবজন্তুর আক্রমণের কাছে অসহায় ছিল। আদিম অসহায় মানুষ জ্ঞান ও বুদ্ধির চর্চার মাধ্যমে প্রতিনিয়ত সভ্যতার নতুন নতুন দিগন্ত উন্মোচন করে যাচ্ছে। কেননা সে জানে, জ্ঞান ও বুদ্ধির চর্চার জোরেই মানুষ আজ সভ্যতার শীর্ষে অবস্থান করছে। এটিই মানুষের সব থেকে বড়ো শক্তি। আপাতদৃষ্টিতে, শারীরিক শক্তির ক্ষমতা বেশি মনে হলেও বস্তুত, কৌশলী ও বুদ্ধিমান মানুষই অধিক শক্তিশালী। শারীরিক শক্তি দ্বারা যা অর্জন করা যায় তা অত্যন্ত স্বল্প সময়ের জন্য স্থায়ী হয়। ইতিহাসের দিকে তাকালে দেখা যায়, হিটলারের মতো শাসকের শারীরিক ও অস্ত্র শক্তির বলে ক্ষমতা লাভ করলেও পৃথিবীর ইতিহাসে তারা বরণীয় হয়ে থাকতে পারেনি বরং ইতিহাসের কলঙ্কিত অধ্যায়ে তাদের নাম লেখা হয়েছে। স্বল্প সময়ের জন্য তারা গোটা পৃথিবীর শাসন ক্ষমতা নিজ হাতে নিলেও, পরবর্তীতে তারা নিন্দিত হয়েছে। তাদের অপশাসন বেশিদিন টিকে থাকতে পারেনি। অন্যদিকে, যুগে যুগে যারা লড়াইয়ের পথ পরিহার করে, জ্ঞান ও বুদ্ধির চর্চা দ্বারা মানবকল্যাণে অবদান রেখেছেন, ইতিহাসে তাদের নাম স্বর্ণাক্ষরে লেখা হয়েছে। শারীরিক শক্তি প্রয়োগে সমাজে, দেশে সর্বোপরি গোটা পৃথিবীতে দাঙ্গা–হাঙ্গামা, বিশৃঙ্খলা–অশান্তি লেগেই থাকে। কিন্তু বুদ্ধিমান ব্যক্তি বিশৃঙ্খলতার পথ পরিহার করে বুদ্ধির জোরে সকল সমস্যার সহজ ও শান্তিপূর্ণ সমাধান করতে পারে। জগতের সকল প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে মানুষের সব থেকে বড়ো অস্ত্র জ্ঞান ও বুদ্ধিমত্তা।

মন্তব্য: পরম স্রষ্টা একমাত্র মানুষকেই জ্ঞান ও বুদ্ধির সমন্বয়ে সৃষ্টি করেছেন। নিজ নিজ বুদ্ধিমত্তা দ্বারা পৃথিবীর কল্যাণ সাধনের জন্য স্রষ্টা মানুষকে জ্ঞান–বুদ্ধি দিয়েছেন। প্রত্যেকের উচিত নিজ বুদ্ধিমত্তাকে সৎপথে ব্যবহার করে মানবকল্যাণ সাধনে সচেষ্ট হওয়া।

৫৮. নিরক্ষরতা দুর্ভাগ্যের প্রসূতি।

মূলভাব: শিক্ষা মানুষের আত্মিক ও অর্থনৈতিক উন্নতির প্রধান সোপান। আর নিরক্ষরতা মানুষের সামগ্রিক উন্নতিসাধনের প্রধান অন্তরায়। তাই নিরক্ষরতাকে মানুষের দুর্ভাগ্যের প্রসূতি হিসেবে বিবেচনা করা হয়।বস্তুত দুর্ভাগ্যের একটি কারণ নিরক্ষরতা। নিরক্ষরতা মানুষকে ধ্বংসের দিকে ঠেলে নিয়ে যায়। এটা মানবজীবনের চরম অভিশাপস্বরূপ। যার মধ্যে এ জরাজীর্ণ রোগ বিদ্যমান তার জীবন সত্যিই অন্ধকারাচ্ছন্ন।

সম্প্রসারিত ভাব: যে ব্যক্তির মধ্যে শিক্ষার আলো নেই তার মনুষ্যত্বের বিকাশ রুদ্ধ। নিরক্ষরতা সমাজের উঁচু পর্যায়ে উঠতে বাধা হয়ে দাঁড়ায়। নিরক্ষর ব্যক্তি কখনোই সমাজে মূল্যায়িত হয় না। অশিক্ষিত মানুষের সামাজিক, রাজনৈতিক, শিক্ষা, সাংস্কৃতিক সকল বিষয়ে কোনো মৌলিক ধারণা থাকে না। ফলে এসব বিষয়ে সে সম্পূর্ণ অজ্ঞতার অন্ধকারে নিমজ্জিত থাকে। চোখ থাকার পরও আলোকের দুনিয়ায় ব্যথার মুকুট মাথায় পরে তারা জীবন অতিবাহিত করে। জীবনের স্বাদ–আহ্লাদ, উত্থান–পতন সম্পর্কে তাদের কোনোরকম উদ্‌বেগ প্রকাশ পায় না। নিরক্ষর ব্যক্তি কখনো সৌভাগ্যের দ্বারপ্রান্তে পৌঁছাতে পারে না। সবসময় তারা

দুর্ভাগ্যের দ্বারে মাথা ঠোকে। যে সমস্ত দেশে নিরক্ষর লোকের সংখ্যা একটু বেশি তাদের দিকে তাকালে আমরা দেখতে পারি যে, তারা বর্তমান উন্নত বিশ্ব থেকে অনেক পিছে পড়ে আছে। নিরক্ষর ব্যক্তি বা জাতির দ্বারা কখনোই উন্নত কিছু আশা করা যায় না। তাই দেখতে পাই যে, যে দেশ তত নিরক্ষরমুক্ত সে দেশ যত উন্নত। সুতরাং নিরক্ষর ব্যক্তি সমাজের একটা বিস্বাদ কীটস্বরূপ। এরা মানুষের কাছ থেকে ভালো ব্যবহারের পরিবর্তে অপবাদ ও বঞ্চনা পেয়ে থাকে। নিরক্ষর ব্যক্তি কখনো ভালোমন্দ, সাদা–কালো নির্ণয় করতে পারে না। তাই বলা হয়েছে যে, "সুশিক্ষিত লোকমাত্রই স্বশিক্ষিত।" বাস্তবতার প্রেক্ষিতে ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে যে, নিরক্ষরতা জীবনের জন্য মারাত্মক অভিশাপ। এর ছোঁয়া যে পেয়েছে সে দুর্ভাগ্যের সাগরে ভাসছে। নিরক্ষর ব্যক্তি সামাজে প্রতিটি মানুষের কাছে সর্বদা নিচু হয়ে থাকতে বাধ্য থাকে।

মন্তব্য: নিরক্ষর ব্যক্তি সমাজের প্রতিটি মানুষের নিকট ধিকৃত বা ঘৃণিত ব্যক্তি বলে বিবেচিত। সুতরাং নিরক্ষরতা সমাজের একটি চরম অভিশাপ।

৫৯. পথ পথিকের সৃষ্টি করে না, পথিকই পথের সৃষ্টি করে।

[য. বো., দি. বো.'১৯; কু. বো. '১১; সি. বো. '০১; ব. বো. '১১, '০৮]

মূলভাব: পৃথিবীতে কোনো কিছুই আপনা–আপনি হয় না। সবকিছু সৃষ্টির পেছনেই থাকে মানুষের নিরলস প্রচেষ্টা, শ্রম সাধনা আর আন্তরিকতা। হাজারো পথিকের সুদীর্ঘ পথ চলার মাধ্যমে যেমন বনের মধ্যে পথের সৃষ্টি হয় তেমনি মানুষের প্রতিটি সৃষ্টিই তার কর্মপ্রচেষ্টার ফল। মানুষই এ পৃথিবীকে বসবাসযোগ্য করেছে এবং জীবন ও সমাজকে সুন্দর ও সুশৃঙ্খল করার জন্য নানা মত ও পথের সৃষ্টি করেছে।

সম্প্রসারিত ভাব: পথ ও পথিকের মধ্যকার সম্পর্ক অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ। পথ ছাড়া পথিকের মূল্য নেই, আবার পথিক ছাড়া পথেরও কোনো গুরুত্ব নেই। কিন্তু পথ পথিকের সৃষ্টি করে না, পথিকই পথের সৃষ্টিকর্তা। পথিক একটি জায়গা দিয়ে প্রতিদিন হেঁটে যায় বলেই পথের সৃষ্টি হয়। আজ যেখানে বন–জঙ্গাল কাঁটায় আচ্ছাদিত ঝোপ বহু পথিকের পথচলায় সেখানেই সৃষ্টি হয় সুন্দর পথ। পথ চলতে গিয়ে সামনের ঝোপ–ঝাড়, লতা–গুল্ম সরিয়ে, পথের জঞ্জাল দূর করে পথিক সেখানে পথের সূচনা করে। আপনা–আপনি তাই পথের সৃষ্টি হয় না। বহু পথিকের বহুদিনের চলায়ই সে পথের সৃষ্টি। কন্টকাকীর্ণ পথের ন্যায় মানুষের জীবনপথেও ছড়িয়ে থাকে নানা বাধা–বিঘ্ন, ভয়, শঙ্কা, সমস্যার পাহাড়। সকল বাধা–বিঘ্ন অতিক্রম করেই মানুষ সফলতার মুখ দেখে। সাফল্যের সে পথ একদিনে ধরা দেয় না। পথিবীর আদিম পর্যায়ে অরণ্যের হিংস্র পশু–পাখি মানব অস্তিত্ব বিপন্ন করে দেওয়ার জন্য যেন সদা তৎপর ছিল। মানুষের পারস্পরিক সম্পর্ক, সৌহার্দ, পরিশ্রম এ পৃথিবীতে মানুষের অস্তিত্বকে নিষ্কণ্টক করেছে। কালক্রমে মানুষের ত্যাগ–তিতিক্ষা ও বুদ্ধি–বিবেকের দ্বারা এ সভ্যতা বিকাশ লাভ করেছে। তাই অসংখ্য মানুষের যূথবন্ধ জীবনচর্চার ফল আজকের সমাজ ও সভ্যতা। মানুষ তিলে তিলে যেমন সমাজ–সভ্যতা গড়ে তুলেছে, তেমনি যুগে যুগে মানুষের কল্যাণে সৃষ্টি করেছে নানা রকম মত ও পথ। পথ তৈরি হয় পথিকের সামনের দিকে অগ্রসর হওয়ার জন্য। যাত্রা যাতে সহজ হয় সেদিকে লক্ষ রেখেই পথের সৃষ্টি। কিন্তু জীবনের লক্ষ্য অর্জনের জন্য, স্বপ্ন বাস্তবায়নের জন্য পূর্বপ্রতিষ্ঠিত পথ সহায়ক নয়। তাই জীবনকে সার্থক করে তুলতে হলে, অজানাকে জানতে হলে অপরের তৈরি পথ পরিহার করে নতুন পথের সন্ধান করতে হবে।

মন্তব্য: মানুষ সাধনা দিয়েই তার চলার পথকে সহজ করে, শত বাধা–বিপত্তি মোকাবিলা করে জীবন চলার পথকে মসৃণ করে। ভ্রান্ত পথ কখনো তাকে মোহগ্রস্ত করতে পারে না। কারণ সে সচেতন– সে বিশ্বাস করে পথিকই পথের স্রষ্টা।

৬০. পথের প্রান্তে আমার তীর্থ নয়
পথের দুধারে আছে মোর দেবালয়।

[ঢা. বো. '০৩; সি. বো. '১৪, '১২]

মূলভাব: দেবতাকে পেতে হলে দূরবর্তী অসীমের দিকে ধাবিত হতে হবে না, বরং জীবনের চারপাশে সন্ধান করলেই দেবতাকে পাওয়া যাবে। কেননা তিনি জীবের চারপাশেই থাকেন।

সম্প্রসারিত ভাব: দেবতাকে পাওয়ার বাসনায় অনেকেই অসীমের পানে ধ্যানমান থাকেন। জগৎসংসারের সকল মায়া ছিন্ন করে তীর্থে তীর্থে ঘুরে বেড়ান দেবতার তুষ্টির জন্য। তারা ভুলে যান জীবের মাঝেই বাস করেন জগৎস্বামী। এ সহজ সত্য উপলব্ধিতে ব্যর্থ হয়ে তারা মূলত মূল্যবান জীবনের অপচয় করেন। জীবনে মোক্ষলাভের জন্য মানুষ তার জীবনের তীর্থধামে ছুটে যেতে চায়, কিন্তু একটু গভীরভাবে বিচার করলে আমাদের সমাজেই সে তীর্থের সন্ধান পাওয়া যাবে। প্রত্যেক ধর্ম, গোত্র, বর্ণ, সম্প্রদায়ের

মানুষের একটা নির্দিষ্ট লক্ষ্য থাকে। জীবনকে সেই লক্ষ্যে নিয়ে যাওয়ার জন্য তারাই সেই মতো কাজ করেন। প্রত্যেক ধর্মের সাধারণ মানুষের লক্ষ্য থাকে মৃত্যুর পরে তার আত্মা যেন কষ্ট না পায়, এজন্য ইহজগতে তারা পুণ্য কাজ করতে আগ্রহী হন। এসবের জন্য পূণ্য সঞ্চয়ের উদ্দেশ্যে হিন্দুরা যায় তীর্থ করতে, মুসলমানেরা যায় হজ করতে। কিন্তু গভীরভাবে বিচার করলে দেখা যাবে, পুণ্য সঞ্চয়ের জন্য আমাকে লাখ টাকা খরচ করে বিদেশে যেতে হবে না। নিজ পরিবেশ, নিজ সমাজ, নিজ দেশে থেকেই পুণ্যের কাজ করা সম্ভব।

মন্তব্য: যে টাকা ব্যয় করে তীর্থ করতে যাব; সে টাকা দিয়ে সৎ কাজ করলে এবং সে কাজের মাধ্যমে যদি জাতি, সমাজ ও দেশ উপকৃত হয়, তবে এর চেয়ে পুণ্য আর কিছু নেই। এর জন্য প্রয়োজন আমাদের মনের সংস্কার, প্রয়োজন আমাদের সৎ মনোবৃত্তি।

৬১. পরিশ্রম সৌভাগ্যের প্রসূতি

[রা. বো. '১৩, '০৬; য. বো. '০৭]

মূলভাব: কঠোর পরিশ্রম ও সাধনা মানবজীবনকে উন্নতির স্বর্ণশিখরে আরোহণ করতে সাহায্য করে। পরিশ্রমহীন জীবন বৃথা।

সম্প্রসারিত ভাব: আমাদের জীবন গতিশীল। এখানে অলসতার কোনো ঠাঁই নেই। সংগ্রামমুখর আমাদের জীবন। জীবনসংগ্রামের হাতিয়ার হচ্ছে পরিশ্রম। পরিশ্রম দ্বারাই মানুষ তার ভাগ্যের চাকা ঘোরাতে পারে। ইংরেজিতে একটা কথা আছে "Industry is the key to success" অর্থাৎ 'পরিশ্রম সাফল্যের চাবিকাঠি।' পরিশ্রম দ্বারা কেবল জীবনকে কর্মমুখর করতে পারলেই দুঃখ দূর হয়। কষ্টের অমানিশা কেটে যায়, জীবন হয় সুন্দর ও মধুময়। যারা অলস ও কর্মবিমুখ তারা কখনো সুখের মুখ দেখতে পারে না। তাদের জীবন হয় ক্লেদাক্ত, নোংরা আর হতাশাগ্রস্ত। তাদের সম্পর্কে বলা যায়– "যারা এই বৃহৎ জগতে কর্মবিমুখ তারা কখনো প্রকৃতভাবে বাঁচতে শেখেনি।" যে কৃষক রোদে পুড়ে, বৃষ্টিতে ভিজে হাল চাষ করে না, বীজ বপন করে না, সোনালি ফসলে তার গৃহ ভরে ওঠে না। কর্মবিমুখ মানুষ সবসময় ভাগ্যের ওপর নিজেকে সমর্পণ করে। কিন্তু পরিশ্রমী মানুষ দেহের বিন্দু বিন্দু ঘাম দিয়ে খুলে ফেলে সৌভাগ্যের সোনালি দুয়ার। সে তার শক্তি, মেধা ও মননকে কাজে লাগিয়ে সহজেই রচনা করতে পারে সাফল্যের নতুন দিগন্ত। গৌরবময় ইতিহাসে যাদের নাম সোনার হরফে লেখা আছে, তারা কেউ অলস ছিলেন না। তারা প্রত্যেকে ছিলেন কর্মচঞ্চল ও কর্মপ্রিয় মানুষ। হযরত মুহম্মদ (সা.), শ্রীচৈতন্য, যিশুখ্রিস্ট প্রমুখ মহৎপ্রাণ ব্যক্তিদের কর্মময় জীবনী পৃথিবীর প্রতিটি মানুষকে যেকোনো কাজে প্রেরণা যোগায়। তাই এসব মহৎ ব্যক্তিরা আমাদের সমাজের নমস্য। এঁরা পরিশ্রম দ্বারাই জগতে বিখ্যাত হয়েছিলেন, প্রতিষ্ঠা পেয়েছিলেন। তাঁরা মানুষের উন্নতির জন্য করেছেন অক্লান্ত পরিশ্রম। বর্তমান বিশ্বে সর্বত্র চলছে পরিশ্রমের জয়জয়কার। জীবনের সর্বস্তরে উন্নতি করতে হলে পরিশ্রম প্রয়োজন। পরিশ্রমী জাতিই পারে দেশকে গৌরবের আসনে সুপ্রতিষ্ঠিত করতে।

মন্তব্য: পরিশ্রমের কষ্টিপাথরে জীবনকে যাচাই করার ভেতরেই মানুষের শ্রেষ্ঠত্ব। কারণ গতিতে জীবন, স্থিতিতে মরণ। পৃথিবীতে নিজের আসন অমর রাখতে হলে পরিশ্রম দ্বারাই তা সম্ভব।

৬২. পরের অনিষ্ট চিন্তা করে যেই জন
নিজের অনিষ্ট বীজ করে সে বপন

মূলভাব: যে মানুষ অপরের ক্ষতিসাধনের চেষ্টা করে, পরিণামে তাকেই ক্ষতির মুখোমুখি হতে হয়। প্রকৃতি সর্বদা সমতা নিয়ন্ত্রণ করে বলেই মানুষকে এ বাস্তবতার মুখোমুখি হতে হচ্ছে।

সম্প্রসারিত ভাব: মানবজীবনের মহৎ গুণাবলির মধ্যে পরের প্রতি সহানুভূতিশীল হওয়া একটি মহৎ গুণ। সকল মানুষের যাবতীয় কর্মপ্রচেষ্টার মূল উদ্দেশ্য হলো সুখে–শান্তিতে ও আরাম–আয়েশে থাকা। এ দুনিয়ায় কত রকমের মানুষ দেখা যায়। কেউ নিজের সবকিছু দিয়ে, এমনকি প্রাণ দিয়েও পরের উপকার করে। আবার এমন লোকও আছে, যারা পরের ভালো তো করেই না; বরং কী করে সর্বনাশ করা যাবে সেই চিন্তায় সবসময় মশগুল থাকে। এ ধরনের মানুষ নেহাতই অমানুষ। তাদের অনিষ্ট আচরণে শুধু সে নয়, সাথে অন্য ব্যক্তি ও সমাজ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। যে নিজের উপকার হবে ভেবে অন্যের ক্ষতি করার চেষ্টা চালায়, মূলত সে নিজেই তার ক্ষতি করে। পৃথিবীতে মহাপুরুষগণের জীবনী পাঠে দেখা যায়, তাঁরা সমগ্র জীবন মানুষের কল্যাণসাধনে বিলিয়ে দিয়েছেন। মহানবি হযরত মুহাম্মদ (সা.)– এর চলার পথে এক বৃদ্ধা বিদ্বেষবশত প্রতিদিন কাঁটা বিছিয়ে রাখত। মহানবি (সা.) কাঁটার আঘাতে কষ্ট পেলেও বৃদ্ধাকে কোনোদিন গালমন্দ করেননি। একদিন হযরত মুহাম্মদ (সা.) তাঁর চলার পথে কাঁটা দেখতে না

পেয়ে বিস্মিত হন এবং খবর নিয়ে জানতে পারলেন যে বৃদ্ধা এই কাজ করতেন তিনি ভীষণ অসুস্থ। মহানবি হযরত মুহাম্মদ (সা.) তৎক্ষণাৎ বৃদ্ধাকে দেখার উদ্দেশ্যে বাড়িতে যান এবং তার অসুখের জন্য সমবেদনা প্রকাশ করেন। এতে বৃদ্ধা বিস্মিত হয়ে যান। তিনি উপলব্ধি করতে পারেন, পরের অনিষ্ট চিন্তা ও কাজের মধ্যে কোনো মঙ্গল নেই; বরং এরূপ পরের অনিষ্ট চিন্তা ও কাজ নিজের ধ্বংস ডেকে আনে। পরের অনিষ্ট করতে গিয়ে বহু লোক নিজেদের জীবনকেই ধ্বংস করেছে। এমন বহু নজির ইতিহাসের পাতায় রয়েছে। এ বিচিত্র জগতে মানুষ ক্ষুদ্র স্বার্থোদ্ধারে এত অন্ধ হয়ে পড়ে যে, পরের মঙ্গল ও অনিষ্ট করতে গিয়ে স্বাভাবিক জ্ঞানবুদ্ধি হারিয়ে ফেলে এবং পরিণামে নিজের ধ্বংস নিজেই ডেকে আনে।

মন্তব্য: কখনোই অপরের কোনো অকল্যাণ চিন্তা করা যাবে না। এসব পরিহার করে পরের স্বার্থে নিজের জীবনকে বিলিয়ে দিতে হবে তবেই জীবন সার্থক এবং সুন্দর হবে।

৬৩. পাপীকে নয়, পাপকে ঘৃণা করো।

মূলভাব: কাউকে তার পাপকর্মের জন্য ঘৃণা করা অনুচিত; বরং তার অপকর্মকেই আমাদের ঘৃণা করা উচিত।

সম্প্রসারিত ভাব: মানুষ নিষ্পাপ অবস্থায় পৃথিবীতে এলেও ধীরে ধীরে সে বড়ো হলে তার চাহিদারও বিস্তৃতি ঘটে। পরবর্তীকালে প্রতিকূল পরিবেশ তথা সমাজবাস্তবতার কারণে সে পাপকর্মে জড়িয়ে পড়ে। পাপী পাপ করে এবং পাপের জন্য পাপীকে দন্ড দেওয়ার বিধান আছে। সমাজ সংসারে পাপী পাপকর্মে লিপ্ত থাকলে তার জন্য কেউ অনুকম্পা দেখায় না; বরং লোকে তাকে ঘৃণা করে। মানুষ পাপকাজে লিপ্ত হলে জনসাধারণ তার প্রতি ঘৃণাই প্রকাশ করে। কিন্তু এক্ষেত্রে একটু চিন্তা করে দেখতে হবে যে, পাপীকে ঘৃণা না করে তাকে সংশোধন হওয়ার সুযোগ দেওয়া যায়। কেননা সে মানুষ। পাপী হওয়ার জন্য তাকে ঘৃণা করা বাঞ্ছনীয় নয়। কোনো প্রলোভনে পড়ে বা যৌবনের দুর্বার উত্তেজনায় সে পাপাচারে লিপ্ত হয়েছিল। সে নিজের ভুল বুঝতে পেরে পাপের জন্য যদি অনুশোচনা করে ও ন্যায়ের পথে ফিরে এসে সুন্দর জীবনের অধিকারী হয় তাই তার জন্য কাছে দ্বার উন্মুক্ত রাখা দরকার। পাপী যদি অনুকূল পরিবেশ পায়, একটু স্নেহ-মমতার পরশ পায় তাহলে তার ভেতরে অনুশোচনার সৃষ্টি হবে। ফলে একসময় সে ধীরে ধীরে স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসবে। পাপীদের সুপথে ফিরিয়ে আনার জন্য, তাদের হৃদয় পরিশুদ্ধ করা ও বিবেকবোধ জাগ্রত করার জন্য আমাদের তাদের সাথে বন্ধুসুলভ আচরণ করতে হবে। পাপী পাপ করেছে বলে তাকে সমাজচ্যুত করতে হবে বা নির্বাসন দিতে হবে তার কোনো মানে নেই।

মন্তব্য: পাপীকে ঘৃণা না করে তার পাপকে ঘৃণা করা দরকার। কারণ পাপী তার পূর্ব কাজের সংশোধনের দ্বারা পাপহীন নির্মল জীবনে ফিরে আসতে পারে, সত্যিকার মানুষ হিসেবে পরিচিত হতে পারে।

৬৪. পিতামাতা গুরুজনে দেবতুল্য জানি,
যতনে মানিয়া চল তাহাদের বাণী।

মূলভাব: বাবা, মা ও অভিভাবকবৃন্দ আমাদের জীবন গঠন ও পরিচালনার জন্য যেসব উপদেশ দেন, সেগুলো মেনে চলা কর্তব্য।

সম্প্রসারিত ভাব: পিতা-মাতা আমাদের জীবন দান করেন এবং অনেক কষ্ট করে লালন-পালন করেন। পিতা-মাতার সঙ্গে অন্য গুরুজনরাও আমাদের সুস্থ জীবন বিকাশে সহায়তা করেন এবং অনেক কষ্ট স্বীকার করে আমাদের বড়ো করে তোলেন। এঁরা সবাই বয়সে, জ্ঞানে, বুদ্ধিতে, প্রজ্ঞায় আমাদের থেকে অনেক বড়ো। তাঁরা আমাদের স্নেহ করেন, ভালোবাসেন এবং সর্বদাই মঙ্গল কামনা করেন। অভিজ্ঞতার আলোকে তাঁরা জানেন কী করলে আমাদের ভালো হবে। নবীনতা ও অনভিজ্ঞতার কারণে এই কঠিন ও জটিল পৃথিবীর অনেক কিছুই আমাদের অজানা। সেজন্য পিতা-মাতা, গুরুজন ও বিশ্বের মহান ব্যক্তিদের উপদেশ চলার পথে আলোকবর্তিকা হিসেবে গ্রহণ করতে হবে। আর তা না করতে পারলে জীবনে সফলতা আসবে না। প্রতি মুহূর্তে আমরা হোঁচট খাব। আমরা জানি, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, বায়েজিদ বোস্তামি কীভাবে গুরুজনদের আদেশ-উপদেশ পালন করেছেন। আর সে কারণেই তাঁরা আজ সকলের শ্রদ্ধার পাত্রে পরিণত হতে পেরেছেন। তাই পিতা-মাতা, গুরুজন আদর্শস্থানীয়, দেবতুল্য এবং আরাধনাযোগ্য। তাঁদের বাণী অনুসরণ করে নিজের জীবন গড়তে হবে এবং দেশ, জাতি তথা সমগ্র বিশ্বকে শাশ্বত কল্যাণের দিকে এগিয়ে নিতে হবে।

মন্তব্য: পিতা-মাতা, গুরুজন ও বিশ্বের মহান ব্যক্তিদের উপদেশ মানলে নিজের জীবন সুন্দর ও বিকশিত হবে এবং দেশ ও জাতি উন্নতির শিখরে পৌঁছাতে পারবে।

৬৫. পুণ্যে পাপে, দুঃখে–সুখে পতনে–উত্থানে
মানুষ হইতে দাও তোমার সন্তানে। [ব. বো. '০২; ঢা. বো. '১১]

মূলভাব: প্রকৃত মানুষ হওয়া খুবই কঠিন ও কষ্টকর। এর জন্য কঠোর পরিশ্রম, সাধনা ও ত্যাগ–তিতিক্ষার প্রয়োজন হয়। নানা বাধা–বিপত্তি ও সমস্যা–জটিলতার সাথে যুদ্ধ করে জীবনকে সফল ও সমৃদ্ধ করতে হয়। সময়ের ঘাত–প্রতিঘাতের কষ্টিপাথরে নিজেকে উত্তীর্ণ করতে পারলেই প্রকৃত মানুষ হওয়া যায়।

সম্প্রসারিত ভাব: জীবন পরিচালনার জন্য শারীরিক ও মানসিক শক্তি এবং সামর্থ্য অর্জন করা খুবই জরুরি। কেননা জীবন পুষ্পশয্যা নয়, বরং কন্টকাকীর্ণ ও সমস্যাময়। চলার পথে পদে পদে নানা প্রতিকূলতা, নানা প্রতিবন্ধকতার মুখোমুখি হতে হয়। এতে আছে অভাব–অনটন, দুঃখ–দারিদ্র্য, যন্ত্রণা–শোক, উত্থান–পতনের নানা পর্যায়। সেসব পর্যায়ের সাথে তাল মিলিয়ে চলতে না পারলে ব্যর্থতা অনিবার্য। এ ব্যর্থতা জীবনকে হতাশা ও নিরাশার অন্ধকারে ডুবিয়ে দেয়। ফলে একসময় জীবন হয়ে ওঠে নিরর্থক ও মূল্যহীন। এমন মূল্যহীন জীবন কারও প্রত্যাশিত নয়। এজন্য যেকোনো দ্বন্দ্ব–সংঘাত, সমস্যা–জটিলতা, দুঃখ–শোকের মোকাবিলা করে টিকে থাকতে হবে। কেননা চলমান জীবনে দুঃখ–কষ্ট আসবেই, বিপদ–আপদ, সমস্যা আসবেই। তাই বলে হাত–পা গুটিয়ে বসে থাকলে চলবে না, বরং শক্তি ও মনোবল অটুট রেখে পাপ, দুঃখ ও পতন থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য বুদ্ধিদীপ্ত লড়াকু ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে হবে। তাহলেই আসবে কাঙ্ক্ষিত বিজয়, উন্নতি ও সমৃদ্ধি। অনেকদিন ধরেই লক্ষ করা যাচ্ছে অনেক মা–বাবা তাদের সন্তানদের এমনভাবে গড়ে তুলছেন যে ফুলের ঘায়েই মূর্ছা যাবে। তারা তাদেরকে দিয়ে কোনো কাজ করান না, কোথাও পাঠান না। তাহলে সন্তানরা পরিশ্রমী হবে কীভাবে? জানবে এবং শিখবে কীভাবে? তাদের অভিজ্ঞতা ও দক্ষতা বাড়বে কীভাবে? এমন হলে তারা কষ্ট করতে শিখবে না, দুঃখ সইতে পারবে না, কোনো সমস্যার মোকাবিলা করতে পারবে না। বই আর ইন্টারনেটের তত্ত্ব আর তথ্য দিয়ে তো জীবন এগিয়ে নেওয়া যাবে না। তার জন্য সরেজমিনে পর্যবেক্ষণ করতে হবে, হাতে–কলমে শিখতে হবে, কঠিন কঠিন বাস্তবের মুখোমুখি হতে হবে। তাহলেই তো তারা সমাজ, দেশ তথা পৃথিবীর উপযোগী মানুষ হয়ে উঠতে পারবে। এখনকার মানবসমাজে এমন কর্মঠ, সক্রিয়, সচেতন ও বুদ্ধিদীপ্ত মানুষই দরকার।

মন্তব্য: বর্তমান এবং নতুন প্রজন্মকে এরকম মানুষ করেই গড়ে তুলতে হবে। যাতে তারা পুণ্য–পাপে, দুঃখে–সুখে, পতনে–উত্থানে হিমালয়ের মতো মাথা উঁচু রেখে অনায়াসে মোকাবিলা করতে পারে। সেই সাথে হয়ে উঠতে পারে সক্ষম, স্বশিক্ষিত ও গর্বিত মানুষ।

৬৬. গ্রন্থগত বিদ্যা আর পর হস্তে ধন
নহে বিদ্যা, নহে ধন, হলে প্রয়োজন।

SINCE 1993 NABARUN PUBLICATIONS

[সি. বো. '০১]

মূলভাব: বিদ্যা অর্জন করে যদি দৈনন্দিন জীবনে সেই বিদ্যা কাজেই না লাগানো যায় তবে সে বিদ্যা যেমন অর্থহীন তেমনি আহরিত সম্পদ প্রয়োজনের সময় কাজে লাগাতে না পারলে সে সম্পদও অর্থহীন।

সম্প্রসারিত ভাব: মানুষ অর্থসম্পদ এবং জ্ঞান আহরণের জন্য কঠোর পরিশ্রম করে। কারণ অর্থ আর জ্ঞানই মানুষকে পরিপূর্ণতা দান করে। এই বিদ্যা অর্জন এমন সহজসাধ্য কিছু নয়। গ্রন্থে বিদ্যা লিখিত থাকে আর পরিশ্রম ও সাধনা দিয়ে সেই বিদ্যা অর্জন করতে হয়। তেমনি পৃথিবীতে অনেক অর্থও ছড়িয়ে আছে, যা অর্জন করতে পরিশ্রম করতে হয়। কোনো পরিশ্রম না করে শুধু কিছু বই সংগ্রহ করে রেখে দিলে সেই বিদ্যা কোনো কাজে লাগে না। বইয়ের পাতায় সীমাবদ্ধ বিদ্যা জীবনে যদি কোনো কাজেই না লাগে তবে সেই বিদ্যা অসার বলে বিবেচিত হয়। আবার অর্জিত টাকা পরের হাতে তুলে দিলে সেই টাকা কোনো কাজেই লাগবে না। মানুষকে দেখানোর জন্য এবং নিজেকে জ্ঞানী প্রমাণিত করার জন্য অনেকে বই দিয়ে নিজের গৃহ সুসজ্জিত করে রাখেন। অনেক ছাত্র–ছাত্রী শুধু পরীক্ষা পাশের জন্য গ্রন্থপাঠ করে থাকে। কিন্তু এ পদ্ধতিতে প্রকৃত জ্ঞান অর্জন হয় না। গ্রন্থ পাঠ করে অন্যকে বোঝানোর ক্ষমতা অর্জন করতে পারলে গ্রন্থপাঠ সার্থক হয়ে ওঠে। তেমনি সঞ্চিত অর্থ অপরের কাছে রেখে কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করলেও প্রয়োজনের সময় সে অর্থ না পেলে পরিকল্পনা বিফল হয়ে যায়। তাই গ্রন্থের জ্ঞানকে বাস্তবে প্রয়োগ করার ক্ষমতা অর্জনের চেষ্টা করা উচিত। অনুরূপভাবে পরনির্ভরশীল না হয়ে আত্মনির্ভরশীলতা অর্জনের চেষ্টা করা প্রয়োজন। পৃথিবীতে মানুষের একমাত্র অবলম্বন হচ্ছে আশা। আশায়ই মানুষ বেঁচে থাকে। তাই বিদ্যা ও ধন উভয়ই প্রয়োজন সাধনের জন্য একান্ত প্রয়োজন। সেই প্রয়োজন যদি সাধিত না হয় তখন বিদ্যা বা ধনের কোনো মূল্য থাকে না।

মন্তব্য: অপরের হস্তের ধন আর গ্রন্থগত বিদ্যা নিজের হয় না। তাই নিজের সম্পদ হিসাবে বিদ্যা ও ধন অর্জন করতে হবে।

৬৭. ঘুমিয়ে আছে শিশুর পিতা
সব শিশুদের অন্তরে।

মূলভাব: আজকের শিশুই আগামী দিনের উন্নয়ন, কল্যাণ, আশা–আকাঙ্ক্ষা ও স্বপ্নের পথিকৃৎ। একটি শিশুর সুষ্ঠু ও পরিপূর্ণ বিকাশের ওপরই নির্ভর করে জাতির ভবিষ্যৎ। তাই মানবজীবনে শিশুকালের বিশেষ গুরুত্ব আছে এবং তার প্রেক্ষিতে শিশুদের প্রতি সকল মানুষের যত্নশীল হওয়া একান্ত আবশ্যক। তাই বলা হয়, শিশুর ভেতরই শিশুর পিতা বিদ্যমান থাকে।

সম্প্রসারিত ভাব: আজকের শিশুরাই আগামী দিনের ভবিষ্যৎ। তারাই একদিন জাতীয় জীবনের ভার গ্রহণ করবে। প্রতিটি শিশুর ভেতরের সেই আকাঙ্ক্ষা তৈরি করার জন্য সকলকে সচেষ্ট হতে হবে। শিশু যদি অনুকূল আবহাওয়া ও পরিবেশ পায়, তবে সে সুশিক্ষিত ও আদর্শ নাগরিক হিসেবে গড়ে উঠবে। শিশুর মধ্যে গুণাবলি গোপন থাকে, বয়স বাড়ার সাথে সাথে তা বিকশিত হতে থাকে। আমরা যদি বিশ্বসভায় নিজেদের সুপ্রতিষ্ঠিত দেখতে চাই তবে আজকের শিশুকে আগামী দিনের উপযুক্ত কর্ণধার হিসেবে গড়ে তোলার দায়িত্বভার নিতে হবে। তবেই জাতি হবে সার্থক এবং দেশ পাবে যথার্থ সন্তান। কেননা প্রতিটি শিশুর মধ্যেই লুকিয়ে থাকে অফুরান সম্ভাবনার প্রতিশ্রুতি। তারা জাতির ভবিষ্যৎও বটে। কবি বলেছেন : 'শিশুরা জাতির ভবিষ্যৎ পিতা'। দেশ তথা জাতির আকাঙ্ক্ষা এই যে, আজকের শিশুই একদিন বিকশিত হয়ে উঠবে। সে গড়ে উঠবে একজন আদর্শ নাগরিক হিসেবে, কেননা শিশুর মধ্যে নিহিত থাকে ভবিষ্যৎ আশা–আকাঙ্ক্ষা। এ কারণে দরকার শিশুকে সঠিক পথে পরিচালিত করা। এটা কারও অজানা নেই যে, উপযুক্ত পরিবেশ ও উপযুক্ত শিক্ষার অভাবে এ দেশের বহু শিশুর ভবিষ্যৎই অঙ্কুরে বিনষ্ট হচ্ছে।

মন্তব্য: যদি আমরা বিশ্বসভায় যথাযোগ্য স্থানে দেশ ও জাতিকে বসাতে চাই তবে শিশু–মানসের যথোপযুক্ত বিকাশের ব্যবস্থা গ্রহণ করা দরকার। বর্তমানের শিশুরাই আগামী দিনের জাতির নেতৃত্ব দিবে। তাই শিশুদের যথাযোগ্য পরিচর্যার মাধ্যমে গড়ে তুলতে হবে।

৬৮. চকচক করলেই সোনা হয় না।

মূলভাব: বাহ্যসৌন্দর্য, চাকচিক্য ও সাজসজ্জা দেখে কোনো কিছুকে গুণসম্পন্ন বা মূল্যবান মনে করা ঠিক নয়।

সম্প্রসারিত ভাব: বিশ্ব সংসারে আপাত সুন্দর অন্তঃসারশূন্য বস্তুর অভাব নেই। সর্বত্রই নকল, অসার ও আড়ম্বরপূর্ণ বস্তু ছড়িয়ে আছে। কোনো বস্তুর বাহ্য ও অভ্যন্তরীণ গুণাবলি পরীক্ষা করা প্রয়োজন। বাহ্য গুণাবলি পরীক্ষা করা সহজ। আর অভ্যন্তরীণ গুণ পরীক্ষা করা দুরূহ। এক্ষেত্রে ভুল সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। কারণ ভিন্ন ভিন্ন মূল্যে একাধিক বস্তুর আকার–আকৃতি একই রকম হতে পারে। যেমন : সোনার রং হলুদ। পৃথিবীতে হলুদ রঙের অনেক কৃত্রিম ও মূল্যহীন জিনিস রয়েছে। আবার সোনার ধর্ম চকচক করা। কিন্তু পৃথিবীতে অনেক মূল্যহীন বা স্বল্পমূল্যের জিনিসও সোনার মতো চকচক করে। তাই সেসব মূল্যহীন বা স্বল্পমূল্যের জিনিসকে সোনা বলে মনে করা হলে মারাত্মক ভুল হবে। তাই বস্তুর মূল্য নিরূপণ ও গুরুত্ব নির্ধারণের জন্য বাহ্য রূপের পাশাপাশি গুণাগুণও বিচার করা উচিত। আমাদের সমাজে অনেকের বাহ্য সৌন্দর্য ও মিষ্টি কথা শুনে অনেক মানুষকে ভালো মানুষ আখ্যা দিয়ে থাকি। কিন্তু ব্যক্তির স্বভাব–চরিত্র প্রকাশ করলে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সে ধারণা ভ্রান্ত বলে প্রমাণিত হয়। কারণ বাহ্যদৃষ্টিতে ভালো মানুষ বলে মনে হলেও অধিকাংশ ক্ষেত্রে এ শ্রেণির মানুষের স্বভাবচরিত্র খারাপ প্রকৃতির হয়ে থাকে।

মন্তব্য: ধূর্ত লোকদের বাহ্যিক চাকচিক্যে আকৃষ্ট হলে অবশ্যই ঠকতে হবে। সুতরাং চকচক করলেই তা দেখে সোনা মনে করা বুদ্ধিমানের কাজ নয়। এমনটি করলে ব্যক্তিগত জীবনে অথবা সমাজজীবনে দুঃখের সীমা থাকবে না।

৬৯. পুষ্প আপনার জন্য ফোটে না। পরের জন্য তোমার হৃদয়কুসুমকে প্রস্ফুটিত করিও।/
আপনারে লয়ে বিব্রত রহিতে, আসে নাই কেহ অবনী পরে/বলো মিথ্যা আপনার সুখ, মিথ্যা আপনার দুঃখ।/
স্বার্থমগ্ন যেজন বিমুখ, বৃহৎ জগৎ হতে; সে কখনো শেখেনি বাঁচিতে।

মূলভাব: পরার্থে জীবন উৎসর্গ করার মাধ্যমে মানবজীবন সার্থকতায় উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। ফুলের মতোই মানুষের জীবন। ফুল ফোটে সুবাস ছড়ায়। তার সৌরভে চারদিক আমোদিত হয়। এভাবে সৌরভ ছড়ানোর মধ্যে সে তার সার্থকতা খুঁজে পায়। তদ্রূপ আত্মকেন্দ্রিক চিন্তাভাবনার পরিবর্তে পরার্থে জীবন উৎসর্গ করার মধ্যেই নিহিত মানবজীবনের প্রকৃত সার্থকতা।

সম্প্রসারিত ভাব : বৃক্ষের জীবনের সার্থকতা অজস্র ডালপালায় নয়; তার জীবনের পরিপূর্ণতা ফুলে ও ফলে। মাটিতে থাকে তার মূল কিন্তু আনন্দময় প্রকাশতায় থাকে ফুল। ফুলের বর্ণসুষমায় ও সুরভিতে চারদিক আমোদিত হয়। আসে ফুলের বন্ধু মৌমাছি, ভ্রমর, প্রজাপতি; আসে সৌন্দর্যপ্রিয় মানুষ। দেবতার পূজায় বা মানুষের আনন্দঘন মুহূর্তে পুষ্পজীবন ধন্য হয়। ধূপ যেমন নিজেকে পুড়িয়ে অপরকে গন্ধ বিলায়, প্রদীপ যেমন নিজেকে জ্বালিয়ে অন্যকে আলো বিতরণ করে, তেমনি পরার্থে জীবন ব্যয়ের মধ্য দিয়ে মানবজীবনের সার্থকতা প্রতিপন্ন হয়। প্রকৃতির অবারিত অজ্ঞানে আপন সৌন্দর্য মেলে দিয়ে বিকশিত হয় পুষ্প। ফুল শুধু বীজের উত্তরসূরি নয়। মধুর সৌন্দর্যে সে সকলকে মুগ্ধ করে। এমনকি যে ব্যক্তি স্বেচ্ছায় ফুলের সুবাস গ্রহণ করে না, বাতাসে ভর করে ফুল তার সুবাস সে ব্যক্তির কাছেও পৌঁছে দেয়। কাজেই দেখা যায়, সুগন্ধি ফুল কখনো তার সুরভিকে নিজের মধ্যে আবন্ধ রাখে না। পুষ্প তার আপন অন্তরে সৌন্দর্য ও সুগন্ধ ধারণ করে বটে, কিন্তু কিছুই সে নিজে ভোগ করে না। পরের জন্য সে তার সৌন্দর্য ও সুবাসকে বিলিয়ে দেয়। তারপর একদিন সে মাটির বুকে ঝড়ে পড়ে। এটা তার অবসান নয়; বরং সার্থক পরিণতি। মানুষের জীবনকে ফুলের সাথে তুলনা করা যেতে পারে। জীবনের আদর্শ হওয়া উচিত পরার্থে আত্মোৎসর্গ। আত্মকেন্দ্রিক স্বার্থমগ্ন জীবন অমর্যাদাকর, অসুন্দর ও বিকৃত।

মন্তব্য: তাই আদর্শ জীবন গঠনে নিজেকে পুষ্পের মতো সৌন্দর্য ও সুগন্ধে বিকশিত করে তুলতে হবে। পরের কল্যাণে নিজেকে বিলিয়ে দেওয়ার মধ্যেই মানবজীবনের সার্থকতা নিহিত। হযরত মুহম্মদ (সা.), শ্রীচৈতন্য, বুদ্ধদেব, মাদার তেরেসা প্রমুখ এর জলজ্যান্ত উদাহরণ। তাই প্রত্যেকের উচিত ধূপ, চন্দন ও ফুলের ন্যায় পরের কল্যাণে জীবন উৎসর্গ করা।

৭০. প্রয়োজনীয়তাই উদ্ভাবনের জনক।

মূলভাব: নতুন কোনো কিছু আবিষ্কার ও উদ্ভাবনের মূল চাবিকাঠি হলো প্রয়োজন। প্রয়োজনের তাগিদেই মানুষ নিত্যনতুন উদ্ভাবনে ব্যাপৃত হয়।

সম্প্রসারিত ভাব: সব সৃষ্টির পেছনেই একটি রহস্য বা কারণ রয়েছে। এ জগতে কোনো কিছু আকস্মিকতায় সৃষ্টি নয়। একদিন আমাদের পূর্বপুরুষেরা বনে–জঙ্গালে বাস করত। পাথর ঘষে আগুন জ্বালাত। বৈজ্ঞানিকের চমকপ্রদ উদ্ভাবন তখন অজ্ঞাত ছিল। মানুষের দৈনন্দিন কাজের প্রয়োজনে সভ্যতার ক্রমবিকাশ ঘটেছে। কালক্রমে আগুন আবিষ্কার হলে মানুষ কাঁচা মাংস আগুনে ঝলসে খেতে শুরু করে। জীবজন্তুর আক্রমণ হতে রক্ষা পাওয়ার প্রয়োজনে মানুষ ঘর বাঁধতে শেখে এবং নারী–পুরুষ অগ্নিকে সাক্ষী করে বিয়ের বন্ধনে আবন্ধ হয় ও দাম্পত্য জীবন শুরু করে। এভাবে মানুষ সমাজবন্ধ জীবনযাপনের শুভ সূচনা করে। তখন পুরুষেরা ফসল ফলানোর এবং নারীরা সুস্বাদু রান্নার বিভিন্ন কৌশল আয়ত্ত করে ফেলে। এভাবে মানুষ ক্রমান্বয়ে প্রয়োজনের তাগিদে নগরসভ্যতার পত্তন করে এবং জ্ঞানবিজ্ঞানের পথ বেয়ে বর্তমান সভ্যতা ও উন্নতির ভিত গড়ে তোলে। কালক্রমে এক এক সময় এক এক জিনিসের অভাবের কথা বুঝতে পেরেছে। প্রয়োজনের কথা গুরুত্বের সাথে উপলব্ধি করেছে। অন্ধকার দূর করা প্রয়োজন বিধায় বিদ্যুৎ উদ্ভাবন করেছে। যাতায়াতের সুষ্ঠু ব্যবস্থা ছিল না, বাহন ছিল না; রাস্তাঘাট তৈরি করেছে, স্টিম ইঞ্জিন, রেলগাড়ি, মোটরগাড়ি, অ্যারোপ্লেন এবং আরও অনেক যান উদ্ভাবন করেছে। দূরাঞ্চলের মানুষের কথা শোনা দরকার, পর্দায় ছবি দেখা দরকার; উদ্ভাবন করা হলো চলচ্চিত্র, টেলিফোন, টেলিস্কোপ, টেলিগ্রাম, টেলিভিশন, ভিসিআর ইত্যাদি। প্রয়োজনীয়তা না থাকলে এগুলো উদ্ভাবনের কথা চিন্তাও করা যেত না। আলো জ্বালানোর দরকার। তাই দিয়াশলাই, লাইটার উদ্ভাবন করেছে। আবার রোগশোক, জরা–ব্যাধিকে দূরে নিক্ষেপ করার জন্য এক্সরে, আলট্রাসনোগ্রাফির উদ্ভাবন করেছে। নানা দুরারোগ্য ব্যাধি ও ওষুধ আবিষ্কার করার প্রয়োজনের কথাও মনে হয়েছে। ফলে আবিষ্কার করেছে পেনিসিলিন, ক্লোরোমাইসিন ইত্যাদি। এভাবে চলছে একের পর এক আবিষ্কার। প্রয়োজন না থাকলে মানুষ কিছুই আবিষ্কার করার প্রয়াস পেত না।

মন্তব্য: প্রয়োজনই মানুষকে নতুন নতুন জিনিস ও কৌশল উদ্ভাবনে অনুপ্রাণিত করেছে এবং তাকে উন্নতির স্বর্ণ শিখরে পৌঁছে দিয়েছে।

৭১, প্রয়োজনে যে মরিতে প্রস্তুত, বাঁচিবার অধিকার শুধু তাহারই। *[সি. বো. '০৩; চ. বো. '০৪; কু. বো., রা. বো. '০৭]*

মূলভাব: যথার্থ জীবনের ধর্ম দুঃসাহসী চিত্ত, দৃঢ় মনোবল আর কঠিন আত্মপ্রত্যয়। যাঁরা এ গুণাবলির অধিকারী তাদের বেঁচে থাকা সার্থক ও যথার্থ। কেননা মরণকে তারা তুচ্ছজ্ঞান করে যেকোনো প্রয়োজনে জাবন উৎসর্গ করতে প্রস্তুত থাকে। আর যারা ভীরু ও কাপুরুষ তারা সদা পলায়নপর। তাঁরা বেঁচে থেকেও যেন মৃত।

সম্প্রসারিত ভাব: সত্যের জন্য যাঁরা হাসিমুখে জীবন উৎসর্গ করেন তাঁরাই অমরত্ব লাভ করেন। কিন্তু পৃথিবীর বেশিরভাগ মানুষ ভীতু ও কাপুরুষ। মৃত্যু হওয়ার আগেই তাঁরা মরে যায়। জীবনকে প্রতিষ্ঠা করতে হলে প্রতিনিয়ত জীবনের সাথে যুদ্ধ করতে হয়। যেহেতু সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করতে হলে লড়াই করতে হয়, তাই এ লড়াই জীবন বাজি রেখেই করতে হয়। যে সবসময় মৃত্যুকে ভয় পায় তাকে দিয়ে কখনো সত্য ও সুন্দরের প্রতিষ্ঠা সম্ভব নয়। এই রকম মৃত্যু ভয়ে আতঙ্কিত মানুষ সত্যিকার অর্থে সফলতা লাভ করতে পারে না। প্রকৃত বীর সে, যে মৃত্যু ভয়ে ভীত না হয়ে অসুন্দর ও অকল্যাণের বিরুদ্ধে প্রাণপণ লড়াই করে যায়। সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় শোষণ–বঞ্চনা, অত্যাচার–নিপীড়ন এসব দূরীভূত করতে হলে মৃত্যুকে কিছুতেই ভয় পেলে চলবে না। কোনো অলৌকিক শক্তি মানুষের জন্য এ কাজ করবে না। এ কাজ করতে হয় ত্যাগ–তিতিক্ষা দিয়ে, আত্মসুখ বিসর্জন দিয়ে এমনকি জীবন দিয়ে। সাহসের সাথে বাঁচতে হবে এবং মৃত্যু ভয়কে তুচ্ছ করতে হবে। আত্মত্যাগের সাহস থাকলেই জীবনের মূল্য বোঝা যায়। আর ভয়ে জড়োসড়ো হয়ে থাকলে বেঁচে থাকার কোনো সার্থকতা নেই। বেঁচে থাকার অধিকার তাঁরই আছে যে মানবকল্যাণে প্রাণ নিবেদন করে। মানবকল্যাণে যার ভাবনা নেই, চিন্তা নেই। যে শুধু নিজেকে নিয়ে ভাবে তাকে স্বার্থপর ছাড়া আর কিছুই বলা যায় না। আর সমাজে এদের কোনো মূল্যও নেই। এদের বেঁচে থাকার কোনো অধিকার নেই। এরা জাতির জন্য, সমাজের জন্য বোঝাস্বরূপ।

মন্তব্য: আত্মত্যাগ ও আত্মকল্যাণের মাধ্যমে মানুষ অমরত্ব লাভ করে। কাপুরুষের মতো বেঁচে থাকার মধ্যে কোনো গুরুত্ব নেই। তাতে মনুষ্যত্বের ও মূল্যবোধের অবক্ষয় হয়।

৭২. বাংলার ইতিহাস এদেশের মানুষের রক্ত দিয়ে রাজপথ রঞ্জিত করার ইতিহাস

মূলভাব: অন্যায়ের বিরুদ্ধে আন্দোলন–সংগ্রামের গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাসের অধিকারী বাঙালি জাতি। অধিকার আদায়ের লড়াইয়ে ঝরেছে অনেক রক্ত। তবুও বাঙালি এগিয়ে গিয়েছে দৃপ্তপদে।

সম্প্রসারিত ভাব: স্বাধীনচেতা বাঙালি জাতি কোনোদিন কারও অধীনতা মেনে নেয়নি। যতবারই তারা শোষণের শিকার হয়েছে, ততবারই সংগ্রামের মাধ্যমে সেই শেকল ভেঙেছে। বুকের তাজা রক্ত বিলিয়ে দিতে কখনো পিছপা হয়নি। দীর্ঘ দুশো বছরের ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে তারা বিদ্রোহে লিপ্ত হয়েছে। ১৯৪৭ সালে উপমহাদেশের মানুষ ব্রিটিশ বেনিয়াদের হাত থেকে মুক্তি পেলেও বাঙালির মুক্তি মেলেনি। পাকিস্তানি শোষকদের বিরুদ্ধে তারা আবার অন্দোলন–সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়েছে। '৫২–এর ভাষা আন্দোলনের মধ্য দিয়ে পাকিস্তানি সাম্প্রদায়িক সরকারের বিরুদ্ধে লড়াই ঘোষণা করেছে। বাংলার রাজপথ রঞ্জিত করে বাংলা ভাষাকে বিশ্বদরবারে মর্যাদার আসন দিয়েছে। পরবর্তী পর্যায়ে ১৯৫৮, ১৯৬৬ ও ১৯৬৯ সালে সামরিক শাসকের বুলেট বুক পেতে গ্রহণ করেছে। শোষকের নির্যাতন তাদের স্বাধীনতার দাবিকে দাবিয়ে রাখতে পারেনি। সব শেষে ১৯৭১ সালে বাঙালির ওপর চূড়ান্ত আঘাত হানে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী। মুক্তিকামী বাঙালি জনতা তাদের বিরুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ে মুক্তিযুদ্ধে। দীর্ঘ নয় মাস রক্তক্ষয়ী মুক্তিযুদ্ধের শেষে বাঙালি ছিনিয়ে আনে লাল–সবুজের পতাকা।

মন্তব্য: দীর্ঘকালের রক্তক্ষরণের মধ্য দিয়ে প্রতিষ্ঠিত হয় স্বাধীন–সার্বভৌম বাংলাদেশ। অসংখ্য অমিত সাহসী মানুষের আত্মত্যাগের দৃষ্টান্তে ভাস্বর বাংলার ইতিহাস। বাঙালি যে বীরের জাতি তার প্রমাণ রয়েছে ইতিহাসের পাতায়।

৭৩. বিদ্বানের কলমের কালি শহিদের রক্তের চেয়েও পবিত্র

মলভাব: অন্যায়ের বিরুদ্ধে ন্যায় প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে যাঁরা আত্মদান করেন তাঁরা শহিদ। ইসলামের দৃষ্টিতে– ইসলামের সত্য ও ন্যায়ের বাণী প্রচারের ক্ষেত্রে সশস্ত্র বাধা মোকাবিলা করতে গিয়ে যাঁরা অকাতরে প্রাণদান করেন তাঁরা শহিদ।

সম্প্রসারিত ভাব: জাতীয় স্বার্থে প্রাণদানকারীও শহিদের মর্যাদা পেয়ে থাকেন। পৃথিবীর সব ধর্মে, সব সমাজে, সব কালে শহিদের মর্যাদা বিশেষভাবে স্বীকৃত। ইসলাম ধর্মে শহিদের সুমহান মর্যাদার কথা বর্ণিত আছে। এখানে বলা হয়েছে যে, শহিদরা বিনা বিচারে জান্নাতে প্রবেশ করবে। কিন্তু ইসলামের সর্বশ্রেষ্ঠ নবিই আবার ঘোষণা করেছেন, "বিদ্বানের কলমের কালি শহিদের রক্তের

চেয়েও পবিত্র।" কারণ বিদ্যার গুণেই একজন মানুষ শহিদি মৃত্যুর তাৎপর্য ও মাহাত্ম্য উপলব্ধি করতে পারে। বিদ্যার দ্যুতিতে মানুষ আলোকিত হতে চায়। বিদ্বান ব্যক্তি মানুষের জ্ঞানচক্ষু উন্মীলিত করে দেয়। স্বধর্ম, স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষার জন্য যারা অকুণ্ঠচিত্তে জীবন উৎসর্গ করেন তাঁদের শহিদ বলে। শাহাদত বরণ পরম গৌরবের, শহিদ তাঁর জীবন বিসর্জন দেন জাতির মুক্তির লক্ষ্যে। সত্য ও কল্যাণের ধারাকে নিরবচ্ছিন্ন রাখাই শহিদদের ব্রত। ধারালো অস্ত্রের সামনে শহিদ তাঁর বক্ষ উন্মুক্ত করে দেন। কিন্তু মুক্তি বলতে শুধু ভৌগোলিক রাষ্ট্রীয় মুক্তি বোঝায় না। মানুষের প্রকৃত মুক্তি ঘটে তার চেতনার জাগরণ ও জ্ঞানের স্ফুরণে। একটি জাতি যদি শিক্ষাদীক্ষা ও জ্ঞানবিজ্ঞানে অগ্রগতি অর্জন করতে না পারে, তাহলে তার স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব মূল্যহীন হয়ে পড়ে। চেতনার মুক্তি ছাড়া প্রকৃত মুক্তি অর্জন সম্ভব হয় না। আর জাতিকে প্রকৃত মুক্তির গৌরব এনে দিতে পারে প্রকৃতপক্ষে বিদ্বানরাই। যারা বিদ্বান বা জ্ঞানী তাঁরা তাঁদের লেখনী দ্বারা জাতির মাঝে জ্ঞান বিতরণ করেন। বিস্তারিত জ্ঞানের আলোকে জাতির সামাজিক সত্তার জাগরণ ঘটে। শহিদ তাঁর রক্ত দিয়ে জাতিকে ঋণপাশে আবদ্ধ করেন। অন্যদিকে বিদ্বান তাঁর লেখনী ধারা জাতিকে মুক্তির পথ নির্দেশ করেন। বুকের রক্তের মতো পবিত্র ও মূল্যবান হয়তো কিছুই নেই। কিন্তু প্রকৃত বিচারে বিদ্বানের ব্যবহৃত কালি সে রক্তের চেয়েও অনেক বেশি পবিত্র। আমাদের প্রিয় নবি হযরত মুহাম্মদ (সা.) বলেছেন, "দোলনা থেকে কবর পর্যন্ত জ্ঞান অন্বেষণ করো।" এখানে শিক্ষার মর্যাদা প্রতিপন্ন করার জন্য মন্তব্য করা হয়েছে।

মন্তব্য: মানুষের বাস্তব প্রয়োজনে শিক্ষা ও জ্ঞানার্জন করতে হয়। জাতীয় মুক্তিতে শহিদের অবদানের চেয়ে জ্ঞানীর অবদান কম নয়।

৭৪. বিদ্যার সঙ্গে সম্পর্কহীন জীবন অন্ধ এবং জীবনের সঙ্গে সম্পর্কহীন বিদ্যা পঙ্গু

মূলভাব: বিদ্যার মতো পরশপাথর পৃথিবীতে আর কিছু নেই। আমাদের সমগ্র অগ্রগতির মূল হচ্ছে বিদ্যা। কিন্তু এ বিদ্যা যদি মানবজাতির কোনো কাজে না আসে তাহলে তা হবে অর্থহীন।

সম্প্রসারিত ভাব: শিক্ষা জাতির মেরুদন্ড। এটা মানুষের মনের অন্ধকার দূর করে। মানবজীবনের সঙ্গে বিদ্যার সম্পর্ক অবিচ্ছেদ্য। বিদ্যাহীন ব্যক্তিকে অন্ধের সাথে এবং পশুর সাথে তুলনা করা হয়। কারণ যে লেখা-পড়া জানে না, পৃথিবীর বহু জ্ঞান-বিজ্ঞানের ধারণা তার কাছে অজ্ঞাত। বিদ্যাই মানুষের জ্ঞানচক্ষুকে উন্মোচন করতে পারে এবং অন্ধকার থেকে আলোর পথে নিয়ে যেতে পারে। বিদ্যার বলে মানুষ আজ প্রকৃতিকে জয় করতে পেরেছে এবং আশ্চর্য জিনিস আবিষ্কার করতে পেরেছে। চাঁদের বুকে অবতরণ, গ্রহ-নক্ষত্রের বিচিত্র রহস্য উদ্ঘাটন ছাড়াও মানুষ আরও অনেক অসাধ্যসাধন করতে পেরেছে এ বিদ্যার বলেই। যে ব্যক্তি বিদ্যাহীন সে অন্ধকার রাজ্যে বাস করে। পৃথিবীর সবকিছু সে চোখ দিয়ে দেখা সত্ত্বেও, অনেক রহস্যের সন্ধান করতে সে হয় বঞ্চিত। এখানেই বিদ্যাহীন ব্যক্তির মর্মান্তিক পরাজয়। যে বিদ্যার সঙ্গে জীবনের কোনো সম্পর্ক নেই, সে বিদ্যা অর্থহীন। পরিবেশের সাথে জীবনের সম্পর্ক স্পাপন এবং জীবনের প্রয়োজনে বিদ্যার সাধারণ ভূমিকা অনস্বীকার্য। কিন্তু যে অর্জিত বিদ্যা মানবজীবনের কোনো কাজে লাগে না; সুষ্ঠু জীবনযাপনের পক্ষে সহায়ক হতে পারে না, সে বিদ্যা একেবারে নিরর্থক। প্রাত্যহিক জীবনের কোনো প্রয়োজনে যে বিদ্যা মানুষকে কোনো সাহায্য করতে পারে না, সে বিদ্যাকে পঙ্গু ব্যক্তির সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে। অর্থাৎ যে বিদ্যা মানুষকে পৃথিবীর অনেক কিছু বুঝার বা জানার ক্ষমতা দেয়, কিন্তু জীবনের প্রয়োজনে কোনো সাহায্য করতে পারে না এখানেই সে বিদ্যার করুণ পরিণতি।

মন্তব্য: বিদ্যা যদি জীবনের সঙ্গে সম্পৃক্ত না হয় তবে সে বিদ্যা অর্থহীন। বিদ্যা অর্জনের প্রকৃত উদ্দেশ্যই হলো জীবনকে সাফল্যে, হৃদয়কে প্রাণচাঞ্চল্যে উদ্‌বেল করে তোলা। উদ্দেশ্যহীন বিদ্যা প্রকৃত অর্থে ব্যর্থ ও পঙ্গু।

৭৫. বিদ্যার সাধনা শিষ্যকে নিজে অর্জন করতে হয়। গুরু উত্তর সাধক মাত্র।

[চ. বো. '১৯; কু. বো. '০১]

মূলভাব: বিদ্যা অমূল্য সম্পদ। প্রত্যেকটি মানুষের মধ্যেই আল্লাহ প্রদত্ত জ্ঞান আছে আর সেটা চর্চার মাধ্যমে বিকশিত হয়।

সম্প্রসারিত ভাব: শিক্ষক শুধু দিকনির্দেশনা দিতে পারেন। "Knowledge is power." কিন্তু এটা আপনা-আপনি হয় না। কষ্ট করে অর্জন করতে হয়। জীবন পুষ্পশয্যা নয়। এ পঙ্কিল জগতের সবকিছুই কণ্টকাকীর্ণ। টাকা-পয়সা, মান-সম্মান, যাই বলি না কেন, সাধনা ছাড়া কোনো কিছুই অর্জন করা যায় না। এক্ষেত্রে শুধু সাধনাই নয় অপরের সাহায্য-সহযোগিতা, আদেশ, উপদেশও অনুসরণ করতে হয়। কেউ একা কোনো লক্ষ্যে পৌঁছাতে পারে না। তাকে কিছু দিকনির্দেশনা পেতে হয়, তা না হলে সাফল্য অর্জন করা কষ্টসাধ্য হয়ে পড়ে। অপরের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করেই সে নিজ সাধনায় ব্রতী হয় এবং কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে উপনীত

হয়। তাই কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যের সাথে উপদেশ, বিদ্যা এবং সাধনা ওতপ্রোতভাবে জড়িত। এগুলো ঠিকমতো একত্র না হলে তা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। বিদ্যা অর্জন করতে হলে সাধনার প্রয়োজন হয়; এটা সর্বসত্য। এ সাধনা কীভাবে করতে হবে তা গুরুজনের মাধ্যমেই জানতে হয়। গুরুর দ্বারস্থ হয়েই একজন মানুষ পায় সঠিক সাধনার পথসন্ধান। মানুষের পরিপূর্ণভাবে বিকশিত হওয়ার পথে সন্ধান দেখান গুরু। গুরু এক্ষেত্রে শুধু সন্ধানদাতা; কিন্তু ফলপ্রাপ্তি করতে হলে নিজেকে সাধনা করতে হয়। নিজ সাধনাই মানুষকে বিকশিত করে। গুরু প্রতিভাকে বিকশিত করতে পারেন না। গুরু হলেন আলোকবর্তিকা আর শিষ্য হলেন আলোকিত জগৎ; সদ্যফোটা ফুলের মতো। কোনো কিছু সাধনা করতে গেলে একটা মাধ্যম দরকার। গুরু হলেন সে মাধ্যম। পৃথিবীতে অজস্র দৃষ্টান্ত আছে যাঁরা গুরুর উপদেশ পাথেয় হিসেবে গ্রহণ করে নিজ সাধনায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়– সক্রেটিস, প্লেটো এবং অ্যারিস্টটল–এর কথা। গুরু সক্রেটিসের উপদেশ অনুসরণ করে প্লেটো এবং গুরু প্লেটোর উপদেশ অনুসরণ করে অ্যারিস্টটল জগদ্‌বিখ্যাত হয়েছেন।

মন্তব্য: মূলত পরিশ্রমই সৌভাগ্যের চাবিকাঠি। গুরু চালিকাশক্তি মাত্র। এক্ষেত্রে তিনি উত্তর সাধক। দিগ্‌দর্শন যন্ত্রের মতো, দিঙ্‌নির্ণয় করাই গুরুর কাজ; কিন্তু গন্তব্যে পৌঁছাতে হয় নিজ ক্ষমতাবলে।

৭৬. বিশ্ব যদি চলে যায় কাঁদিতে কাঁদিতে
আমি একা বসে রব, মুক্তি–সমাধিতে

মূলভাব: জীবন চলার পথে বাধা–বিপত্তি যা–ই আসুক না কেন সবকিছু এড়িয়ে সামনে যেতে হবে। মনে রাখতে হবে, জীবন পুষ্পশয্যা নয়। জীবন চলার পথ কণ্টকাকীর্ণ।

সম্প্রসারিত ভাব: মানুষ আমৃত্যু কোনো না কোনো কাজে লেগে থাকে। সেই কাজটা যত বড়োই হোক আর যত ছোটোই হোক না কেন। মানুষ সবসময়ই সেই কাজে সফলতা অর্জন করতে চায়। কিন্তু বিফলতাকে মোটেও গ্রহণ করতে চায় না। মানুষ খুবই দুর্বল এবং আবেগপ্রবণ, অনেক অল্পতেই ভেঙে পড়ে। বিফলতা না এলে সফলতার স্বাদ পরিপূর্ণ হয় না। আঘাত যতই আসুক না কেন তা প্রতিরক্ষা করার মতো মানসিক শক্তি থাকতে হবে। বিফলতাকে ঋণাত্মক হিসেবে না দেখে ধনাত্মকভাবে দেখতে হবে। একবার বিফল হলে পরবর্তীকালে দ্বিগুণ উৎসাহে কাজ চালিয়ে যেতে হবে। সেই কাজ চালিয়ে যাওয়ার সময় নানা রকম বাধাবিপত্তি আসবে। কাছের মানুষ অনেক সময় মুখ ফিরিয়ে নেবে কিন্তু এই সব বাধাবিপত্তিতে থেমে থাকলে চলবে না; বরং সব অতিক্রম করে নির্ভয়ে সামনে এগিয়ে যেতে হবে। মানুষ জন্ম থেকে স্বাধীনতাকামী। মানুষ জন্ম নেয় স্বাধীনতার জন্য। কিন্তু স্বাধীনতা একা এসে ধরা দেয় না, এটা অর্জন করতে হয়। সেই অর্জনে যত বাধাবিপত্তি আসুক না কেন। কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌঁছাতে গিয়ে যদি কাউকে পাশে না পাওয়া যায় তবে একাই পথ চলতে হবে। কিন্তু তবুও নির্দিষ্ট গন্তব্যে পৌছাতে হবে। নিজের সাধনা নিজে করতে হবে।

মন্তব্য: একই মুদ্রার দুই পিঠ হচ্ছে সফলতা এবং বিফলতা। তাই যা–ই আসুক না কেন হাসিমুখে বরণ করতে হবে।

৭৭. বিশ্বের যা কিছু মহান সৃষ্টি চির কল্যাণকর
অর্ধেক তার করিয়াছে নারী, অর্ধেক তার নর।

[য. বো. '০৯, '০৫; দি. বো. '১২; সি. বো. '১৫]

মূলভাব: নারী–পুরুষ একে অন্যের পরিপূরক। বিশ্বসভ্যতা নির্মাণে জাতির উন্নতিতে নারী–পুরুষ উভয়েরই অবদান রয়েছে। সৃষ্টির শুরু থেকে নারী–পুরুষের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় গড়ে উঠেছে সভ্যতা। তাই নারীকে ছোটো করে দেখার কোনো অবকাশ নেই।

সম্প্রসারিত ভাব: প্রাচীনকাল থেকে নারীকে ছোটো করে দেখে আসা হচ্ছে। এই একুশ শতকে এসেও সমাজ সেই দৃষ্টিভঙ্গি বদলাতে পারেনি। নারীকে ছোটো করে দেখার মন–মানসিকতা আজও বদলায়নি। কিন্তু নারী–পুরুষ এক বৃন্তেরই দুটি ফুল। মানুষ এই পর্যন্ত যা অর্জন করেছে তার সবই সমষ্টিগত। সবকিছুতে দুজনেরই সমান অধিকার। দৈহিক আকৃতিতে নারী–পুরুষ ভিন্ন হলেও বুদ্ধিবৃত্তি, হৃদয়বৃত্তিতে কেউ কারও চাইতে কম নয়। কিন্তু কুসংস্কারাচ্ছন্ন, ধর্মান্ধ পুরুষ নারীকে পর্দার অন্তরালে রেখে দিতে চায়। নারীদের জীবন গৃহবন্দি হয়ে আত্মমর্যাদাহীনভাবে দাসীর মতো ধুঁকে ধুঁকে নিঃশেষ হয়। এ অবস্থা সত্যিই অমানবিক। "যে শকটের এক চক্র বড়ো (পতি) এবং এক চক্র ছোটো (পত্নী) হয়, সে শকট অধিক দূর অগ্রসর হতে পারে না; সে একই স্থানে (গৃহকোণেই) ঘুরতে থাকবে।" একটি জাতি কোনোদিনই এভাবে উন্নতি করতে পারে না। সকল ধর্মেই নারীর চোখে পুরুষ

পৃথিবীর এত রূপ, রস দেখেছে। নারী একই সাথে মাতা এবং তিনিই যুগপুরুষকে শক্তি সাহস যুগিয়েছে, আদর–যত্ন করেছে, ভালোবাসা দিয়েছে, সান্তনার বাণী শুনিয়েছে। রাজা কখনো এত বড়ো রাজ্য শাসন করতে পারতো না যদি–না রানির দরদ ভালোবাসা তার সাথে না থাকত। নারী কাছে না থাকলে পুরুষ কখনো ঘর বাঁধার স্বপ্ন দেখতো না। মায়ের কাছে সন্তানের যে শিক্ষা তা–ই সন্তানের জীবনের সবচেয়ে বড়ো শিক্ষা। পারিবারিক শান্তিই পুরুষের জীবনকে সার্থক করে তোলে। কোনো ক্ষেত্রেই নারীরা পিছিয়ে নেই। সবক্ষেত্রেই নারীরা নিজেদের যোগ্যতার প্রমাণ দিয়ে যাচ্ছে। নারী–পুরুষ একে অন্যের প্রতিযোগী নয়; বরং সহযোগী।

মন্তব্য: শুধু পারিবারিক বা ব্যক্তিজীবনেই নয়, কর্মজীবনেও নারীরা গুরুতপূর্ণ স্থান দখল করে আছে। তাই সভ্যতার উন্নয়নে নারীকে কখনো বঞ্চিত করা যাবে না।

বিশ্রাম কাজের অঙ্গ একসাথে গাঁথা
নয়নের অংশ যেমন নয়নের পাতা।

মূলভাব: বিশ্রাম ও কাজ একে অপরের পরিপূরক। কাজ আনে জীবনে সমৃদ্ধি আর বিশ্রাম আনে কাজের শক্তি ও প্রেরণা। জীবনের ছন্দ তার চলা ও থামার মেলবন্ধনে। গতির যেমন ছন্দ আছে, তেমনি আছে বিরতির সৌন্দর্য।

সম্প্রসারিত ভাব: বিরতি না থাকলে গতির তাৎপর্য ও সৌন্দর্য এতখানি বোঝা যেত না। জীবনে কাজের সঙ্গে বিশ্রামেরও প্রয়োজন আছে; সারাক্ষণ কাজের মধ্যে মগ্ন হয়ে থাকলে চলে না। মাঝে মাঝে বিশ্রাম বা বিরতির প্রয়োজন। বিরামহীন কাজ জীবনকে বিড়ম্বিত করে এবং একঘেয়ে করে তোলে। কাজকে তাৎপর্য দিতে হলে বিরতির প্রয়োজন; এই বিরতিই কাজকে নতুন উৎসাহে প্রাণবন্ত করে তোলে, আনন্দে পরিপূর্ণ করে তোলে। বিশ্রাম কর্মী মানুষকে দ্বিগুণ প্রেরণা জোগায় এবং নতুনভাবে কর্মোদ্দীপনায় উৎসাহিত করে। যন্ত্র কেবলই কাজ করে। যন্ত্রের প্রাণশক্তি না থাকলেও সেই যন্ত্রকেও মাঝে মাঝে বিশ্রাম দেওয়ার প্রয়োজন আছে। কেবলই যদি যন্ত্র কাজ করে তাকে যদি বিশ্রাম না দেওয়া হয়, তবে তা অচিরেই বিকল হয়ে পড়ে। বিরামকে ফাঁকি মনে করা ভুল; কারণ বিরামও কাজের অঙ্গ। চোখের পাতা ফেলা যেমন চোখকে আরও স্বচ্ছ ও সতেজ করে; তাতে দৃষ্টিশক্তি দ্বিগুণ বাড়ে। চোখ মেলা আর চোখের পাতা ফেলা দুয়ের মধ্যে সামঞ্জস্য আছে এবং দুয়েরই প্রয়োজন আছে। চোখকে ভালো করে মেলার জন্যই চোখের পাতা ফেলার প্রয়োজন। চলার সময় যেমন আমরা একটি পা ফেলি এবং সেই সঙ্গে অপর পা'টি তুলি– এই পা ফেলা ও পা তোলার মধ্যে একটা ছন্দ আছে, এটাই হলো সামঞ্জস্য। এ ছন্দ কেবল চলার ছন্দ নয়– জীবনের ছন্দ। তেমনি কাজ ও কাজের মাঝে বিরাম গ্রহণ জীবনের গতিকে ছন্দোময় করে তোলে। চলা ও থামার মেলবন্ধনেই জীবনের আনন্দ, সার্থকতা ও পূর্ণতা। পরিশ্রমকে উপভোগ্য করার জন্যই বিশ্রাম প্রয়োজন। মানুষের সৃষ্টির কর্ম উদ্দীপনার মাঝে বিরামের প্রয়োজন। প্রকৃতি সৌন্দর্যের লীলা নিকেতন; সৌন্দর্যের লীলাভূমি বলেই প্রকৃতির সৃষ্টির মধ্যে এত বৈচিত্র্য, এত সমারোহ। কেবল চলার গতিতেই সৌন্দর্যের অনুভূতি আসে না; চলার মাঝে দুদন্ড বিরামের প্রয়োজন সেই সৌন্দর্যের অনুভূতির জন্য।

মন্তব্য: চলা এবং থামা জীবনের পথে দুইয়েরই প্রয়োজন; জীবনের গতিকে ছন্দবহ করে তোলার জন্য গতি ও বিরতি দুইয়েরই বিশেষ ভূমিকা তাৎপর্যব্যঞ্জক।

৭৯. ভবিষ্যতের ভাবনা ভাবাই জ্ঞানীর কাজ।

মূলভাব: অতীত ও বর্তমানের নেশায় যারা বিভোর থাকে তারা বুদ্ধিহীন এবং অবিবেচক। প্রকৃত জ্ঞানীরা সর্বদাই সুখী ও সমৃদ্ধির আশায় ভবিষ্যতের ভাবনায় ব্যতিব্যস্ত থাকেন।

সম্প্রসারিত ভাব: এ পৃথিবীতে বুদ্ধিমান ও জ্ঞানী লোকেরাই ভবিষ্যতের কথা ভাবে। পক্ষান্তরে, যারা বুদ্ধিহীন, অবিবেচক তারা অতীত ও বর্তমানের ভাবনা ভেবে ব্যাকুল হয়ে ওঠে। দুনিয়ায় অনেক প্রাণী আছে, অনেক জীবজন্তু আছে যারা অতীত ও বর্তমান ছাড়া ভবিষ্যতের ভাবনা ভাবে না। পক্ষান্তরে ধরা যাক, পিঁপড়া ও মৌমাছির কথা। এরা ভবিষ্যতের জন্য সঞ্চয় করে, ভবিষ্যতের ভাবনা ভাবে। বর্তমান ও অতীত নিয়ে তারা যে ভাবনা ভাবে, সে ভাবনার চেয়ে ভবিষ্যতের ভাবনাই বেশি। পিঁপড়া ও মৌমাছির ন্যায় মানুষেরও ভবিষ্যতের ভাবনা ভাবা প্রয়োজন। সংসারে এমন মানুষ আছে যারা ভবিষ্যতের চেয়ে অতীত এবং বর্তমানের কথা বেশি ভাবে। সংস্কৃতে একটি কথা আছে– "গতস্য শোচনা নাস্তি।" অর্থাৎ, অতীতে যা ঘটে গেছে তা যদি বেদনাপীড়িত, দুঃখ ভারাক্রান্ত ব্যাপার হয়ে থাকে তবে তা নিয়ে বৃথা মাথা ঘামিয়ে লাভ নেই। তারা চিন্তা–ভাবনা করে দেখে না যে, অতীতের কথা

ভেবে অনুশোচনা করা বৃথা। বর্তমানের কথা ভাবাও অর্থহীন। অতীত থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে সমাজের দিকে এগিয়ে যাওয়া বুদ্ধিমানের কাজ। আবার বর্তমান অভিজ্ঞতা থেকে ভবিষ্যতের জন্য সঞ্চয় করা, নিশ্চিন্ত থাকা ও ভাবনা ভাবা সত্যিকার অর্থে জ্ঞানীর কাজ বলে বিবেচিত কেননা ভবিষ্যৎই হলো আসল জিনিস। ভবিষ্যতের গর্ভেই নিহিত থাকে মানুষের শান্তি, সমৃদ্ধি ও নিরাপত্তা।

মন্তব্য: অতীত বা বর্তমানই চূড়ান্ত কিছু নয়। অতীত ও বর্তমানের পরিণতিই হলো ভবিষ্যৎ। তাই যারা ভবিষ্যতের চিন্তা–ভাবনা করে তারাই যথার্থ জ্ঞানী।

৮০. ভোগে নয়, ত্যাগেই প্রকৃত সুখ।

[চ. বো.'০৭; ঢা. বো. '০৪]

মূলভাব: মানবজীবনের প্রকৃত সুখ আসে আত্মত্যাগের মধ্য দিয়ে। ভোগলালসা মেটানোর মধ্যে প্রকৃত সুখ খুঁজে পাওয়া যায় না।

সম্প্রসারিত ভাব: মানুষ স্বভাবতই প্রবৃত্তির বেড়াজালে আবদ্ধ। প্রবৃত্তির এই কঠিন শৃঙ্খলমোচনের মাধ্যমেই তার আত্মমুক্তির বিকাশ ঘটে। আর এ আত্মমুক্তির মাধ্যমেই পাওয়া যায় জীবনের আস্বাদ। ফলে মানুষের ভোগের আসক্তি জন্ম নেয় এবং ভোগের দ্বারা ভোগের আকাঙ্ক্ষা বাড়ে। ভোগের বশবর্তী কোনো লোক দ্বারা পৃথিবীর মানুষের কোনো মহৎ কাজ হয় না। মৃত্যুর সাথে সাথে মানুষ তার স্মৃতি মন থেকে মুছে ফেলে। ভোগের প্রতি আকাঙ্ক্ষা মানুষের সীমাহীন দুঃখের কারণ। ত্যাগ মানুষকে নিঃস্ব করে না; বরং জীবনে পূর্ণতাই এনে দেয়। যিনি অপরের কল্যাণে জীবন উৎসর্গ করেন মৃত্যুর পর তিনি মানুষের কাছে স্মরণীয় হয়ে থাকেন। জীবনে ত্যাগ না থাকলে জীবন অর্থবহ হয় না। ত্যাগের মনোভাব মানুষকে মহৎ করে তোলে, অন্তরকে অপার আনন্দে পূর্ণ করে দেয়। অসহায়, বিপন্ন ও দুর্দশাগ্রস্ত মানুষের কল্যাণে তাদের পাশে দাঁড়াতে পারলে নিজের অন্তরে অনির্বচনীয় শান্তি ও সুখের স্রোতোধারা প্রবাহিত হয়। ত্যাগেই মানবজীবনের সার্থকতা প্রতিপন্ন হয়, মানুষ প্রকৃত সুখলাভে সক্ষম হয়। তাই ত্যাগই মানুষের চরিত্রের সর্বোচ্চ আদর্শ হওয়া উচিত। ত্যাগ মহাশক্তি। অপরদিকে ভোগলালসা হচ্ছে লক্ষ সাপের ফণা, যাকে পদদলিত করা আমদের কর্তব্য। ভোগাকাঙ্ক্ষার নিবৃত্তি না হওয়া পর্যন্ত আমরা সার্থক মানুষ হিসেবে নিজেদের পরিচয় দিতে পারব না।

মন্তব্য: জীবনের পরিপূর্ণ বিকাশের জন্য অপরের জন্য আমাদের আত্মত্যাগ বাঞ্ছনীয়। কেননা ভোগলালসায় জীবনে প্রকৃত কোনো সুখ খুঁজে পাওয়া যায় না।

৮১. মঙ্গল করিবার শক্তিই ধন, বিলাস ধন নহে

[চ. বো. '১৩, '০৩; ঢা. বো. '০৯; কু. বো. '১৩]

মূলভাব: মানবজীবনে ধনসম্পদের প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। কিন্তু ধনসম্পদের প্রকৃত গুরুত্ব নির্ভর করে মানবকল্যাণ ও সামাজিক অগ্রগতিতে তা কাজে লাগানোর ওপর।

সম্প্রসারিত ভাব: ধনসম্পদ যদি অপরিমিত পরিভোগ ও বিপুল বিলাসিতায় ব্যয়িত হয় তবে অর্থ তার মৌলিক উদ্দেশ্য ও তাৎপর্য হারায়। অপচয় না করে মানবকল্যাণে ও সামাজিক অগ্রগতিতে ব্যয় করতে পারলেই ধনসম্পদের প্রকৃত মূল্যায়ন হয়। মোহাচ্ছন্ন মানুষ পৃথিবীতে অর্থসম্পদকে ধন বলে মনে করে। বাস্তবতার প্রেক্ষিতে এ কথা সত্য নয়। কারণ প্রতিপত্তি ও অর্থসম্পদ চিরস্থায়ী নয়। তাঁর চাহিদার অন্ত নেই। পদ্ম পাতার নীরের মতো মানবজীবন ও ধনসম্পদ পার্থিব জীবনে ক্ষণস্থায়ী। অর্থশক্তির বিনাশ আছে, কিন্তু জ্ঞানশক্তির বিনাশ নেই। প্রচুর লাভ করেও আবার পাওয়ার জন্য মন ব্যাকুল হয়। যা হৃদয়কে পীড়িত করে, যার আকাঙ্ক্ষা হৃদয়ে প্রবৃত্তির জন্ম দেয় তা কখনো ধন বলে বিবেচিত হতে পারে না। অর্থসম্পদ মানুষকে বিলাসী করে তোলে। বিলাসিতা কোনোদিন ধনের গৌরব অর্জন করতে পারে না। ধনসম্পদের প্রকৃত তাৎপর্য তার সদ্ব্যবহারের সাথেই সম্পৃক্ত। যারা অর্থবৃত্তের মালিক তাঁরা অনেকেই এ কথা বোঝেন না। অনেকেই নানাভাবে বিপুল বিত্তবৈভবের মালিক হন। তাঁরা সম্পদ ব্যয় করেন বিপুল বিলাসিতা ও ভোগলালসা চরিতার্থের জন্য। এ অপব্যয় অর্থের সদ্ব্যবহার নয়। তা ব্যক্তিগত অপরিমিত ফুর্তির খোরাক যোগায় মাত্র, কিন্তু সমাজের কোনো কল্যাণে আসে না। অথচ তাদের ধনসম্পদে রয়েছে সমাজের দরিদ্র জনগোষ্ঠীর অধিকার। যে সমাজে মানুষ নিরন্ন ও নিরাশ্রয়ে ধুঁকে ধুঁকে মরে, সে সমাজে বিলাসব্যসনে গা ভাসানো অন্যায়। দারিদ্র্যপীড়িত সমাজে বিলাসিতার পেছনে অপব্যয় কখনো গৌরবের ব্যাপার হতে পারে না। বিলাসিতা এক্ষেত্রে সম্পদের অপচয় মাত্র। সামাজিক স্বার্থ জলাঞ্জলি দিয়ে সম্পদের অপব্যয় কখনো সমর্থনযোগ্য হতে পারে না। ধনসম্পদ মানবকল্যাণে যত বেশি ব্যয় হয়, দুঃখী মানুষের মুখে হাসি ফোটানোর জন্য যত কাজে লাগানো যায়, ততই ধনসম্পদের প্রকৃত মূল্যায়ন হয়। সঞ্চয় ও বিনিয়োগের মাধ্যমে দেশে নতুন নতুন কর্মোদ্যোগে গ্রহণ করে

উন্নয়ন সাধন করা হলে, মানুষের জন্য কাজের পরিসর বৃদ্ধি করা হলে, ধনসম্পদ সামাজিক ও অর্থনীতির ক্ষেত্রে উত্তরোত্তর সাফল্য নিয়ে আসে। বস্তুত ভোগ-বিলাসিতা ধনকে অপচয়ের পথে নিয়ে যায়।

মন্তব্য: প্রতিটি মানুষের ধনসম্পদের প্রকৃত ব্যবহার সম্পর্কে সচেতন হওয়া প্রয়োজন। ধনসম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহারের মাধ্যমে মানুষের কল্যাণ নিশ্চিত হয়।

৮২. মনেরে আজ কহ যে,
ভালোমন্দ যাহাই আসুক সত্যরে লও সহজে। *[চ. বো. '১০]*

মূলভাব: মানবজীবন ভালোমন্দ, সুখ-দুঃখ ও বিপদাপদের মিশ্রণে গঠিত। ভালো এবং মন্দ উভয় সময়েই যে সত্যকে আঁকড়ে থাকতে পারে সে-ই প্রকৃত মানুষ।

সম্প্রসারিত ভাব: জীবনের গভীরতম বাস্তবতা হলো সত্য। মানবজীবন-প্রবাহ পরিবর্তনশীল। এখানে নিরবচ্ছিন্ন দুঃখ কেউ পায় না। তবু মানুষ যখন সুখের সাগরে অবগাহন করে তখন যদি হঠাৎ দুঃখ এসে হানা দেয়, মানুষ অসহায় ও হতাশ হয়ে পড়ে। কিন্তু জীবনের এ ছন্দপতন সহজভাবে মেনে নিতে শিখলে মানুষের জীবন আরও সহজ ও সুন্দর হয়ে উঠবে। জীবনসত্যের মুখোমুখি দাঁড়াতে হবে অনায়াসে। খারাপ বা ভালো যাই হোক না কেন– সত্যকে নিঃশঙ্কচিত্তে গ্রহণ করার মধ্যেই সূচিত হয় মানবিকতার উন্মেষ। এই সংসারসাগরে সুখ এবং দুঃখ উভয়ের মাঝেই মানুষকে বেঁচে থাকতে হয়। ভালো-মন্দ মানুষের জীবনে আসবেই, বিপদের সম্মুখীন মানুষকে হতেই হবে। একজন মানুষ সারাজীবন সুখেই কাটাবে এটি হতেই পারে না। সুখের বিপরীত পিঠেই রয়েছে দুঃখ অর্থাৎ, যে সুখ ভোগ করবে তাকে দুঃখও ভোগ করতে হবে। ভালো-মন্দ দুটোই যদি না থাকত তাহলে মানুষ তার জন্মকে সার্থক করতে পারত না। শুধু সুখের জীবনও যেমন নীরস তেমনি শুধু দুঃখের জীবনও অত্যন্ত বেদনাদায়ক। যদিও মানুষ সারাজীবন সুখ সুখ করেই মরে কিন্তু দুঃখ না থাকলে কি মানুষ সুখকে উপলব্ধি করতে পারত? যে ব্যক্তি মূল সত্যকে চেনে এবং উপলব্ধি করতে জানে তার কাছে সত্য যে রূপেই আসুক না কেন সে গ্রহণ করবে এবং এতে তার কোনো দ্বিধা থাকবে না। কিন্তু যে প্রকৃত সত্যসন্ধানী নয়, সে মন্দকে দেখলেই পিছিয়ে যাবে এবং তা সে গ্রহণ করবে না।

মন্তব্য: যারা সত্যকে ব্রত হিসেবে গ্রহণ করতে চায় তাদের মানসিকভাবে প্রস্তুত হওয়া প্রয়োজন যাতে সত্য যে রূপেই আসুক না কেন তা যেন নির্দ্বিধায় গ্রহণ করতে পারে, খুব সহজেই যেন তাকে মেনে নিতে পারে।

৮৩. মন্ত্রের সাধন কিংবা শরীর পাতন

মূলভাব: সুদৃঢ় মনোবল ও অন্তহীন একাগ্রতায় সাফল্য অনিবার্য। সাফল্য লাভ করতে চাইলে সাধনায় আত্মনিয়োগ করা ছাড়া কোনো সংক্ষিপ্ত পথ নেই।

সম্প্রসারিত ভাব: মানবজীবন কণ্টকাকীর্ণ। তাকে চলার পথে বহু বাধা-বিপত্তির সম্মুখীন হতে হয়। কিন্তু এ বাধা-বিপত্তিকে ভয় পেয়ে পিছিয়ে গেলে সে জীবনে কখনো সফলতার মুখ দেখতে পারবে না। অনেকক্ষেত্রে এ বাধা-বিপত্তি ডিঙিয়ে সামনে অগ্রসর হওয়ার সময় মৃত্যুও অনিবার্য হয়ে ওঠে। কিন্তু মৃত্যুভয়ে ভীত হলে জীবনে সফলতার বদলে ব্যর্থতার গ্লানি বহন করতে হয়। অবশ্য কর্তব্য মনে করে দৃঢ় মনোভাব ও সংকল্প নিয়ে কোনো কাজ করলে সে কাজ সহজেই সম্পন্ন করা যায়। অসাধ্য বলতে মানুষের কিছুই নেই। কঠিন প্রতিজ্ঞা নিয়ে কাজে নামলে লক্ষ্যস্থল যতই দুর্গম হোক না কেন মানুষ সে কাজে কোনোদিন ব্যর্থ বা অকৃতকার্য হয় না। কাজ করতে গেলে তাতে বাধা-বিপত্তি, সুবিধা-অসুবিধা থাকবে। যারা দৃঢ় ইচ্ছাশক্তি নিয়ে কাজে হাত দেয়, তারা বাধা পেলেও দমে যায় না বরং অসুবিধাগুলো চেষ্টা, সাধনা, মনোবল ও ইচ্ছার দ্বারা সরিয়ে সামনের দিকে অগ্রসর হয়। অনেক সময় এ কাজে মৃত্যুর ভয় থাকে। মৃত্যুকে ভয় না করে সামনের দিকে এগিয়ে যাওয়াই বীরের ধর্ম। যে জাতি বাধা-বিপত্তি এড়িয়ে সামনের দিকে অগ্রসর হতে অক্ষম সে জাতি অনুন্নত। পক্ষান্তরে, যেসব জাতি উন্নত তারা বহু বাধা-বিপত্তি এড়িয়ে আজ এ সফলতার দ্বারপ্রান্তে এসে পৌঁছেছে। কাজেই মৃত্যুভয়ে ভীত না হয়ে বাধা-বিপত্তি অতিক্রম করেই সফলতা অর্জন করতে হয়। এজন্য দরকার জীবনপণ সাধনা। লক্ষ্যকে ধ্রুবতারার মতো স্পষ্ট, সত্য ও স্থির-জ্ঞান করে যারা দৃঢ়তায় এগিয়ে যায়, তারাই সাধনায় সিদ্ধি লাভ করে। প্রতিবন্ধকতা থেকে পুনঃস্পৃহার সঞ্চার করতে পারে এই মহৎ একাগ্র সাধনা।

মন্তব্য: জীবনে সফলতার লক্ষ্যে প্রয়োজন হলে প্রাণ দিতে হবে। মৃত্যুকে উপেক্ষা করে দৃঢ় মনোবল নিয়ে কাজ করলে জীবনে সফলতা অনিবার্য।

৮৪. মরিতে চাহি না আমি সুন্দর ভুবনে,
মানবের মাঝে আমি বাঁচিবার চাই।

[ব. বো. '০৩]

মূলভাব: ফুলে–ফলে সুশোভিত এ পৃথিবী। মানুষ এখানে মায়াময় এক আশ্চর্য জগৎ নির্মাণ করেছে। মানুষ মরণশীল এটা চিরন্তন সত্য। কিন্তু সে তার কর্ম দ্বারা এ সুন্দর ধরণিকে আরও সুন্দর করার মধ্য দিয়ে মানুষের মাঝে অমর হয়ে থাকতে চায়।

সম্প্রসারিত ভাব: সৌরজগতের গ্রহগুলোর মধ্যে মানুষের বসবাসের জন্য একমাত্র আদর্শ গ্রহ আমাদের এই পৃথিবী। পরম করুণাময় সৃষ্টিকর্তা এ পৃথিবীকে সৃষ্টি করেছেন অপরূপ রূপে। শুধু তাই নয়– মানুষ, জীবজন্তু সমস্ত প্রাণীর জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণে সাজিয়ে দিয়েছেন সুন্দর এ পৃথিবীকে। এখানে মানুষ তার জীবনের প্রীতি–ভালোবাসা, সৌন্দর্যবোধ নিয়ে বাস করে। এখানে মানুষ মানুষের হৃদয়ে স্নেহ–ভালোবাসার আশ্রয় খোঁজে। মানুষ এ অপরূপ পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করে মৃত্যুবরণ করতে চায় না। এ পৃথিবীর সূর্যকরোজ্জ্বল দিন, জ্যোৎস্নাস্নাত রাত, বর্ষণমুখর সন্ধ্যা বা বৈরী বৈশাখী ঝড়ের উদ্দামতা সমস্ত কিছুর মধ্যেই জীবনের উত্তাপ ও আবেগ আছে, বেঁচে থাকার বিচিত্রতর স্বাদ এবং বৈচিত্র্য আছে। যতদিন এই পৃথিবীতে বেঁচে থাকব, ততদিন বিধাতার সুন্দর দানের মহিমাকে হৃদয় দিয়ে উপলব্ধি করব, এটাই মানুষের কাম্য। তাই মানুষ মোহময় পৃথিবীর মায়ার বাঁধন ছিন্ন করে মৃত্যুবরণ করতে চায় না। মায়াময় এ পৃথিবীতে সৌন্দর্যের মায়া–ফাঁদ পৃথিবীর সর্বত্র পাতা। এখানে কঠিন হৃদয়ের মানুষও বাঁধা পড়ে। শরতের স্নিগ্ধ মধুর রাত্রি, হেমন্তের শিশিরসিক্ত দূর্বাদল–শীর্ষে শিশিরের অপরূপ সৌন্দর্য মানবমনকে এতই আবেগমুগ্ধ ও বিস্মিত করে যে মানুষ তার মনের অজান্তে বলে ওঠে– "মরিতে চাহি না আমি সুন্দর ভুবনে।"

মন্তব্য: অনন্ত জীবন লাভ করা তো কোনো মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়। এ পৃথিবীতে মানবজীবন ক্ষণস্থায়ী।

৮৫. হাস্যমুখে অদৃষ্টেরে করব মোরা পরিহাস।

মূলভাব: অতীত মানবজীবনের এক অবিচ্ছেদ্য অধ্যায়। অতীত নীরবে মানুষের বর্তমান ও ভবিষ্যতের ওপর প্রভাব রাখে। তাই মানুষ ঘটমান কর্মকে তাদের অদৃষ্টের লিখন বলে মেনে নেয়।

সম্প্রসারিত ভাব: আসলে কিন্তু তা মেনে না নিয়ে অর্থাৎ, তাকে পরিহার করে সম্মুখপানে অগ্রসর হওয়াই জীবনের সার্থকতা। মহাকাল অনাদি, অনন্ত এবং নিরবচ্ছিন্ন। তাকে ক্ষুদ্র বা খণ্ড করে দেখলে সত্য দর্শন হয় না। সাধারণ মানুষ মহাকালের নিরবচ্ছিন্ন গতি উপলব্ধি করতে সক্ষম নয় বলে অনন্তকালপ্রবাহকে অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ– এ তিনটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে। মানুষ বর্তমানকালের সাক্ষ্য, অনাগত ভবিষ্যৎ তার কাছে এক বিরাট প্রশ্নবোধক চিহ্ন। মানুষের ভাগ্য বা অদৃষ্ট তার জীবনের সাফল্যের বিরাট বাধা। কেননা যেকোনো কাজ করতে গেলে অনভিপ্রেতভাবে যদি কাজটি সঠিকভাবে সম্পাদিত না হয়, তখন মানুষ মাথায় হাত রেখে অদৃষ্টকে দোষ দিতে থাকে। অথচ এটাই ভাবা একান্ত উচিত যে, সম্পাদিত কর্মটির কোথাও কোনো ত্রুটি আছে কি না, থাকলে তা কীভাবে ঘটলো এবং দ্বিগুণ উৎসাহে উক্ত ত্রুটিবিচ্যুতি অপসারিত করে সম্মুখে এগিয়ে যাওয়া। জীবনে চলার পথে বাধা–বিপত্তি, অদৃষ্টের দোহাই দিয়ে বসে থাকলে চলবে না। অদৃষ্টকে আপন কর্ম দ্বারা পরিবর্তন করে অর্থাৎ, তাকে হটিয়ে গন্তব্যে পৌছাতে হবে। আর যেখানে স্বয়ং আল্লাহপাকই ঘোষণা করেছেন, "আল্লাহ কোনো জাতির ভাগ্য পরিবর্তন করেন না, যতক্ষণ না তারা নিজেরা নিজেদের ভাগ্য পরিবর্তন করে।" তাই কোনো কার্যে সফলতা অর্জন করতে হলে ধৈর্য ও সহিষ্ণুতার মাধ্যমে নিরবচ্ছিন্ন চেষ্টা করাই অধ্যবসায়, আর এ অধ্যবসায় হলো কতিপয় গুণের সমষ্টি। চেষ্টা, উদ্যোগ, আন্তরিকতা, পরিশ্রম, ধৈর্য ইত্যাদি গুণের সমন্বয়ে অধ্যবসায় পরিপূর্ণতা লাভ করে। মনের আস্থা ও বিশ্বাসকে বাস্তব রূপদানের জন্য দৃঢ়সংকল্প নিয়ে কঠোর পরিশ্রম আর ধৈর্যের মধ্যে ঈপ্সিত লক্ষ্যে পৌঁছানোর মধ্যেই অধ্যবসায় নিহিত। অতএব, অদৃষ্টকে হাস্যমুখে পরিহাসের মাধ্যমে জীবনযুদ্ধে সম্মুখে অগ্রসর হতে পারলেই সফলতা এসে পদচুম্বন করবে।

মন্তব্য: অদৃষ্ট বা ভাগ্যকে জীবনপথের পুঁজি না করে আপন মেধা, শ্রম, আস্থা ও বিশ্বাসের সম্মিলন ঘটিয়ে সাফল্যের শীর্ষবিন্দুতে পৌঁছার মাধ্যমেই জীবনের সার্থকতা প্রস্ফুটিত হয়ে ওঠে।

৮৬. মানুষ বাঁচে তার কর্মের মধ্যে, বয়সের মধ্যে নয়।

[ঢা. বো. '১৯, '১৭; য. বো. '১৭, '১০;, রা. বো. '১৭, '১৪, '০৯; কু. বো. '০৫; ব. বো. '০১]

মূলভাব: বিশ্বজগতের অনন্ত কালপ্রবাহে মানুষের জীবন ক্ষণস্থায়ী। এ ক্ষণস্থায়ী জীবনও মহিমা পেতে পারে মানুষের মহৎ কর্মে ও অবদানে। তখন মৃত্যুর পরও মানুষ স্মরণীয় হয়ে থাকে। তাঁর বাঁচা সার্থক হয়। কর্মগুণেই মানুষের শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকৃত হয়।

সম্প্রসারিত ভাব: প্রজ্ঞা, হিতাহিত বোধ ও হৃদয় ঐশ্বর্যে সমৃদ্ধশালী বলে মানুষ সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ জীব হিসেবে জগতে প্রশংসিত। কিন্তু মানুষ মরণশীল। নশ্বর পৃথিবীতে মানুষ আপন কীর্তির মহিমায় অমরত্ব লাভ করতে পারে। বয়স বেশি হলেই বাঁচা সার্থক হয় না। কারণ একদিন জীবনের শেষ আহ্বান আসে। মৃত্যুর পর স্মৃতি আর কেউ ধরে রাখে না। বরং যারা অমোঘ মৃত্যুর কথা জেনেও সংক্ষিপ্ত পরিসরে জীবনের মধ্যে মানবকল্যাণে সুকীর্তির সাক্ষর রেখে যান, তাঁরা মরে গিয়েও চিরকাল মানুষের হৃদয়ে অমর হয়ে থাকেন। মানুষ তাঁদের সুকীর্তির কথা স্মরণ করে শ্রদ্ধাভরে মাথা নোয়ায়। দৈহিক মৃত্যু ঘটলেও মানুষের মাঝে তাঁরা বেঁচে থাকেন। এমন লোকের সত্যিই মৃত্যু নেই। মানুষের কর্মজীবন স্বল্পস্থায়ী হতে পারে আবার, দীর্ঘস্থায়ী হতে পারে। স্বল্পস্থায়ী জীবনেও মানুষ যদি কোনো মহৎ সাধনায় সফল হয় তবে সে জীবন সফল হয়। পক্ষান্তরে দীর্ঘজীবন যদি নিষ্ফল হয় তবে তা নীরবেই ঝড়ে পড়ে। কেউ তাকে মনে রাখে না। কীর্তিমান মানুষ গতানুগতিক জীবনযাপন করেন না। তিনি সমাজে আর দশজনের মধ্যে থেকে নিজেকে স্বীয় সাধনার বলে বিকশিত করে তোলেন। ফলে জগৎসংসারে তিনি হন নন্দিত ও বরণীয়। পরিপূর্ণ বিকশিত মানুষ হওয়ার জন্য তাই মানুষকে হতে হবে সহনশীল, ধৈর্যশীল, আত্মপ্রত্যয়ী ও স্থিরপতিজ্ঞ। সংগ্রামশীল জীবনযুদ্ধে মানুষ তাঁর বুদ্ধি ও প্রজ্ঞার দ্বারা সংগ্রাম করে জয়ী হয় এ যুদ্ধে। তাই প্রাণিকুলের মধ্যে মানুষ সর্বশ্রেষ্ঠ। পৃথিবীতে বহুলোক অল্প বয়সে মৃত্যুবরণ করেও তাদের কর্মের জন্য অমর হয়ে আছে। আবার কেউ কেউ দীর্ঘায়ু পেলেও তাদের নামপরিচয় মিলিয়ে গেছে কালস্রোতে। কিশোর ক্ষুদিরাম দেশের জন্যে জীবন দিয়ে অমর হয়েছেন। রফিক, সালাম, বরকতের মহান আত্মত্যাগের কথা বাঙালি কোনোদিন ভুলবে না। কর্মই তাঁদের বাঁচিয়ে রেখেছে, বয়স নয়।

মন্তব্য : জীবনের যে মহৎ অর্জন তা সৎকাজের দ্বারাই নিরূপিত হয়। তাই সৎকাজে নিজেকে নিয়োজিত রাখা উচিত। ইংরেজিতে প্রবাদ আছে– "Man does not live in years but indeeds." তাই মানুষের জীবন বয়সের মাপকাঠিতে নয়, মহৎ কীর্তির মাধ্যমেই সার্থক ও সুন্দর হয়।

৮৭. মিত্রত্ব সর্বত্রই সুলভ, মিত্রত্ব রক্ষা করাই কঠিন।

[ঢা. বো. '০০; কু. বো. '০৩]

মূলভাব: মিত্রত্ব গড়ে উঠতে প্রয়োজন পারস্পরিক আস্থা ও বিশ্বাস। এই আস্থা ও বিশ্বাস দীর্ঘকাল ধরে রাখা কঠিন। কেননা পারস্পরিক সন্দেহ ও স্বার্থপরতাই মিত্রত্ব রক্ষার প্রধান প্রতিবন্ধক।

সম্প্রসারিত ভাব: রক্তের সম্পর্ক থাকলে মানুষের মধ্যে আত্মীয়তা হয়। কিন্তু তাদের মধ্যে সবসময় আত্মার সম্পর্ক অটুট থাকে না। কিছু না কিছু স্বার্থের টানাপোড়েন থাকে বা কোনো কারণে মনোমালিন্য থাকে। ফলে মিত্রত্ব গড়ে উঠতে পারে না। যে কারণে মিত্রত্ব বা বন্ধুত্ব গড়ে ওঠে রক্তের সম্পর্কের বাইরের লোকজনের মধ্যে। সেখানে স্বার্থের টানাপোড়েন থাকে না। মতপার্থক্য থাকলেও পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধ ও সমঝোতা থাকে। সেজন্য তাদের মধ্যে পারস্পরিক আস্থা ও বিশ্বাস দৃঢ় হয়। আর তা স্বচ্ছন্দে টিকে থাকে দীর্ঘকাল। একসময় তা আত্মার সাথে আত্মার গভীর সম্পর্কে রূপলাভ করে। একজনের অনুপস্থিতি আরেকজনকে অস্থির ও ব্যথিত করে। প্রকৃতপক্ষে এটাই মিত্রত্ব বা বন্ধুত্ব। নানা পরিবেশ–পরিস্থিতিতে, নানা কারণে, নানাভাবে সহজেই বন্ধুত্ব গড়ে ওঠে। দুজন ব্যক্তির মধ্যে শুধু নয়, দুটো দেশ বা জাতির মধ্যেও মিত্রত্ব তৈরি হতে পারে। কিন্তু সে ধরনের মিত্রত্বে কিছু শর্ত থাকে। যতদিন সেসব শর্ত দুপক্ষ মেনে চলে ততদিনই মিত্রতা অটুট থাকে। একটুখানি স্বার্থে আঘাত লাগলেই শর্ত ভঙ্গ বা লঙ্ঘিত হওয়ার ঘটনা ঘটে এবং মিত্রতা নষ্ট হয়ে যায়। কখনো কখনো তা ঘোর শত্রুতায় পরিণত হয়। দুজন ব্যক্তির মধ্যেও স্বার্থসংশ্লিষ্ট ঘটনা ঘটা সম্ভব নয় এবং এরকম হলে বন্ধুত্ব আর থাকে না। বন্ধুত্ব ছিন্ন হওয়ার জন্য বৈষয়িক সম্পর্কই দায়ী। অন্য যেকোনো তুচ্ছ কারণেও ভুল বোঝাবুঝি থেকে মিত্রত্ব বা বন্ধুত্ব নষ্ট হতে পারে। আবার তৃতীয় কেউ ষড়যন্ত্র করেও বন্ধুত্বে ফাটল ধরাতে পারে। ঠুনকো মনমানসিকতার বন্ধুত্ব সাধারণত বেশিদিন স্থায়ী হয় না। মিত্রত্ব বা বন্ধুত্ব হলো দুজনের ভাবগত সম্পর্ক। এ সম্পর্ক রক্ষার জন্য পারস্পরিক ধৈর্য, সংযম, ত্যাগ ও সমঝোতাপূর্ণ মানসিকতা অত্যাবশ্যক। প্রকৃত বন্ধুর সম্পর্ক খুবই মধুর ও পবিত্র। সেখানে লোভ, লালসা বা স্বার্থপরতার স্থান নেই। এসবের উর্ধ্বে থেকে পারস্পরিক প্রীতি ও আত্মিক বন্ধনের মধ্যে প্রকৃত মিত্রত্বের পরিচয় ফুটে ওঠে।

মন্তব্য: পরস্পর সহমর্মী, সমব্যথী ও সমত্যাগী না হলে বন্ধুত্ব হয় না। সুসময়ে গড়া আর দুঃসময়ে ভাঙা কখনো বন্ধুত্ব নয়। সময়ের ঘাত–প্রতিঘাতের কষ্টিপাথরে নিখাদ হলেই মিত্রত্ব রক্ষা করা যায় চিরকাল, যা খুব সহজ নয়। এজন্যই বলা হয়েছে যে, মিত্রত্ব সর্বত্রই সুলভ, কিন্তু মিত্রত্ব রক্ষা করা কঠিন।

৮৮. মিথ্যা শুনিনি ভাই,

এ হৃদয়ের চেয়ে বড় কোনো মন্দির কাবা নাই। *[সি. বো. '০৮]*

মূলভাব: পৃথিবীর সব উপাসনালয় থেকে মানুষের হৃদয় মন্দির শ্রেষ্ঠ। কারণ পরিশুদ্ধ হৃদয়েই স্রষ্টা বিরাজ করেন। তাই হৃদয়ের মাঝেই সত্য সুন্দরের পূজা সম্ভব। মানবহৃদয়ে সত্যের নৈবেদ্য সাজিয়ে স্রষ্টার আরাধনা করলে স্রষ্টাকে লাভ করা যায়। হৃদয়ের ধর্মই মানুষের বড়ো ধর্মের পরিচয়। তাই হৃদয়ই স্বর্গ–হৃদয়ই সত্য–হৃদয়ই স্রষ্টা।

সম্প্রসারিত ভাব: স্রষ্টার সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ জীব মানুষ। তাই মানুষকে বলা হয় আশরাফুল মাখলুকাত। পৃথিবীতে অন্যান্য প্রাণীর রয়েছে জৈববৃত্তি। কিন্তু সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ জীব হিসেবে মানুষের আছে জৈববৃত্তি ও বুদ্ধিবৃত্তি। তাই অন্যান্য প্রাণী থেকে সে ভিন্নতর। হৃদয় নামক সত্তাটি কেবল মানুষের রয়েছে। আর সে কারণে মানুষের মাঝে রয়েছে প্রেম–প্রীতি, শ্রদ্ধা–ভালোবাসা, কল্পনা–সৌন্দর্যবোধ, ন্যায়–অন্যায়, পাপ–পুণ্যের অনুভূতি। হৃদয়মনের সমন্বয়ে সৎ কাজ দ্বারা মানুষ স্রষ্টাকে লাভ করতে পারে। স্রষ্টার সান্নিধ্যেই মানবতার মুক্তি নিহিত। পার্থিব জীবনে মানুষ নানা ঘাত–প্রতিঘাত, হিংসা–বিদ্বেষ, লোভ–লালসা, স্বার্থ–চিন্তা প্রভৃতির দ্বারা আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে। ফলে মানুষের হৃদয় ভরে ওঠে কলুষতায়। কিন্তু এর থেকে মুক্তি পেতে হলে হৃদয়কে পরিচ্ছন্ন রেখে পুণ্য সঞ্চয় করতে হবে। ব্যক্তিহৃদয় পাপ ও অন্যায়ে পূর্ণ হয়ে উঠলে মায়াময় সংসার ত্যাগ করে মানুষ ধর্মভেদে মসজিদ, মন্দির বা গির্জায় উর্ধ্বশ্বাসে ছুটে যায়। মুক্তির সন্ধানে সে বাহ্য জগতে কেঁদে ফেরে। কিন্তু প্রকৃত মুক্তি অন্তরের শুভ্র সত্যে। তাকে বাইরের মসজিদ–মন্দিরে খুঁজে লাভ নেই। তাই মুক্তিপাগল মানুষকে শান্তির অমিয় পান করতে হলে হৃদয়ের গহ্বরে শান্তিসুধার সন্ধান করতে হবে। কারণ প্রকৃত মুক্তির সন্ধান আছে হৃদয়ের পবিত্র মন্দিরে। হৃদয় দ্বারাই মানবতার পরিচয় মেলে। হৃদয়ের বিমল আনন্দ দ্বারা কলুষমুক্ত হয়ে মানুষ সত্যের পথে, ধর্মের পথে তথা মানবতার পথে ব্রতী হতে পারে।

মন্তব্য: মানবহৃদয়ের পরিশুদ্ধ আরাধনার মাধ্যমে পরম করুণাময়ের একান্ত সান্নিধ্য লাভ সম্ভব। তাই মানবহৃদয় সকল উপাসনালয়ের চেয়ে উত্তম। মানবহৃদয় কলুষিত হলে দিন–রাত শুচিশুদ্ধ আরাধনা করেও সফলকাম হওয়া সম্ভব নয়। কাজেই উপাসনালয় হতেও শ্রেষ্ঠ মানুষের হৃদয়মন্দির।

৮৯. মেঘ দেখে কেউ করিস নে ভয়

আড়ালে তার সূর্য হাসে।

NABARUN PUBLICATION

[চ. বো. '০১; সি. বো. '১১; ব. বো. '১২]

মূলভাব: সুখ এবং দুঃখ একে অপরের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। অবিমিশ্র সুখ এ জগতে পাওয়া যায় না। দুঃখের অগ্নিপরীক্ষার ভেতর দিয়েই মানুষের মন শুচিশুভ্র হয়ে ওঠে। আর মানুষ লাভ করে মহিমান্বিত জীবন।

সম্প্রসারিত ভাব: মানুষ সবসময় সুখের জন্য লালায়িত থাকে। সুখ তার নিকট পরম কামনার ধন, আর দুঃখ তার নিকট সর্বদাই পরিত্যাজ্য। সে চায় নিরবচ্ছিন্ন সুখ; কিন্তু তা কখনো সম্ভব নয়। কারণ মানুষের জীবন সুখ ও দুঃখ দিয়ে গাঁথা এক বিচিত্র মালার মতো। জীবনে যখন দুঃখের ঘোর অন্ধকার নেমে আসে, তখন মনে হয় এই অমানিশার শেষ নেই। কিন্তু দুঃখ ও বেদনার সেই কালান্তরণ একসময় অবশ্যই কেটে যায়। পূর্বের আকাশে উদিত হয় নতুন সূর্য। আগমন ঘটে সুখ–শান্তির। মেঘ যতই গভীর ও ঘন কালো হোক না কেন, সূর্যকে গ্রাস করার ক্ষমতা তার নেই। ক্ষণস্থায়ী মেঘ একসময় কেটে যাবে, হেসে উঠবে আলোর ঝলমলে সোনালি সূর্য। অমাবস্যার অন্ধকার চাঁদকে সাময়িকভাবে আড়াল করলেও একসময় আঁধারের বুক চিরে আকাশে ভেসে ওঠে নতুন চাঁদ। জোয়ার ভাটার মতো আমাদের এই জীবন। ভাটার পরে নদীতে যেমন জোয়ার আসে, তেমনিভাবে আমাদের জীবনে দুঃখের পরে সুখ আসে। আকস্মিক দুর্যোগ ও বিপদে ভেঙে না পড়ে প্রতিকূলতা মোকাবিলায় দৃঢ়চিত্তে ধৈর্য ধরতে হয়। বিপদ–বাধাকে জয় করার জন্য নিতে হয় সংগ্রামের প্রস্তুতি। তাই জীবনে অমারাত্রির কালো আঁধার দেখে শঙ্কিত হওয়ার কারণ নেই। সুখের পথ চেয়ে দুঃখকে তাই আলিঙ্গান করতে হবে।

মন্তব্য: দুঃখ–সুখের দোলায় দুলছে আমাদের এই পার্থিব জীবন। দুঃখ–কষ্ট, দ্বন্দ্ব–সংঘাত আমাদের আনন্দকে হরণ করে, কিন্তু এগুলো সাময়িক। ধৈর্য না হারিয়ে আমরা দৃঢ়ভাবে এসবের মোকাবিলা করতে পারি। আর তাহলেই আমাদের জীবন সুন্দর ও সাফল্যময় হয়ে উঠবে। দুঃখ জীবনকে মেঘের মতো আড়াল করে দাঁড়ালেও দুঃখ দেখে নির্ভয় থাকতে হবে এবং দুঃখ জয়ের জন্য সচেষ্ট হতে হবে।

৯০. যতনে রতন মিলে, সার সত্য এই।

মূলভাব: এই পৃথিবীতে মানুষকে সাফল্য লাভ করতে হলে কাজের প্রতি যত্নবান ও পরিশ্রমী হতে হবে। অলস ও যত্নহীন মানুষ কখনো সাফল্যের সোনালি সিঁড়িতে পা রাখতে পারে না।

সম্প্রসারিত ভাব: এ সংসার বড়ো কঠিন স্থান। এখানে প্রতিটি মানুষকে তার অস্তিত টিকিয়ে রাখার জন্য উদয়াস্ত পরিশ্রম করতে হয়; নচেৎ তার এ পৃথিবী হতে বিলুপ্ত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। আমরা অতীত ইতিহাস হতে এই শিক্ষা পাই যে, বিনা পরিশ্রমে, বিনা সাধনায় কোনো দেশ ও জাতি বড়ো হতে পারেনি এবং এ সঙ্গে এটিও দেখা যায় যে, সংসারে যত্ন, পরিশ্রম ও উদ্যমের ফলে যাঁরা সাফল্যের স্বর্ণচূড়ায় আরোহণ করেছেন, তাঁরা অক্ষয়কীর্তির স্তম্ভ নির্মাণ করেছেন। তাঁরা সকলের নমস্য বলে চিরকাল শ্রদ্ধার আসন পেয়েছেন। এটি ব্যক্তির ক্ষেত্রে যেমন সত্য, সমষ্টির ক্ষেত্রেও তেমনি সত্য। কথায় বলে, 'যত্ন করলে রত্ন মিলবে।' অন্যভাবেও বলা যায়, 'কষ্ট করলে কেষ্ট মিলবে।' পন্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, বিজ্ঞানাচার্য আইজাক নিউটন, বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বিশ্ববিশ্রুত নাট্যকার উইলিয়াম শেক্সপিয়র প্রমুখের জীবন হতে জানা যায় যে– তাঁদের যত্ন, তিতিক্ষা ও সাধনার ফলে আজ বিশ্বে কীর্তিমান ব্যক্তি হিসেবে তাঁরা আবাল–বৃদ্ধ–বনিতার হৃদয়–সিংহাসনে অবস্থিত। তুমি যদি তোমার কাজের প্রতি নিষ্ঠাবান ও যত্নবান হও তবে অবশ্যই তুমি সফলতার উচ্চ শিখরে পদার্পণ করবে। পক্ষান্তরে কোনো ব্যক্তি যদি অগোছালো ও যত্নহীনভাবে কোনো কাজ করে তবে সে কখনো সাফল্যের মুখ দেখবে না।

মন্তব্য: চেষ্টা ও যত্ন করলে সাফল্য অনিবার্য; চেষ্টা ও যত্নের দ্বারা পথের কাঙালও একদিন রাজরাজেশ্বর হতে পারে। এরূপ দৃষ্টান্ত ভূরি ভূরি আছে। অতএব, যত্ন করলে যে রত্ন মিলবে এ সত্য চিরন্তন।

৯১. যত বড় হোক ইন্দ্রধনু সে সুদূর আকাশে আঁকা
আমি ভালোবাসি মোর ধরণীর প্রজাপতির পাখা। *[য. বো. '০২]*

মূলভাব: অধরার সৌন্দর্যে মানুষ অধিক মোহমুগ্ধ হয়, তাকে পেতে চায় হাতের মুঠোয়। সে নিয়ে তার আকাঙ্ক্ষার শেষ নেই, কল্পনাবিলাসের অন্ত নেই। নাগাল–বহির্ভূত বস্তু মানুষের কল্পনার সামগ্রী– যা ঠিক নয়। কারণ বাস্তব আর কল্পনা এক নয়।

সম্প্রসারিত ভাব: বাস্তব আর কল্পনার মধ্যে দুস্তর ব্যবধান। মানুষ মাটির পৃথিবীর সন্তান। প্রকৃতির লতা–পাতা, গাছ, ফুল, ফল, পাখি এসব নিয়েই তাঁর পরিবেশ। এই মাটির পৃথিবীকে নিয়েই তার অভ্যস্ত জীবনযাত্রা অব্যাহত গতিতে এগিয়ে চলছে। তথাপি মানুষ স্বপ্নবিলাসী। দূরের আকাশের সাতরঙা ইন্দ্রধনুর বিচিত্র বর্ণচ্ছটায় মানুষের স্বপ্নচারী মনকে হাতছানি দেয়। কিন্তু যা ক্ষণস্থায়ী, যা ধরাছোঁয়ার বাইরে তা যত বড়ো বা যতই সুন্দর হোক না কেন, তার চেয়ে আকর্ষণীয় চিরপরিচিত নিত্যদিনের ধূলিমাখা এই পৃথিবী। কেননা বর্ণসুষমায় ইন্দ্রধনু যতই মনোমুগ্ধকর ও নয়নরঞ্জন হোক না কেন, বাস্তবের সাথে তার কোনো সম্পর্ক নেই। জীবনের বাস্তব ক্ষেত্রে তা সম্পূর্ণ গুরুত্বহীন।

বাস্তবের কঠিন মাটিতে পা ফেলে মানুষকে জীবন চালাতে হয়। সেজন্যে দূরের রংধনুর চেয়ে নাগালের মধ্যে যে ছোট্ট প্রজাপতি তার রঙিন পাখায় ভর করে উড়ে বেড়ায়, তার মধ্যেই বিমূর্ত সৌন্দর্যকে উপলব্ধি করা যায়। সুতরাং বহুদূরের সৌন্দর্য যা হাতের নাগালে নয় এমন সৌন্দর্যের চেয়ে জীবনের খুব কাছাকাছি সহজ ও উপভোগ্য সৌন্দর্যের মূল্য অনেক বেশি। সীমার বাইরে কোনো বস্তু উপভোগ্য বলে বিবেচিত হতে পারে না। কল্পনার ভাবালুতা অমর্ত্যচারী করে অনৈসর্গিক স্বর্গলোকে বিচরণ করায়। জীবনে তার প্রয়োজনীয়তা কতখানি তা ভেবে দেখা দরকার। যেখানে "ক্ষুধার রাজ্যে পৃথিবী গদ্যময়", সেখানে রামধনুর বর্ণসুষমা নিয়ে ভাবালুতা পরিহাসতুল্য।

মন্তব্য: আকাশকুসুম পরিকল্পনা না করে, সাধ ও সাধ্যের মধ্যে সামঞ্জস্য রক্ষা করে চলা উচিত। দুষ্প্রাপ্য অলীক কোনো কিছু পাওয়ার দুরাশা না করে হাতের কাছে যা পাওয়া যায় তা নিয়েই সন্তুষ্ট থাকা উচিত বা উত্তম।

৯২. যারে তুমি নিচে ফেল, সে তোমারে বাঁধিছে যে নিচে,

পশ্চাতে রেখেছ যারে, সে তোমারে পশ্চাতে টানিছে।

মূলভাব: মানুষের অস্তিত্ব রক্ষার প্রক্রিয়ায় সমন্বিত ব্যবস্থা বিদ্যমান। প্রত্যেকটি মানুষ সমাজের অন্যান্য মানুষের সাথে সহযোগিতামূলক মনোভাব নিয়ে যদি এগিয়ে যায় তাহলে সুন্দর সমাজব্যবস্থা যেমন গড়ে উঠতে পারে, তেমনি মানুষের ব্যক্তিগত সুখ ও সমৃদ্ধি নিশ্চিত হতে পারে।

সম্প্রসারিত ভাব: সমাজে যারা উঁচু–নিচু, ধনী–গরিব এসব শ্রেণিবৈষম্যের সৃষ্টি করে তারা সমাজহিতৈষী নয়, মানবহিতৈষী নয়। এমনকি এসব স্বার্থপর মানুষ নিজেরাও একসময় বিপদগ্রস্ত হয়। কারও কোনো ক্ষতি করলে সে ক্ষতি পরে নিজের ঘাড়েই এসে যাবে। সেজন্য কাউকে অন্যায়ভাবে কষ্ট দিতে নেই। অন্যের অকল্যাণ চাইলে নিজের অকল্যাণ হয়। আর অন্যের ক্ষতি করতে চাইলেও নিজের ক্ষতি হয়ে যায়। বাস্তবজীবনে অনেকেই অন্যের ক্ষতি কিংবা অমঙ্গল কামনা করতে থাকে। আমরা একজনকে নিচে ফেলে দিয়ে নিজে যে নিচু কাজ করলাম সেকথা ভেবে দেখি না। আবার অন্যের উন্নতিতেও আমরা অহংকার ও অস্বস্তিবোধ করে থাকি। ফলে আমরা নিজেরাও উন্নতির চরম শিখরে আরোহণ করতে পারি না। প্রতিহিংসাপরায়ণ হয়ে অন্যকে নিয়ে যে চিন্তা করি, সে একই অবস্থার শিকারে পরিণত হয়ে আমরা হাবুডুবু খেতে থাকি। ফলে জীবন হয় মহত্ত্বহীন এবং অসুন্দর। তাই অন্যকে নিচে টেনে রাখতে চাইলে কিংবা পেছনে ফেলে দিতে চাইলে, সেই একই অবস্থায় নিজেকেই পড়তে হয়। সুতরাং আমাদের সকলের উচিত অন্যকে নিচে কিংবা পেছনে ফেলে দেওয়ার চিন্তা পরিহার করে সুস্থ, সাবলীল এবং মহৎ জীবনযাপনে ব্রতী হওয়া। জীবনপথে চলতে বহু লোকের সাক্ষাৎ পাওয়া যাবে। সে পথে কাউকে জোর করে পেছনে ফেলে দিতে চাইলে, সেই তোমাকে পেছনে ফেলে দেবে।

মন্তব্য: সবার ঐকান্তিক প্রচেষ্টার মাধ্যমেই সুন্দর সমাজব্যবস্থা এবং ব্যক্তিগত সুখসমৃদ্ধি নিশ্চিত হতে পারে। কারও একার পক্ষে তা সম্ভব নয়, এটাই বাস্তবতা।

৯৩. যাহা চাই তাহা ভুল করে চাই, যাহা পাই তাহা চাই না।

[য. বো. '০৭]

মূলভাব: মানবজাতির স্বভাবজাত বৈশিষ্ট্যের কারণে মানুষ সুখ–দুঃখের আপেক্ষিক অনুভূতিতে নিজস্ব প্রাপ্তিতে সুখী বা তৃপ্ত নয়। মানবমনের চাওয়া–পাওয়ার শেষ নেই। মানুষের মন যা পেতে চায় তা পেলেও যে তা নিয়ে তৃপ্ত হবে এমন কোনো নিশ্চয়তাও নেই। বরং নতুন কিছু পাওয়ার জন্য মন পুনরায় অস্থির হয়ে ওঠে।

সম্প্রসারিত ভাব: প্রবহমান নদীর তীরে নানা মানুষের বাস। তাদের জীবনও নানা রকম হাসি–কান্নায় পূর্ণ। জীবনের আগের চাঞ্চল্য, মান–অভিমান, ব্যথা–বেদনা প্রভৃতিও তাদের জীবনকে সর্বদা নিয়ন্ত্রিত করে। দুই তীরের মানুষ পরস্পরের মধ্যে ভাবের আদান–প্রদান করে এবং নিজেদের মধ্যে মিলিয়ে নেয় নানা ভাবে। তা সত্ত্বেও নদীর দুই তীরের লোকজনের মধ্যে একটা প্রচ্ছন্ন ঈর্ষার ভাব বিদ্যমান। নদীর এপারের লোকের বিশ্বাস যা কিছু সুখ তা ওপারে, আবার বিপরীতভাবে ওপারের মানুষের মনেও একই বিশ্বাস পুঞ্জীভূত। উভয় তীরের লোকেরা মনে করে তারাই কেবল দুঃখী, অপরেরা নিশ্চয়ই সুখী। দূরের স্বপ্ন তাদের অনুমোদিত করে। নাগালের বস্তুমাত্রই তাদের কাছে কঠিন বাস্তবতায় ভরা বলে মনে হয়, আর দূরের অদৃশ্য কাল্পনিক বস্তুই তাদের চোখে ধরা দেয় স্বপ্নময় সুখ–শান্তির নিকুঞ্জ হিসেবে। নিজেকে সুখী মানুষ মনে করে জগৎসংসারে এমন লোক দেখা যায় না। নিজের তুলনায় অন্যকে সুখী ভাবা মানুষের স্বভাবজাত ধর্ম। কিন্তু নিরপেক্ষভাবে বিচার করলে দেখা যাবে, সুখ–দুঃখবোধ আপেক্ষিক। অন্যের ধন–দৌলত ও সুখের প্রতি মানুষের আকর্ষণ ও ঈর্ষা দুই–ই আছে। কাল্পনিক অভাবের সৃষ্টি করে মানুষ তার অন্তরের পরিতৃপ্তি হারায়। অপরের মধ্যেও যে অতৃপ্তি আছে তার সন্ধান সে রাখে না। এভাবে একটা অতৃপ্তি, একটা অভাববোধ প্রত্যেক মানুষের মধ্যে আছে। এই অভাববোধ ও তৃপ্তিহীনতা মানুষের সাংসারিক জীবনের প্রশান্তি যেমন নষ্ট করে, তেমনি তাকে একটা বৃহত্তম জীবনের পথে অগ্রসর হওয়ার প্রেরণা দেয়। আসলে সুখের অধিষ্ঠান মানুষের অন্তরে, বাইরে তাকে পাওয়ার জন্য মানুষের ছোটাছুটির বিরাম নেই। মানবজীবনের এ এক অমোঘ বিধান। এ অমোঘ বিধানে মানুষ চিরকাল ধরে সুখের সন্ধানে ছুটে চলছে। অন্তহীন এ পথে মানুষের ছুটে চলা কোনোদিনই শেষ হবে না। তাছাড়া পুরাতনকে ফেলে নতুনের প্রতি আগ্রহ মানবমনের এক চিরন্তন প্রবৃত্তি। নতুনের নবতর স্বাদের আশায় উন্মুখ হয়ে থাকে মানুষ। এ কারণেই মন নতুনকে গ্রহণ করতে চায়, পুরাতনের একঘেয়েমি থেকে বাঁচতে চায়। পুরাতন তখন সহজলভ্য হিসেবে বিবেচিত হয় এবং ধারণা করা হয় যে পূর্বের প্রত্যাশাটা ভুল প্রত্যাশা ছিল। কিন্তু মানুষ হয়তো বুঝতে পারে না, নতুন প্রত্যাশাও প্রাপ্তির পর একদিন পুরাতন হবে এবং কখনো

সেগুলো ভুল প্রত্যাশা ছিল বলে পরিত্যক্ত হবে। মানুষের এই প্রত্যাশা ও প্রাপ্তির মাঝে সমন্বয়বিধান করা কোনোদিনই সম্ভব নয়। তাই মানুষকে প্রাপ্তির আকাঙ্ক্ষা নিয়ে তার জীবনলীলা সাঙ্গ করতে হয়।

মন্তব্য: আসলে মানবজীবনে সীমাহীন সাধনার প্রেক্ষিতে এই প্রত্যাশা এবং প্রাপ্তির মধ্যে কোনো মিল খুঁজে পাওয়া যায় না। মানুষের জীবনে এটা একটা বিরাট রহস্য। অন্যের সুখে ঈর্ষান্বিত না হয়ে; বরং নিজের কাছে যা আছে তা নিয়ে তুষ্ট থাকা উচিত।

৯৪. যাহারা তোমার বিষাইছে বায়ু, নিভাইছে তব আলো, তুমি কি তাদের ক্ষমা করিয়াছ, তুমি কি বেসেছ ভালো?

মূলভাব: স্রষ্টার বৈচিত্র্যময় সৃষ্টির মধ্যে মানুষ সর্বশ্রেষ্ঠ। মানুষের এই শ্রেষ্ঠত্ব নির্ভর করে তার বিবেকবুদ্ধির ওপর। মানুষের সেই বিবেকবুদ্ধি সীমাবদ্ধ। অসীম স্রষ্টার কর্মকাণ্ডের খোঁজখবর করা তাই মানুষের পক্ষে সম্ভব হয়ে ওঠে না। ফলে মাঝে মাঝে মানুষ তাঁর কাছে প্রশ্ন করে, তাঁর কর্মকাণ্ডের ব্যাপারে জানতে চায়।

সম্প্রসারিত ভাব: জগতে ক্ষমা মহৎ গুণ হিসেবে স্বীকৃত। পৃথিবীতে স্রষ্টার মনোনীত যত মহামানব এসেছেন, তাঁরা সবাই মানুষকে হিতোপদেশ দিয়েছেন। অন্তর থেকে বিদ্বেষ–বিষ দূর করে কল্যাণমন্ত্রে অন্তর ভরিয়ে তুলতে বলেছেন। তারা সত্য ও ন্যায়ের বাণী প্রচার করে স্মরণীয়–বরণীয় হয়েছেন। মানুষকে ক্ষমার আদর্শে গড়ে তুলতে সচেষ্ট হয়েছেন। সবাইকে ক্ষমা করতে বলে, উদারতার সমাজ গড়ে তুলতে চেয়েছেন। ফলে অনেক ক্ষেত্রে ক্ষমালাভের অযোগ্যরাও ক্ষমা পেয়ে গেছে। তাই সীমাবদ্ধ ক্ষমতার মানুষের মনে প্রশ্ন জেগেছে, যে অপরাধীকে মানুষ তার উদারতা দিয়ে ক্ষমা করে দেয়, স্রষ্টার কাছেও কি সেই অপরাধী ক্ষমা পেয়ে থাকে? যারা স্রষ্টার দেওয়া কল্যাণকর নানা উপাদান নষ্ট করে, প্রকৃতির সুন্দরকে ধ্বংস করে, তিনি তাদের ক্ষমা করে দেন কি না? নাকি শাস্তি দেন এই ভাবনা উঠেছে ভাবুক মনে। কারণ জগতের সমস্ত সৃষ্টির কল্যাণকামী স্রষ্টা কারও একার তুষ্টির জন্য সমষ্টিকে কষ্ট দিতে পারেন না। তার দেওয়া জ্ঞান–বিবেক–বুদ্ধির যারা অপব্যবহার করে তিনি তাদেরকে ক্ষমা করে দিতে পারেন না। কেননা, জগতের হিতসাধনাই তার কর্ম। কিন্তু মানুষ জ্ঞানের স্বল্পতায় সিদ্ধান্ত নিতে পারে না, স্রষ্টা আসলে অপরাধীকে ক্ষমা করেছেন কি না।

মন্তব্য: ভাবুক মানুষের মনে এ সিদ্ধান্তহীনতার কারণ জগতে প্রতিকারহীন শক্তির নানা অপরাধে বিচারের বাণী নীরবে–নিভৃতে কাঁদে, মানুষের স্বপ্ন দুঃস্বপ্নের অন্ধকারে ঢেকে যায়। মানুষ তাই অশ্রুজলে তাঁর কাছে হাত তোলে, তিনি সত্যিই তাদের ক্ষমা করে দিয়েছেন কি না?

NABARUN PUBLICATION

৯৫. যে একা সেই সামান্য। যাহার ঐক্য নাই, সেই তুচ্ছ।

[চ. বো. '০৫]

মূলভাব: পৃথিবীতে কোনো মানুষই একা বাস করতে পারে না। যদি বাস করে, তাহলে সে নিঃসঙ্গ ও অসহায় হয়ে পড়ে।

সম্প্রসারিত ভাব: মানুষ একতাবদ্ধ হয়ে বাস করে। এভাবে বসবাস করাই সভ্য জগতের মানুষের ধর্ম। দেশে দেশে যে সামাজিক রীতি গড়ে উঠেছে তাতে দেখা যায় যে, এক–একজন নাগরিক তার সংসারে পিতা, মাতা, স্ত্রী, পুত্র, কন্যা, স্বজন নিয়ে একত্রে বসবাস করে থাকে। এর অন্যথা ঘটলে সংসারে নানা বিড়ম্বনার সৃষ্টি হতে বাধ্য। একতাই বল; এর শক্তি অসীম। যে একতাহীনভাবে বাস করে তার বিপদ পদে পদে। সে শক্তিহীন, দুর্বল, সামান্য। বিপদে–আপদে তার কোনো ভরসা নেই। দেশের সম্বন্ধেও এ–কথা খাটে। দেশের অধিবাসীদের মধ্যে একতার বা ঐক্যের অভাব দেখা দিলে বিপদের দিনে চরম সর্বনাশ ঘটে। দেশের মানুষের মধ্যে, সৈন্য–সেনাপতির মধ্যে অনৈক্যের জন্যই বঙ্গ, বিহার ও উড়িষ্যার দেশপ্রেমিক নবাব সিরাজউদ্দৌলা ইংরেজ সেনাপতি রবার্ট ক্লাইভের কাছে পরাজিত হন ও করুণ মৃত্যুবরণ করেন। আমাদের জাতীয়, সামাজিক ও পারিবারিক জীবনে একতার প্রয়োজন সর্বাধিক। মাটির পৃথিবীর সামান্য ছোটো ছোটো পিঁপড়ার মধ্যেও আমরা ঐক্য লক্ষ করি। তারা নিয়মশৃঙ্খলা অনুযায়ী ঐক্যবদ্ধ হয়ে চলাফেরা করে এবং নিজেদের আকৃতির তুলনায় অনেক বড়ো জিনিস বহন করতে পারে। আমরা দেখি যে, মানুষ একা যা করতে পারে না দশজনে তা খুব সহজেই করতে পারে। তাই বলা যায়, যে একা সেই সামান্য; যার দ্বারা আমরা কঠিন বা বড়ো কোনো কাজের আশা করতে পারি না। অনৈক্য বা একতাহীনতার পরিণাম আমরা আমাদের ব্যক্তিগত জীবন এবং জাতীয় জীবনে প্রত্যক্ষ করতে পারি।

মন্তব্য: যে একা তার কোনো দোসর নেই, তার আত্মীয়রাও তাকে ভালোবাসে না, শ্রদ্ধা করে না। ফলত অনৈক্য বা একতাহীনতা সকল বিড়ম্বনার মূল উৎস, এ কথা ধ্রুবতারার মতো সত্য।

৯৬. যেখানে দেখিবে ছাই, উড়াইয়া দেখ তাই
পাইলেও পাইতে পার, অমূল্য রতন।

মূলভাব: অতি তুচ্ছ কোনো বস্তুর ভেতরও মূল্যবান কিছু থাকতে পারে। তাই তুচ্ছ বলে কোনোকিছুই অবহেলা করা অনুচিত।

সম্প্রসারিত ভাব: মানুষ সাধারণত বড়ো বা মূল্যবান জিনিসের প্রতি সহজেই আকৃষ্ট হয়ে পড়ে। ছোটো ও নগণ্য বস্তুকে তুচ্ছ জ্ঞান করে অবহেলার দৃষ্টিতে দেখে। অসার ছাইয়ের নিম্নদেশে অমূল্য রত্নরাজি লুকায়িত থাকতে পারে। কেবল এর উপরিভাগ দেখে একথা মনে করা বাঞ্ছনীয় নয় যে, তার সমস্তটাই অসার পদার্থ। আমাদের সমাজ সংসারে এরূপ অসার পরিবেশের ভেতর হতে অনেক মূল্যবান সম্পদ আবিষ্কৃত হতে পারে। উদাহরণস্বরূপ পন্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের পিতা কট্টর ব্রাহ্মণ ঠাকুরদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথা স্মরণ করা যায়। ঠাকুরদাস ছিলেন অতি সাধারণ একজন মানুষ। তৎকালীন বঙ্গীয় সমাজে তাঁর না ছিল কোনো প্রতিষ্ঠা, না ছিল আভিজাত্যের গরিমা, তিনি অনেকটাই ছিলেন যেন ছাইয়ের মতো মূল্যহীন পদার্থ কিন্তু তাঁরই পুত্রসন্তান ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর নিজের মনীষা ও ব্যক্তিত্ব দ্বারা উনবিংশ শতাব্দীর বঙ্গীয় সমাজে যে বিপ্লবাত্মক কর্মকান্ডের দ্বারা বিস্ফোরণ ঘটালেন তা একটি ঐতিহাসিক ঘটনা। প্রকৃতপক্ষে, একটি অসার সমাজ সংসারের ভেতর হতে বিদ্যাসাগর নামক একটি অমূল্য রত্নের অভ্যুদয় সম্ভবপর হয়েছিল। ফলে দেখা যায় যে, সাধারণ যেকোনো কিছুর ভেতর অসাধারণ কিছু থাকতে পারে। কোনো মানুষের সাধারণ পোশাক–পরিচ্ছদ দেখে তাকে অবজ্ঞা করা উচিত নয়, কারণ সেই সাধারণ পোশাকের ভেতরই অসাধারণ মানুষ থাকতে পারে।

মন্তব্য: পৃথিবীতে অনেক মানুষ ছিলেন যাদের তুচ্ছ মনে করা হয়েছিল কিন্তু তাঁরা মেধা মনন ও চরিত্রের মাধুর্যে তাঁদের সত্যিকার পরিচয় দিয়েছিলেন।

৯৭. যে জন দিবসে মনের হরষে, জ্বালায় মোমের বাতি
আশুগৃহে তার দেখিবে না আর, নিশীথে প্রদীপ–ভাতি।

মূলভাব: মিতব্যয়িতা মানুষের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। অমিতব্যয়িতা এবং অসংযমতার জন্যই মানুষ দুঃখ–কষ্টের শিকার হয়। খেয়ালের বসে অহেতুক অর্থ নষ্ট করলে জীবনে সীমাহীন দারিদ্র্যের মধ্যে নিপতিত হতে হয়।

সম্প্রসারিত ভাব: সৃষ্টিজগতে মানুষই সর্বশ্রেষ্ঠ। বিবেক, বুদ্ধি, মূল্যবোধ, আত্মসংযম, অস্তিত্ববাদ প্রবলভাবে বিদ্যমান কেবল মানুষের মধ্যেই। পরিকল্পনার মাধ্যমে মানুষ নির্মাণ করে নিজেকে। কোথাও নিজেকে সর্বাত্মকভাবে নিয়োজিত করে আবার কোথাও সংযত করে নিজেকে পরিচালিত করে। অর্থ–সম্পদ ব্যয়ের ক্ষেত্রেও এই পরিকল্পিত অভ্যাসই মিতব্যয়িতা। তাই সময় ও অর্থ নষ্ট না করে পরিমিতভাবে ব্যয় করা উচিত। নয়তো পরে প্রায়ই অভাব–অনটনের মধ্যে দিনানিপাত করতে হয়। দিনের বেলায় সূর্যের আলোতে পৃথিবী আলোকিত হয় বলে সবকিছু এমনিতেই দৃষ্টিগোচর হয়। তাই এই সময়ে প্রদীপের প্রয়োজন হয় না। কিন্তু অমিতব্যয়ী ব্যক্তি যদি মনের আনন্দে বিলাসিতা করে দিনের বেলাতে প্রদীপ জ্বালিয়ে রেখে তার সঞ্চিত তেল শেষ করে ফেলে, তবে ভবিষ্যতে তেলের অভাবে রাতের অন্ধকারেও প্রদীপ জ্বালাতে পারে না। তখন অন্ধকারের মধ্যেই সময় কাটাতে হয়। তাই সময় থাকতেই সবকিছুর সদ্ব্যবহার করতে হয়। অনুরূপভাবে ধন–সম্পদের প্রাচুর্যের সময় যদি ভবিষ্যতের চিন্তা না করে, সঞ্চয় না করে প্রয়োজনে–অপ্রয়োজনে সব অর্থ ব্যয় করে তবে প্রয়োজনের সময়ও অর্থ পাবে না। তাকে অশেষ দুঃখ, কষ্ট, লাঞ্ছনা সহ্য করতে হয়। তখন হয়তোবা কৃতকর্মের জন্য অনুশোচনা করবে কিন্তু তখন আর কোনো লাভ হবে না। তাই অর্থ–সম্পত্তি সৎ কাজে এবং মিতব্যয়িতার সাথে ব্যয় করা উচিত। অপব্যয় না করে প্রয়োজন অনুযায়ী খরচ করতে হবে। ইংরেজিতে একটি প্রবাদ আছে– 'Cut your coat according to the cloth'. 'অর্থাৎ আয় বুঝে ব্যয় করো।'

মন্তব্য: অমিতব্যয়ী মানুষ দিনে দিনে ধ্বংসের দিকে এগিয়ে যায়। জীবনের স্বাচ্ছন্দ্য সচ্ছলতা হারিয়ে দারিদ্র্যের মধ্যে প্রবেশ করে। তাই অমিতব্যয় পরিহার করা উচিত।

৯৮. যে সহে, সে রহে।

[ব. বো. '০৬, '০৩; রা. বো. '০৩; ঢা. বো. '০৮; চ. বো. '১৫, '১৩]

SINCE 1993 NABARUN PUBLICATION

মূলভাব: প্রতিকূলতা জয় করে জীবনে প্রতিষ্ঠা অর্জনের ক্ষেত্রে মানুষের এক মহৎ গুণ সহনশীলতা। ধৈর্য ধরে সহনশীল মনোভাব নিয়ে যিনি সমস্যা মোকাবিলা করেন, তিনিই জীবনযুদ্ধে জয়ী হন। পক্ষান্তরে অধৈর্য ও অস্থির স্বভাব জীবনকে করে তুলতে পারে সমস্যাকীর্ণ ও দুর্বিষহ।

সম্প্রসারিত ভাব: মানুষের মতো বাঁচতে হলে বা আপনার অস্তিত্ব বজায় রাখতে হলে এবং জীবনে সাফল্য অর্জন করতে হলে সর্বাগ্রে প্রয়োজন সহনশীলতা। তাই বিশ্ব সংসারে সহ্য করার শক্তি ও যোগ্যতা যার আছে সে–ই কেবল বেঁচে থাকার অধিকারী। সহনশীলতা মানবজীবনের অন্যতম সাম্যরীতি। পৃথিবীতে অবিমিশ্র সুখ–দুঃখ বলে কিছু নেই। সুখ–দুঃখ আসলে মুদ্রার এপিঠ–ওপিঠ। বিপদের মধ্য দিয়েই মানুষের যাত্রা শুরু হয়। তাকে সংগ্রাম করতে হয় প্রতিকূল অবস্থার সঙ্গে। রোগ–শোক, দুঃখ–দারিদ্র্য, অন্যায়–অবিচার– এসবের চাপে মানব পর্যুদস্ত হয়। চোখে বিভীষিকা দেখে। কিন্তু এসব প্রতিরোধ করার জন্য চাই শক্তি, অধ্যবসায় ও সহিষ্ণুতা। যুদ্ধে জয়–পরাজয় আছেই কিন্তু যে মানুষ পরাজয়কে অম্লানবদনে মাথা পেতে নিয়ে পরবর্তী বিজয়ের জন্য ব্রতী হয় এবং বিজয় অর্জন করতে পারে সে–ই যথার্থ বীর। মানবজীবন সবসময় সহজসরল পথে চলে না। জীবনের পথে চলতে গিয়ে মানুষকে মোকাবিলা করতে হয় নানা বিপদ–আপদ। ইতিহাসের পাতায় এরূপ বহু দৃষ্টান্ত খুঁজে পাওয়া যায়। Scottland–এর রাজা রবার্ট ব্রুস England–এর সাথে ছয়বার যুদ্ধে পরাস্ত হয়েও ধৈর্যধারণ করেছিলেন এবং সহিষ্ণুতার গুণে পুনরায় যুদ্ধ করে সপ্তমবারের প্রচেষ্টায় শত্রুর কবল থেকে স্বদেশ উদ্ধার করেন। জীবনের সর্বক্ষেত্রে প্রতিকূল পরিস্থিতি মোকাবিলা করতে গিয়ে মানুষকে ধীরস্থিরভাবে সমস্যার প্রকৃতি বুঝতে হয়। অনুসন্ধান করতে হয় সমস্যা সমাধানের পথ। ধৈর্য ধরে সুচিন্তিত পদক্ষেপ না নিলে বিপদ মোকাবিলায় মারাত্মক ভুল হয়ে যায় এবং তার জন্য যথেষ্ট খেসারত দিতে হয়। পক্ষান্তরে ধৈর্য ও সহনশীলতার সঙ্গে সমস্যা মোকাবিলা করলে তাতে সাফল্য আসে বেশি।

মন্তব্য: ধৈর্যহীন লোক কোনো সমস্যাকেই নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারে না। বরং স্বাভাবিক পরিস্থিতিকে অনেক সময় জটিল করে তোলে। ধৈর্যহীনতা তাই চিন্তা ও কর্মে সাফল্যের অন্তরায়। পক্ষান্তরে ধৈর্যশীল মানুষ ধীরস্থিরভাবে, ভেবেচিন্তে কর্মপন্থা নির্ধারণ করতে পারে– সমস্যা মোকাবিলায় সফল হয়।

৯৯. যৌতুক প্রথা এক সামাজিক ব্যাধি।

মূলভাব: যৌতুক সমাজসভ্যতা বিকাশের পথে বিরাট বাধা। এটি সমাজজীবনে ক্ষতিকর প্রভাব ফেলে।

সম্প্রসারিত ভাব: মেয়ের বিয়ের সময় তার অভিভাবক পাত্রকে যে অর্থ, সম্পদ, অলংকার, আসবাবপত্র ইত্যাদি দিয়ে থাকেন তাকে বলা হয় যৌতুক। বিভিন্ন সমাজে বহুদিন ধরে এই নিষ্ঠুর প্রথা ব্যাধির মতো প্রচলিত আছে। আধুনিক যুগ নর–নারীর অধিকারের সমতাবিধানের যুগ। কিন্তু আজও সমাজদেহে যৌতুকের দুস্ট ক্ষত অনেক নারীর স্বপ্নভঙ্গের কারণ। এ নিষ্ঠুর প্রথা যুগ যুগ ধরে মেয়েদের অধিকারকে অস্বীকার করছে, ক্ষুণ্ন করছে তাদের মানবিক মর্যাদাকে। একদিকে যৌতুক দিতে গিয়ে মেয়ের পিতা হন নিঃস্ব, অন্যদিকে মেয়ের জীবনে নেমে আসে লাঞ্ছনার আঘাত। যৌতুকের কারণে দাম্পত্য জীবনের মাধুর্য, পারিবারিক কল্যাণ, সম্পর্কের সৌন্দর্য আর সামাজিক আদর্শবোধ– সবই কলুষিত হয়। পাত্র ও পাত্রপক্ষের মধ্যে যৌতুকের লালসা দেখে কন্যা হারিয়ে ফেলে সম্পর্কের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ। অন্যদিকে যৌতুকের পরিমাণ মনঃপূত না হলে কন্যাকে পাত্রের পরিবার হতে নিগৃহীত হতে হয়। অনেক অক্ষম পিতা পাত্রপক্ষের দাবি মেটাতে না পারলে স্বামী এবং তার পরিবার নববধূর ওপর অকথ্য নির্যাতন চালায়। একসময় নির্যাতনের হাত থেকে রেহাই পেতে বধূ বেছে নেয় আত্মহননের পথ। এ যেন অসভ্য যুগের বর্বরতারই প্রকাশ। অনেক সময় সুন্দর জীবনের স্বপ নিয়ে যে মেয়ে প্রবেশ করে শ্বশুর বাড়িতে, মেহেদির রং না মুছতেই সে ফিরে আসে পিতৃগৃহে। অর্থের মূল্যে মেয়েদের এ মূল্য নির্ধারণ আজকের সভ্যসমাজে এক ঘৃণ্য কুপ্রথা। মুখে নারীর অধিকারের বাণী প্রচারিত হলেও আজও মেয়েদের জীবন দরকষাকষির জাঁতাকলে নিষ্পেষিত, এ লজ্জা গোটা সমাজের। এর হাত থেকে রেহাই পেতে হলে সবাইকে দৃঢ় সংকল্প ও অঙ্গীকারাবদ্ধ হতে হবে।

মন্তব্য: যৌতুক মানবমনের এক বিকৃত প্রকাশ। যার ফলে প্রতিমুহূর্তে নারী হারাচ্ছে মানুষের মর্যাদা। নর ও নারী– এ দু–সত্তা নিয়েই মানবসমাজ। একপক্ষকে অমর্যাদা করে আরেকপক্ষ কখনোই মর্যাদার আসন পেতে পারে না। তাই যৌতুকের মতো কঠোর ব্যাধি থেকে মানবসমাজের মুক্তিলাভ অপরিহার্য।

১০০. রাত যত গভীর হয়, প্রভাত তত নিকটে আসে।

[সি. বো. '১৯]

মূলভাব: সুখ–দুঃখ, ভালো–মন্দ, আলো–অন্ধকার– জগতে সবই পালাক্রমে আসে। এসবের কোনো একটি সবসময় থাকে না। রাতের পরই দিন আর দুঃখের পরই সুখ আসে।

সম্প্রসারিত ভাব: মানুষ পেতে চায় নিরবচ্ছিন্ন সুখ। কিন্তু এই সুখ কখনো পাওয়া যায় না। জীবনে কেউ যেমন একটানা সুখ পায় না তেমনি একটানা দুঃখও ভোগ করতে হয় না। সাফল্য–ব্যর্থতা পালাক্রমে মানুষের জীবনে আসে। সুখ, দুঃখ পালাক্রমে আসে বলেই জীবন উপভোগ্য হয়ে ওঠে। একটানা দুঃখ মানুষের জীবন দুর্বিষহ করে তুলত আর একটানা সুখ করে তুলত একঘেয়েমি বৈচিত্র্যহীন। দুঃখ এলে আমরা ভেঙে পড়ি, হাহাকার করি; আবার যদি সুখের সময় আসে তবে অতিরিক্ত সুখে দিশেহারা হয়ে পড়ি। এটা যে চিরস্থায়ী নয় সেটাই ভুলে যাই। আমরা জীবনের অমোঘ সত্যকে ভুলে গিয়ে দুঃখে ভেঙে পড়ি, সুখে অতিরিক্ত আবেগাপ্লুত হয়ে পড়ি। সুখ বা দুঃখ দুইই কখনো না কখনো শেষ হবে। দুর্যোগের রাত যত গভীর হয় সৌভাগ্যের দিন তত সন্নিকটে আসে। অন্ধকার সময়কে আটকে রাখতে পারে না, আলোর গতিপথ রুখতে পারে না। আলোর আসার সময় হলে আলো আসবেই। হযরত মুহম্মদ (সা.) যখন মানবতার বাণী ঘোষণা করেন তখন তাঁর পক্ষে কেউ ছিল না। তিনি সম্পূর্ণ একা ছিলেন। অসীম দুঃখ–কষ্ট–যন্ত্রণা সহ্য করেছেন তিনি। কিন্তু ধৈর্য থেকে বিচ্যুত হননি। তাঁর কাছে সাফল্য ধরা দিয়েছে। তিনি মক্কা বিজয় করতে পেরেছিলেন। দুঃখ নামক বিরক্তিকর ও কষ্টকর সময় পার করেই সুখ নামক সোনার হরিণ লাভ সম্ভব। পৃথিবীতে যাঁরা নিজ কর্মগুণে সফল তাঁরা কেউ সহজে সেই সফলতা লাভ করেননি। অনেক দুঃখ অতিক্রম করে অর্জন করেছেন সফলতা। দুঃখ–দুর্দশাকে মোকাবিলা করতে পারলেই আড়াল থেকে উদ্ভাসিত হবে জ্যোতির্ময় দিন। তাই দুঃখ দেখে বিচলিত হয়ে না পড়ে সেটাকে সাহসের সাথে মোকাবিলা করতে হবে। তবেই জীবন সুখময় হয়ে উঠবে।

মন্তব্য : কেউই নিরন্তর দুঃখী কিংবা সুখী নয়। সুখ ও দুঃখ মানবজীবনে পালাক্রমে আসে। দুঃখ যত বাড়তে থাকে সুখ তত কাছে আসে। তাই ধৈর্যহারা না হয়ে মনে রাখতে হবে, দুঃখের পরে সুখ আসবেই।

১০১. রাত্রে যদি সূর্যশোকে ঝরে অশ্রুধারা
সূর্য নাহি ফেরে শুধু ব্যর্থ হয় তারা।

[কু. বো. '১৯; চ. বো. '০০]

মূলভাব: সময় ও স্রোত কারও জন্য অপেক্ষা করে না। যে সময় চলে যায় তা কখনো ফিরে আসে না। তাই পচা, বাসি অতীতের জন্য আক্ষেপ না করে, সুন্দর, শুভ্র বর্তমানকে বেশি গুরুত্ব দিয়ে সার্থকতা লাভের চেষ্টা করাই উত্তম।

সম্প্রসারিত ভাব: অতীতের সুখ–স্বাচ্ছন্দ্যের কথা স্মরণ করে হাহাকার করে বর্তমানকে ব্যর্থ করা উচিত নয়। তাতে অতীতের সুখ তো ফিরে আসেই না; বরং সংসারের কালস্রোতে মানুষের জীবন–যৌবন, ধন–মান সবই ভেসে যায়। সূর্য অপরিসীম শক্তির আধার। যা নিরন্তরভাবে দিনের বেলায় পৃথিবীকে আলো দিয়ে আসছে। দিনশেষে সূর্য অস্ত যায় এবং পৃথিবীতে আঁধার নেমে আসে। সেই আঁধার পৃথিবীর প্রতিটি বস্তুকে আচ্ছন্ন করে তোলে। রাতে আবির্ভাব ঘটে তারার। সৌরজগতে গ্রহ–নক্ষত্র যে স্থানে অবস্থান করছে, নির্দিষ্ট সময় পর সেটা আবার ফিরে আসবে। কিন্তু মানুষের জীবন থেকে এইমাত্র যে সময়টা চলে গেল সেটা ফিরে আসবে না কোনোদিন। অতীতের দিনগুলো যতই মধুর, সুখের বা আনন্দঘন হোক না কেন সেটা ভেবে সুন্দর বর্তমান নষ্ট করা উচিত নয়। তার জন্য হাহুতাশ, বিলাপ করেও লাভ নেই। তাতে বর্তমান মূল্যহীন ও ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত হয়ে পড়ে। অতীতের হারানো স্মৃতি যতই মধুর হোক না কেন বর্তমানই বেশি মূল্যবান। কেননা অগণিত নক্ষত্ররাজি রাতের আকাশে আলো–আঁধারের সংমিশ্রণে এক মোহময় পরিবেশ সৃষ্টি করে। শুক্লপক্ষের শুভ্র জ্যোৎস্না–পুলকিত রাত মিষ্টি আলোর বন্যায় মানুষের মনের কালিমা মুছে দেয়। মানুষ উদ্ভাসিত মনে রাতের এই আলো–আঁধারি রূপ হৃদয় মন ভরে উপভোগ করে। এই সুন্দর সময়ে কেউ যদি সূর্যশোকে বিরল ও বিমর্ষ হয়ে পড়ে, তবে সূর্যতো ফিরে পায়ই না; বরং রাতের অনুপম সৌন্দর্য, রাতের আকাশের নক্ষত্ররাজি এবং আলোকছায়ার খেলার মাধুর্য থেকে নিজেকে বঞ্চিত করে। তখন একূল–ওকূল দুই কূলই হারায়। অনুরূপভাবে, স্বর্গীয় গুণাবলি নিয়ে পৃথিবীতে আবির্ভাব ঘটে কিছু ক্ষণজন্মা মহাপুরুষের। মানবজাতির দিশারি এসব মহাপুরুষরা সভ্যতাকে জাগ্রত করে এবং আলোর পথ দেখান। তাঁদের স্পর্শেই জীবজগৎ মহিমান্বিত হয়ে উঠে। কিন্তু প্রকৃতির স্রোতে তাঁরাও হারিয়ে যায়। এইসব মহাপুরুষদের প্রাণবিয়োগে সীমাহীন পৃথিবীতে গভীর শোক নেমে আসে এবং মানবসন্তান হাহাকার করে ওঠে। কিন্তু তাঁদের প্রস্থানের পর পৃথিবীতে হাজারো মানুষ থাকে যাদের মধ্যে রয়েছে ওই সব মহাপুরুষদের অনুকরণীয় আদর্শ। যারা সাধারণ মানুষ

তাদের কাছে মহাপুরুষদের চারিত্রিক সুষমা না থাকলেও মানবতার আলো রয়েছে। সূর্য অস্ত গেলেও পৃথিবীতে থাকে মানুষ ও মানবতার আলো।

মন্তব্য: রাতের আলাদা সৌন্দর্য রয়েছে। আমাদের সামর্থ্য ও প্রস্তুতি থাকতে হবে সেটুকু ভোগ করার। দিনের আলো হারানোর ব্যথায় কাতর হয়ে রাতের সৌন্দর্য নষ্ট করার কোনো প্রয়োজন নেই। এতে কষ্ট বাড়বে। সেইভাবে হারানো অতীতের জন্য আফসোস না করে সমৃদ্ধিশালী ভবিষ্যৎ ও বর্তমানের দিকে নজর দেওয়া উচিত। তাই সময়ের সমূহ প্রবাহ মেনে নেওয়াই বুদ্ধিমানের কাজ।

১০২. লাইব্রেরি জাতির সভ্যতা ও উন্নতির মানদন্ড।

মূলভাব: লাইব্রেরি হচ্ছে জ্ঞানের আধার। একটি জাতির রুচির পরিশুদ্ধ, জ্ঞানের গভীরতা ও সভ্যতার অগ্রগমন সম্পর্কে সম্যক ধারণা পাওয়া যায় ওই জাতির লাইব্রেরির মাধ্যমে।

সম্প্রসারিত ভাব: একটি জাতি বা দেশের সাহিত্য, জ্ঞান–বিজ্ঞান, খেলাধুলা–বিনোদন, সভ্যতা–সংস্কৃতির পরিচয়কে ধারণ করে সেই জাতির সযত্নে তৈরি লাইব্রেরি। কখনো কখনো মানুষের মুখ যেমন ব্যক্তির অন্তর্গত রূপ বা পরিস্থিতিকে নির্দেশ করে, তেমনি লাইব্রেরি জাতির উন্নতি ও অগ্রগতিকে চিহ্নিত করে। লাইব্রেরি জাতির অতীত ও বর্তমানকে এক সুতায় বেঁধে রাখে এবং ভবিষ্যতের দিকনির্দেশনা দেয়। জ্ঞানান্বেষী ও সত্যসন্ধানী মানুষ লাইব্রেরিতে এসে নিজেকে সমৃদ্ধ করে এবং জাতির সভ্যতার ক্রমোন্নতিতে ভূমিকা রাখে। একটি লাইব্রেরিতে সংরক্ষিত সাহিত্যগ্রন্থ দেখে সংশ্লিষ্ট জাতির সাহিত্যরুচি উপলব্ধি করা যায়, বিজ্ঞানগ্রন্থ দেখে জাতির বিজ্ঞান–চিন্তা ও ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা অনুভব করা যায়। তাই গ্রন্থাগার হচ্ছে কালের সাক্ষী। জ্ঞান–বিজ্ঞানসংক্রান্ত যেকোনো প্রয়োজনে লাইব্রেরি পরম বন্ধু এবং অনন্ত উৎস। পৃথিবীতে যত বড়ো বড়ো আবিষ্কার হয়েছে, সেগুলোর প্রতিটির পেছনে রয়েছে লাইব্রেরির গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা। তাই অনেক বড়ো বড়ো যুদ্ধের পরে দেখা গেছে বিজয়ী শক্তি পরাজিত জাতির লাইব্রেরিকে ধ্বংস করে দিয়েছে। একটি বৃহৎ লাইব্রেরি জাতির সব ধরনের তথ্যই শুধু সংরক্ষণ করে না, দেশের সঠিক উন্নতিতেও প্রভাবকের ভূমিকা পালন করে। লাইব্রেরি মানুষের আনন্দেরও খোরাক জোগায় এবং মানুষের মনকে প্রশান্ত করে। পুস্তক পাঠ মানুষের একটি সৃষ্টিশীল ও মননশীল শখ। আর এই শখ পূরণের জন্য লাইব্রেরির প্রয়োজনীয়তা অবশ্যম্ভাবী।

মন্তব্য: যে জাতি যত উন্নত, সেই দেশের লাইব্রেরি তত সমৃদ্ধ।

১০৩. লোভে পাপ, পাপে মৃত্যু।

মূলভাব: লোভ মানুষকে হিতাহিত জ্ঞানশূন্য করে দেয়। অসৎ উপায় অবলম্বন করতে প্ররোচিত করে। লোভী মানুষ তাই পাপকার্য করতে দ্বিধাবোধ করে না। লোভের পরিমাণ অতি ভয়াবহ, এমনকি মৃত্যুও বৈচিত্র্যময়।

সম্প্রসারিত ভাব: লোভ মানবচরিত্রের এক অন্ধকার দিক। লোভ থেকেই জাগতিক যাবতীয় পাপের উৎপত্তি। লোভের মায়ামোহে আচ্ছন্ন থেকে মানুষ সত্য ও সুন্দরকে অবজ্ঞা করে। সে বৈষয়িক বুদ্ধির প্রেরণায় পার্থিব ধন–সম্পদ আহরণে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। কিন্তু যখনই সে তার লক্ষ্য অর্জনে ব্যর্থ হয়, তখন নির্দ্বিধায় নিমজ্জিত হয় পাপাচারে। সে ক্রমশ অবৈধ ও জঘন্য পথে অগ্রসর হয়। তাই লোভী মানুষ এসময় হয়ে ওঠে পশুর মতো। সত্যের জয় আর অসত্যের বিনাশ অনিবার্য। লোভী মানুষ নিজের সেই পরিণতির কথা ভুলে যায়। আর এভাবেই লোভ মানুষকে ধ্বংসের পথে টেনে নেয়। অপরপক্ষে নির্লোভ ব্যক্তি পাপমুক্ত, সত্য ও সুন্দর জীবন লাভ করে। তার জীবনে ভোগের তাড়না নেই। ফলে তার মাঝে লোভ এবং পাপের অস্তিত্বও নেই। লোভী ব্যক্তিরাই পথভ্রষ্ট হয়। অন্যায়, অসত্য আর পাপের পথে ধাবিত হয়ে অকালমৃত্যুর মুখোমুখি হয়।

মন্তব্য: লোভ বর্জন না করলে জীবনকে সার্থক ও সুন্দর করা যায় না। নির্লোভ মানুষ সকলের শ্রদ্ধা ও ভক্তি অর্জন করে।

১০৪. শিক্ষাই জাতির মেরুদণ্ড। *[ঢা. বো. '০১; য. বো., ব. বো.'০৩]*

মূলভাব: মানব–শরীরের অপরিহার্য অঙ্গ যেমন মেরুদন্ড তেমনি জাতির উন্নতির পূর্বশর্ত হচ্ছে শিক্ষা।

সম্প্রসারিত ভাব: মানবদেহের অঙ্গ–প্রত্যঙ্গের মধ্যে মেরুদণ্ডের অপরিহার্যতা অনস্বীকার্য। মেরুদণ্ডহীন মানুষের কথা কল্পনাও করা যায় না। মেরুদণ্ডহীন মানুষ চলতে পারে না, দাঁড়াতে পারে না, বসতে পারে না। তাদের জীবন অর্থহীন। পরমুখাপেক্ষী হয়ে জীবন কাটানো ছাড়া তাদের উপায় থাকে না। তারা জাতি তথা দেশের কোনো কাজেই আসে না। তারা পঙ্গু হয়ে অপরের গলগ্রহ হয়ে জীবন কাটায়। জীবনযুদ্ধে তারা পরাজিত। মানুষের জীবনে শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম। সাম্প্রতিক বিশ্ব মানুষের শক্তি

ও কর্মের প্রভাবে প্রভাবিত। এ শক্তি মানুষ শিক্ষার সাহায্যে লাভ করেছে। মানুষ বিবেকবান জীব, পশুপাখি অপেক্ষা সে উন্নততর। এ শিক্ষা ও জ্ঞানের সাহায্যে সে অন্য প্রাণীর ওপর প্রভুত্ব করতে পারছে। শিক্ষা ও জ্ঞান–বিজ্ঞানের সাধনা করে সব জাতি বড়ো হচ্ছে। শিক্ষা–দীক্ষাহীন জাতি পদে পদে পঙ্গুত্বপ্রাপ্ত হয়। শিক্ষার জন্য মানুষ গ্রন্থাগার নির্মাণ করছে। শিক্ষাকে সহজ করার জন্য ইউরোপ আমেরিকার বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে নানা উপায় উদ্ভাবিত হচ্ছে। এ শিক্ষাকে মানুষের মেরুদণ্ডের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। মেরুদণ্ডহীন মানুষ যেমন সমাজ–সংসারে অসার ও পঙ্গু, তেমনি শিক্ষাহীন জাতি কুসংস্কার, জড়তা ও হীনতাযুক্ত হয়ে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। কোনো জাতির উন্নতি ও সফলতার চাবিকাঠি নির্ভর করে তার শিক্ষার ওপর। বর্তমান বিশ্বে যে জাতি যত বেশি শিক্ষিত হয়েছে সে জাতি পৃথিবীকে তত প্রভাবিত করতে পেরেছে।

মন্তব্য: কোনো জাতিকে জাতি হিসেবে আত্মমর্যাদার সাথে টিকে থাকতে হলে প্রয়োজন শিক্ষার। শিক্ষা ছাড়া কোনো জাতির সাফল্য কামনা করা দুরাশার শামিল। তাই জাতিকে বিশ্বসভ্যতায় মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে হলে শিক্ষা ছাড়া অন্য কোনো পথ নেই।

১০৫. শুধাল পথিক সাগর হতে .... তুষ্ট হৃদয় তারো চেয়ে গরীয়ান।

মূলভাব: পার্থিব জীবনে আত্মতুষ্ট হৃদয়ের অধিকারী ব্যক্তি অধিকতর সম্মান লাভ করেন। ধনী লোকের জীবন অপেক্ষা তার জীবন অধিক মূল্যবান। আত্মতৃপ্তির দ্বারা সুখ, আনন্দ এবং পরম প্রশান্তি লাভ করা গেলেও অর্থ বা বিত্তের দ্বারা তা সম্ভব নয়।

সম্প্রসারিত ভাব: মানবজীবনে সম্পদ সীমাবদ্ধ, কিন্তু চাহিদা অসীম। ফলে মানুষের চিরন্তন পাওয়ার আশা তথা অন্তহীন চাহিদার কারণে চাওয়া–পাওয়ার দ্বন্দ্বে সে দিনরাত অসন্তোষে ভোগে। অসীম চাহিদা মানুষকে তাড়া করে ফেরে। তাই সে যত পায় তত চায়। সুখের সান্নিধ্য লাভের জন্য তাঁর ব্যাকুলতার অন্ত নেই। বিপুল অর্থসম্পত্তির অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও মানুষ অতৃপ্তি ও অসন্তোষের বেদনা নিয়ে দিনযাপন করে। তাঁর যা আছে তা নিয়ে সে তৃপ্ত নয়। অন্তহীন সুখসমৃদ্ধির আকাঙ্ক্ষাই মানুষকে ধ্বংসের দিকে ধাবিত করে। মনঃতুস্টি না থাকলে বিপুল ঐশ্বর্যের মাঝে থেকেও মানুষ দীনতায় ক্রন্দন করে। তিনিই প্রকৃত ধনী যিনি গরিব হয়েও নিজের বর্তমান অবস্থা নিয়ে সুখী। সাধারণের মতে, পৃথিবীতে যাদের মণি–মুক্তা, হীরা–পান্না প্রভৃতি রত্নরাজি আছে তারাই ধনবান। অন্যভাবে বলা চলে, যারা প্রাচুর্যের মাঝে ডুবে থাকেন তারাই ধনী। সে হিসেবে সাগর মহাসাগরই সর্বাপেক্ষা ধনবান। কারণ অসীম মহাসমুদ্রের তলদেশে রয়েছে বিপুল রত্নরাজি। তাই সাগরের ঐশ্বর্যের কাছে কোনো পার্থিব লোকের সঞ্চিত সম্পদ নিতান্তই তুচ্ছ। অতএব কেবল ধনসম্পদই মানুষের জীবনের একান্ত কাম্য নয়। বিপুল রত্নরাজি মানুষকে শান্তি ও স্বস্তি কোনোটাই দিতে পারে না। তাই জ্ঞানী লোক তাঁরা, যাঁরা তাদের যা আছে তা নিয়েই সন্তুষ্ট ও পরিতৃপ্ত থাকেন। ফলে জ্ঞানী ও মহতের জীবনের অতৃপ্তির বেদনা কখনোই বাসা বাঁধতে পারে না। মানুষের জীবন পদ্মপাতার নীরের মতো। অস্থায়ী পৃথিবীতে সে স্বল্প সময়ের জন্য আসে। আর এই সময়টুকু শান্তিতে কাটাতে পারলেই তার জীবন সফল হতে পারে। আমাদের যা কিছু আছে তা নিয়ে আমরা খুশি থাকলে জীবনে শান্তি আসতে পারে। অনেক কিছু থেকেও না থাকার দুঃখ এবং অনেক পেয়েও না পাওয়ার যন্ত্রণা মানবজীবনকে দুর্বিষহ করে তোলে। তাই সম্পদশালীর জীবন অপেক্ষা তুষ্ট হৃদয়ের অধিকারী ব্যক্তির জীবন অধিক তাৎপর্যময় ও গৌরবান্বিত। ইংরেজিতে একটি প্রবাদ আছে- "Contentment is the roof of all happiness."

মন্তব্য: অতৃপ্ত মনের অধিকারীর কাছে ধনসম্পদের চাহিদা অতিসামান্য। সমুদ্রের সীমাহীন সম্পদও তাকে আকৃষ্ট করতে পারে না। তাই যে ধনসম্পদের প্রাচুর্য শান্তি বয়ে আনতে পারে না, পার্থিব জীবনে তার কোনো মূল্য নেই।

১০৬. শুনহ মানুষ ভাই
সবার উপরে মানুষ সত্য তাহার উপরে নাই।

[রা. বো. '০৯; ব. বো. '১৪; সি. বো. '১৪]

মূলভাব: মানুষ সৃষ্টির সেরা জীব। পার্থিব–অপার্থিব, মতবাদ–সংস্কার, কেতাব–গ্রন্থ, কোনো কিছুই মানুষের চেয়ে মর্যাদাকর নয়। মানুষের স্থান সবার ওপরে।

সম্প্রসারিত ভাব: মানুষের মর্যাদা সকল কিছুর ওপরে বলে বিবেচনা করা দরকার। কোনো ধর্মনীতি, কোনো সংস্কার জীবনের চেয়ে বড়ো হতে পারে না। কেননা এ জগতে যা কিছু রয়েছে, সবই মানুষের কল্যাণের জন্য নিয়োজিত। সকল কিছুর আয়োজন মানুষের উপকারের লক্ষ্যে। তাই মানুষকে সবার ওপরে স্থান দিয়ে তার মর্যাদা স্বীকার করতে হয়। মানুষকে সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ জীব হিসেবে বিবেচনা করে তার গুরুত্ব অনুধাবন করা দরকার। প্রাণিকুলের মধ্যে মানুষের স্থান সবার ওপরে। ধর্মীয় গোঁড়ামি কিংবা

সাম্প্রদায়িকতার বিষবাষ্প দ্বারা আক্রান্ত হয়ে কোনো মানুষকে খাটো করে দেখার কোনো যৌক্তিকতা নেই। সবার ওপরে তার পরিচয় হলো সে মানুষ। জগতের সর্বত্র বিভিন্ন নীতি, আদর্শ আর বিধিনিষেধের বেড়াজালে মানবজীবন জড়িয়ে আছে। মানুষ সভ্যতার জনক। কোনো এক সময় মানুষ ছিল প্রকৃতির দাস। আর আজ সেই মানুষ নিয়ন্ত্রণ করছে প্রকৃতিকে। প্রকৃতির মায়ায় জড়িয়ে মানুষ তৈরি করছে নতুন ইতিহাস। জ্ঞান, বিদ্যাবুদ্ধি, বিবেক, মেধা ও প্রজ্ঞার অপূর্ব সমন্বয় ঘটিয়ে মানুষ আজ জয় করেছে পৃথিবীকে। উন্নত বিশ্ব আর তৃতীয় বিশ্বের মধ্যে পার্থক্য অনেক। শক্তিশালী জাতি শক্তিহীন জাতিকে গ্রাস করতে চায়। মানুষের আছে অপূর্ব উদ্ভাবনী ক্ষমতা ও অপরিসীম ইচ্ছাশক্তি। আর সেই অপরিসীম ইচ্ছাশক্তিকে কাজে লাগিয়ে মানুষ আজ জল–স্থল–অন্তরিক্ষে উড়িয়েছে তার বিজয় পতাকা। মানুষের শক্তি, জ্ঞান, কাজের সীমা অফুরন্ত। এই যে অত্যাধুনিক সভ্যতা। জগতের প্রত্যেকটি নতুন ও পুরাতন সৃষ্টির মূলে রয়েছে অদম্য স্পৃহা ও জাগরণী শক্তি। বিজ্ঞানের এই যে নব নব আবিষ্কার তা মানুষেরই আবিষ্কার। মানুষ অসম্ভব দূরকে করেছে নিকট। মানুষ মহাশূন্যের রহস্য উদ্‌ঘাটনের জন্য সদা ব্যাপৃত। সহজ থেকে আরও সহজতর জীবনপ্রণালি খুঁজে নেওয়ার জন্য সে সদা তৎপর। কিন্তু দুর্ভাগ্য হলেও সত্য যে, মানুষ নিজেকে জাহির করার জন্য যতটা তৎপর, পরকে আপন করার জন্য ততটা তৎপর নয়। জাতিতে জাতিতে ভেদাভেদ মানুষের আজ নিত্যসঙ্গী। ধর্মকে মানুষ আজ বড়ো করে দেখার চেষ্টা করছে। তাদের দাবি মানুষ ধর্ম দ্বারা প্রভাব বিস্তার করতে পারলেই আদর্শ জাতি বা ধর্ম হিসেবে পরিচিতি লাভ করবে। আসলে একথা সত্য নয়। ধর্মীয় গোঁড়ামি আর নগ্ন সাম্প্রদায়িকতার বেড়াজালে আজ পৃথিবীর মানুষ বহু ধারায় বিভক্ত। এক ধর্মের মানুষ অন্য ধর্মকে খাটো করে দেখার এবং ধ্বংস করে দেওয়ার চেষ্টায় সারাক্ষণ ব্যস্ত। ধর্ম–বর্ণ–জাতি–সম্প্রদায় এক মানুষকে আড়াল করে রাখছে আরেক মানুষের কাছে। মানবিকতা ও মানবতার আদর্শ আজ ধুলোয় লুণ্ঠিত। মানুষের গড়া সভ্যতা ব্যঙ্গ করছে আজ মানুষকে। পৃথিবীর দৈনন্দিন ইতিহাস পর্যালোচনা করলে আমরা দেখতে পাই শক্তিশালী জাতি দুর্বল জাতিকে কোণঠাসা করে রেখেছে। তাদের মধ্যে নেই মনুষ্যত্বের বিকাশ, নেই সৌভ্রাতৃত্বের সেতুবন্ধন, নেই ধর্মের ঐক্য।

মন্তব্য: মানুষের উচিত সকল বিভেদ ভুলে যাওয়া এবং এ পৃথিবীকে সকলের জন্য এক ও অভিন্ন পৃথিবী হিসেবে গড়ে তোলা। আর সবার ওপরে মানুষের মনুষ্যত্বকে মূল্যায়ন করা।

১০৭. শৈবাল দিঘিরে বলে উচ্চ করে শির,
লিখে রেখো এক ফোঁটা দিলেম শিশির।

মূলভাব: দানশীল মহাপ্রাণ যাঁরা, পরোপকারের হিসেব রাখা তাঁদের ধর্ম নয়। সবার কল্যাণে নিজের নীরব ত্যাগটুকুকে তাঁরা সামাজিক ব্রত হিসেবে গণ্য করেন এবং পরের স্বার্থে নিজেকে সমর্পণ করাকেই জীবনের সার্থকতা বলে গণ্য করেন। যারা অকৃতজ্ঞ লোক, তারা কখনোই পরের উপকারের কথা স্বীকার করে না। পক্ষান্তরে নিজে সামান্য উপকার করে থাকলে তা–ই সাড়ম্বরে প্রচার করে বেড়ায়।

সম্প্রসারিত ভাব: দিঘির জলরাশি থেকেই শৈবালের জন্ম। সেই শৈবালে রাতে অতি ক্ষুদ্র শিশিরবিন্দু পরে। শিশিরের ফোঁটা গড়িয়ে পড়ে দিঘির জলে। তার পরিমাণ এত সামান্য যে, তা দিয়ে দিঘির বিন্দুমাত্র জলবৃদ্ধি হয় না। এই পৃথিবীতে যারা মহানুভব, সদাশয় ব্যক্তি, তাঁদের নীরব দানে পৃথিবীর নিঃস্ব এবং অভাবগ্রস্তরা নিত্য উপকৃত হয়, জীবন পায়। সেই মহানুভব, সদাশয় ব্যক্তিরা সমাজের প্রাণ। আর সেসব সর্বত্যাগী মানুষ তাদের জীবন তিলে তিলে সাধ্যমতো দান করে বিপন্নকে উদ্ধার করেন । কিন্তু তাঁদের সেই দান নীরব দান। সে দানে থাকে না কোনো অহংকার, থাকে না বিনিময়ে উপকার লাভের প্রত্যাশা। কিন্তু মানবচরিত্র বড়োই বিচিত্র। সেই মহান, উদার ও হৃদয়বান ব্যক্তিদের নীরব দানের বিনিময়ে সামান্য উপকার করে কোনো কোনো ক্ষুদ্রচেতা ব্যক্তি অসামান্য অহংকারে হয়ে ওঠে স্ফীত। তাদের ঢাকের চোটে গগন ফাটে। কিন্তু এ আত্মপ্রচার ও আত্মঘোষণার হাস্যকর নিষ্ফলতা বিশ্বের সমক্ষে প্রকটিত হতে বিলম্ব লাগে না। যাঁরা বিশ্বমানবের জীবনধারণের প্রাণরস নিত্য যোগান, যাঁরা তিল তিল করে নীরবে নিজেদের দান করে পৃথিবীর আর্ত, আতুর ও বিপন্নদের রক্ষা করেন; তাঁদের সামান্যতম উপকার যে বিশাল সমুদ্রে জলবিন্দু অকিঞ্চিৎকর, তা সেই ক্ষুদ্রমনা নিচাশয় ব্যক্তিরা কোনোদিনই উপলব্ধি করতে পারে না। বাস্তবজীবনে ও বিচিত্র মানবজগতে এর প্রতিফলন দেখা যায়। পৃথিবীতে মহৎলোক মাত্রই অজস্র নীরবদানে আমৃত্যু ব্রতী হন। কিন্তু হীনম্মন্য ব্যক্তিরা অন্যের দান কেবল অস্বীকার করে না; কাউকে বিন্দুমাত্র উপকার করলে তাও সদম্ভে শতমুখে প্রচারে ব্যস্ত হয়ে ওঠে।

SINCE-1959 NABARUN PUBLICATION

মন্তব্য: অকৃতজ্ঞ ও ক্ষুদ্রমনা লোকের সদম্ভ আত্মপ্রচার তাকে অন্যের কাছে কেবল পরিহাস্য করে তোলে না বরং তার ক্ষুদ্রদানের সামান্য মহিমাটুকুও ম্লান হয়ে যায়। অকৃতজ্ঞলোকের বৈশিষ্ট্যই হলো অন্যের উপকারকে অস্বীকার করে নিজের সামান্য দানের প্রচার করা। উপকারীর উপকার স্বীকার করার মধ্যেই উন্নত মানসিকতার প্রকাশ ঘটে।

১০৮. সংসার সাগরে দুঃখ তরঙ্গের খেলা,
আশা তার একমাত্র ভেলা। *[রা. বো. '০৪; ব. বো. '১২, '০৫; কু. বো. '১৪]*

মূলভাব: মানুষের জীবনে প্রতিনিয়ত দুঃখ–দৈন্যে আবর্তিত হচ্ছে। এর মাঝে আশাই তাকে টিকিয়ে রেখেছে।

সম্প্রসারিত ভাব: আশা না থাকলে মানুষের জীবন হতো স্থবির। মানুষ সুখ নামক পাখিটাকে ধরতে চায়। কিন্তু এ পৃথিবী দুঃখময়, অর্থাৎ দুঃখে পরিপূর্ণ। সর্বকালব্যাপী মানুষ কখনই সুখী হতে পারে না। বিক্ষুব্ধ তরঙ্গমালা যেমন সমুদ্রে রয়েছে, তেমনি পৃথিবী দুঃখের তরঙ্গমালায় বিপদগ্রস্ত হয়ে ওঠে। তখন মানুষ হতাশায় নিমজ্জিত হয়। বিপৎসংকুল জীবনের ঝুঁকি নিয়ে সমুদ্র পাড়ি দিতে যেমন নৌযান বা জাহাজ দরকার, তেমনি দুঃখময় পৃথিবীতে আশার আলোতেই সুখের পথ দেখতে হয়। অর্থাৎ 'পাবো কি পাবো না' না ভেবে, আশা তাকে বাঁচিয়ে রেখে নতুন জীবনের প্রত্যয়দীপ্ত আলোকের সন্ধান দিয়ে থাকে। আর আশা–আকাঙ্ক্ষা মানবজীবনে কখনো শেষ হয় না। বস্তুত আশারূপী ভেলা না থাকলে আমাদের পক্ষে সমাজজীবন অতিবাহিত করা কোনোভাবেই সম্ভবপর হতো না।

মন্তব্য: সংসার জীবনে সুখের চেয়ে দুঃখের পরিমাণই বেশি। তবুও সোনালি দিনের আশা নিয়ে মানুষ এ দুঃখময় সংসারে বেঁচে থাকে।

১০৯. সকলের তরে সকলে আমরা
প্রত্যেকে আমরা পরের তরে।

মূলভাব: পরার্থপরতা মানুষের একটি মানবিক গুণ। এ ধরনের গুণাবলিই মনুষ্যত্বের পরিচায়ক। পারস্পরিক সহযোগিতার মাধ্যমেই মানুষ সৃষ্টি করেছে আজকের এই সমাজ। রক্ষা করেছে একে অপরকে।

সম্প্রসারিত ভাব: অন্যের সাহায্য ছাড়া মানুষ একা চলতে পারে না। জীবনের সব গুরুত্বপূর্ণ কাজ, সব সমাধান মানুষ অন্যের সাহায্য নিয়ে করে। মানবতার দুইটি দিক থাকে– সংকীর্ণ দিক আর বৃহৎ দিক। স্বার্থপর ছোটো মনের মানুষেরা কেবল নিজের জীবন নিয়ে থাকে, নিজের দিক দেখে। অন্যদিকে মহৎ মনের মানুষ পরের জন্য জীবন উৎসর্গ করেন। তাঁদের মতো মানুষের সংগ্রামেই রচিত হয়েছে আজকের সভ্যতা। ইতিহাসে সোনার অক্ষরে লেখা আছে সেই সব মহান মানুষের নাম যাঁরা জনকল্যাণে নিজেদের উৎসর্গ করেছেন। মানুষ সুখ চায়, মানুষ সুখের সন্ধানী। কিন্তু প্রকৃত সুখ পরোপকারে, নিজের জন্য সবসময় চিন্তা না করে পরের জন্য জীবন উৎসর্গ করলেই প্রকৃত সুখী হওয়া যায়। রাষ্ট্রপ্রধান হিসেবে আমরা হযরত মুহম্মদ (সা.), রাম, অশোক, পাল রাজা গোপাল, খলিফা ওমর–এর নাম শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করতে পারি। যারা ভোগী ছিলেন না, ছিলেন ত্যাগী এবং প্রজাপালক। তাই ব্যক্তিগত স্বার্থ উপেক্ষা করে সমষ্টিগত স্বার্থের জন্য নিজের জীবন উৎসর্গ করতে হবে। মানবস্বার্থকে বড়ো করে দেখাই হচ্ছে প্রকৃত সার্থকতা। সৃষ্টির জন্মলগ্ন থেকে মানুষ শুধু নিজেকে নিয়ে ব্যস্ত থাকলে আজকের এই সভ্যতা কোনোদিনই গড়ে উঠত না। তাই ভ্রাতৃত্বভাব স্থাপন করতে হবে। মানুষের সেবায় নিজেকে নিয়োজিত করতে হবে।

মন্তব্য : সুতরাং সমষ্টিগত স্বার্থকে বড়ো করে দেখলে সমাজের মঙ্গল নিশ্চিত হবে এবং জগৎ হয়ে উঠবে আনন্দময়। পরহিতে নিজেকে বিলিয়ে দেওয়ার মধ্যেই প্রকৃত সুখ যার মধ্যে দিয়ে দিব্য আনন্দ ও পরম তৃপ্তির অধিকারী হয় মানুষ।

১১০. সঙ্গদোষে লোহা ভাসে।

মূলভাব: মানুষকে জীবনের নানা প্রয়োজনে বিভিন্ন ধরনের মানুষের সংস্পর্শে আসতে হয়। তার মধ্য থেকে উত্তম সঙ্গী বেছে নেওয়া অত্যন্ত আবশ্যক। কেননা উত্তম সঙ্গ যেমন জীবনকে মধুময় করতে পারে, তেমনি অসৎ সঙ্গে সর্বনাশ হতে পারে।

সম্প্রসারিত ভাব: জগতের প্রত্যেকেই স্বাধীন সত্তার অধিকারী। চিন্তা–চেতনা ও কর্মে প্রত্যেক মানুষ আলাদা। মানুষ নিজেই তার বিবেককে নিয়ন্ত্রণ করে। কিন্তু তবুও সঙ্গের প্রভাব বিশেষভাবে লক্ষণীয়। কেননা মানুষ তার চারপাশের পরিবেশ এবং সঙ্গ দ্বারা প্রভাবিত হয়। এক্ষেত্রে তাই উপযুক্ত সঙ্গী নির্বাচন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তাই যে ব্যক্তি উন্নত ও সৎ চরিত্রের অধিকারী হতে চায়,

তাকে অবশ্যই সৎ ও উন্নত মানসিকতার ব্যক্তির সঙ্গে মিশতে হবে। যেসব বস্তু সুন্দর ও রমণীয়, সেসব বস্তুর সংস্পর্শে যেসব বস্তু থাকে, সেগুলোও সুন্দর ও আকর্ষণীয় হয়ে ওঠে। সৎ স্বভাবের লোকদের সঙ্গে মেলামেশায় খারাপ মানসিকতার অধিকারী ব্যক্তিও তেমনি উন্নত মানসিকতার অধিকারী হতে পারে। অন্যদিকে অসাধু ব্যক্তির সঙ্গে মেলামেশার ফলে সৎ ব্যক্তিও অসৎকর্মে লিপ্ত হতে পারে। প্রকৃতপক্ষে সঙ্গ মানুষকে গভীরভাবে প্রভাবিত করে।

মন্তব্য: সেজন্য সৎ ও যোগ্য সঙ্গী নির্বাচন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সঙ্গের কারণে মানুষের চরিত্রের নানামুখী পরিবর্তন সাধিত হয়। তাই উত্তম সঙ্গলাভের বিষয়ে সচেতন হওয়া অত্যন্ত জরুরি।

১১১. সৎসঙ্গে স্বর্গবাস, অসৎসঙ্গে সর্বনাশ।

মূলভাব: মানুষের আচার–আচরণ, পারিপার্শ্বিক অবস্থাও মানুষের দ্বারা প্রভাবিত হয়। মানুষের জীবনে তার সঙ্গীর প্রভাব সবচেয়ে বেশি।

সম্প্রসারিত ভাব: জীবনের শুরু থেকেই আমরা বন্ধু–বান্ধব পেয়ে থাকি আর বন্ধু যদি সৎ হয় তবে আমাদের চরিত্রের ওপর একটি সুন্দর প্রভাব পড়ে। অপর দিকে অসৎ বন্ধু আমাদের চরিত্রকে কলুষিত করতে পারে। অসৎ লোকের সাথে মিশলে জীবনে ক্ষতির সম্ভাবনাই বেশি। মানুষ একা বাস করতে পারে না। তার সঙ্গী এবং বন্ধু দরকার। কিন্তু বন্ধু নির্বাচনে তাকে খুব সতর্ক হওয়া উচিত। একজন ভালো ব্যক্তি ভালো বন্ধু বা সঙ্গী রাখে এবং একজন খারাপ লোক খারাপ বন্ধু বা সঙ্গী রাখে। খারাপ বন্ধুর সাথে চললে চরিত্র কলুষিত হয় এবং ধার্মিক বন্ধুর মাধ্যমে তা আলোকিত হয়। সৎসঙ্গ মানুষকে চরিত্রবান করে। মানবজীবনকে সার্থক ও সুন্দর করতে হলে অনেক বাধাবিপত্তির মোকাবিলা করতে হয়। সৎ লোকের সাহচর্যে থেকে তার আদর্শ অনুসরণ ও অনুকরণ করলে এসব বাধাবিপত্তি অতিক্রম করা সম্ভব। সৎসঙ্গ পরশপাথরের সাথে তুলনীয়। সঙ্গদোষে মানুষ হয় পশুর সমান। আবার এ সঙ্গের কারণেই কেউ আকাশচুম্বী সম্মান পায়। একজন সৎ ব্যক্তি কখনো অসৎ ব্যক্তির সাথে মিশতে চায় না। এ জগতে যত মানুষ পঙ্কিলতার অতল গহ্বরে নিমজ্জিত হয়েছে; তারা কুসংসর্গের প্ররোচনায় হয়েছে। কুসংস্পর্শ মানুষকে পাপপথে পরিচালিত করে। তাই তাদের ধ্বংস অনিবার্য। একজন মানুষ যদি খারাপ লোকের সাথে দীর্ঘদিন মেলামেশা করে, সে কিছু খারাপ অভ্যাস অর্জন করবে। শেষোক্ত যে সৎ বন্ধুর সাথে মেশে সে কিছু বিশেষ বৈশিষ্ট্য অর্জন করবে। জীবন সার্থক ও সুন্দর হয় সৎ লোকের সংস্পর্শে। আবার সৎ লোকের সংস্পর্শে অসৎ চরিত্রের লোক চরিত্রবান হয়ে যায়। পবিত্র কোরআনে বন্ধু নির্বাচনে সতর্কতা অবলম্বন করতে বলা হয়েছে।

মন্তব্য: আমাদের উচিত বন্ধু নির্বাচনের সময় সৎ, যোগ্য ও সুন্দর চরিত্রের অধিকারী ব্যক্তিকে বন্ধু হিসেবে নির্বাচন করা এবং তার সাহচর্য লাভ করে জীবনকে সার্থক করা।

SINCE 1993 NABARUN PUBLICATION

১১২. সবলের পরিচয় আত্মপ্রসারে, আর দুর্বলের স্বস্তি আত্মগোপনে।

[চ. বো. '০৬]

মূলভাব: সবল, ক্ষমতাবান ও যোগ্য লোকেরা আত্মপ্রসারের মধ্য দিয়ে নিজের পরিচয় তুলে ধরে। আর দুর্বল ও অদক্ষ লোকেরা নিজেকে আড়াল বা গোপন করে রাখার মধ্যে নিজের আত্মতৃপ্তি বা স্বস্তি খোঁজে।

সম্প্রসারিত ভাব: জনসংখ্যার আধিক্য যেকোনো দেশের জন্য বোঝারূপে বিবেচিত হলেও দক্ষ মানবসম্পদ যেকোনো দেশের শ্রেষ্ঠ সম্পদ হিসেবে গণ্য। কারণ প্রাকৃতিক সম্পদ আহরণ এবং সেগুলোর বহুমুখী উপযোগিতা সৃষ্টি করা, জ্ঞানবিজ্ঞানের চর্চা এবং নতুন নতুন আবিষ্কারের দ্বারা পৃথিবীকে সুন্দর ও শোভন করে গড়ে তোলার ক্ষেত্রে দক্ষ ও যোগ্য লোকের প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। আর কর্মের মধ্য দিয়েই মানুষের দক্ষতা ও যোগ্যতা প্রমাণ পায়। কাজের মধ্য দিয়ে নিজের যোগ্যতা ও দক্ষতা প্রমাণ করেই মানুষ আত্মশক্তি ও আত্মবিশ্বাসের জন্ম দেয়। আর মানুষের অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছানোর ক্ষেত্রে আত্মশক্তি ও আত্মবিশ্বাসের কোনো বিকল্প নেই। পক্ষান্তরে, দুর্বল ব্যক্তি মনে করে আত্মগোপনের মাধ্যমে তার কাঙ্ক্ষিত মুক্তি আসবে; অথচ তা আসার নয়। কারণ মুক্তি তপস্যার ফল; তা আপন হাতে ছিনিয়ে আনতে হয়। তাদের ভীরু মানসিকতা তাদের পিছিয়ে রাখে। ফলে তারা কাঙ্ক্ষিত সাফল্য লাভে ব্যর্থ হয়; জীবন থেকে পালাতে গিয়ে জীবন থেকে অকালে ঝরে যায়। সুতরাং মানবজীবন হতে হবে আত্মপ্রত্যয়ী, বলিষ্ঠ, শ্রমোন্মুখ। কঠিন সংগ্রামে যারা জীবনকে মুঠিতলে নিয়ে এগিয়ে যান বীরদর্পে তারা অমর হয়ে এ পৃথিবীতে বেঁচে থাকেন। বেঁচে থাকেন মানুষের হৃদয়ে।

বস্তুত মানবজীবন সংগ্রামের জীবন। এ সংগ্রামের মাধ্যমেই সে আত্মপ্রতিষ্ঠা পায়; নিজের অস্তিত্বকে করে অক্ষয়-অব্যয়। আর জীবন থেকে পালানোর ইচ্ছা যাদের তারা দুর্বল; তারা ধুঁকে ধুঁকে মরে সর্বত্র।

মন্তব্য: অতএব জীবনের প্রত্যয় হতে হবে সংগ্রাম। এই সংগ্রামই মানুষকে বাঁচিয়ে রাখে।

১১৩. সবুরে মেওয়া ফলে।

মূলভাব: এ সংসার কর্মময়। মানুষ জীবনধারণের জন্য বিভিন্ন রকম কাজ করে থাকে। এ কাজের সার্থক রূপায়ণের মধ্যে তার জীবনধারণ সহজ হয়। কোনো কাজের ফললাভ দ্রুত হতে পারে, আবার কোনো কাজে তা বিলম্বও হতে পারে।

সম্প্রসারিত ভাব: যে সমস্ত কাজের ফললাভে বিলম্ব হওয়ার কথা সেসব কাজের ফল দ্রুত পেতে চাওয়া ঠিক নয়। কেননা সে ফল অসময়োচিত বলে অপূর্ণ হবে। অনেক কাজ শুরু করার পর অতি অল্প সময়ে তা শেষ হয়। আবার অনেক কাজ শুরু করার পর শেষ হতে দীর্ঘ সময় নেয়। শেষ কাজটির পেছনে প্রতিনিয়ত পরিচর্যা ও পরিশ্রম করে যেতে হয় এবং ফলাফলের জন্য ধৈর্যধারণ করতে হয়। অপেক্ষা করাই ধৈর্যধারণ। ধৈর্যধারণ করতে পারলেই যথার্থ ফল লাভ সম্ভব। জীবন সংগ্রামে ব্যস্ত মানুষ নানা সময়ে বিচিত্র অবস্থার সম্মুখীন হয়। সেগুলোর তাৎক্ষণিক কোনো সমাধান সম্ভবপর নয়। এ অবস্থায় তার অপেক্ষা করা উচিত, অথচ যারা অপেক্ষা না করে সমাধান করতে চায় তারা সমস্যার সৃষ্টি করে। কিন্তু যেসব ব্যক্তি বিপদের মধ্যে পড়েও যথাসময়ে ধৈর্যধারণ করেন, তারা একসময় বিপদমুক্ত হয়ে ওঠেন।

মন্তব্য: ধৈর্যের সাথে বারবার চেষ্টার মাধ্যমে সফলতা একদিন আসবেই। বৈরী পরিস্থিতির সঙ্গে সংগ্রাম করে আঘাত সহ্য করে প্রতিঘাত দিয়ে টিকে থাকার মধ্যেই সার্থকতা।

১১৪. সাহিত্য জাতির দর্পণস্বরূপ।

[রা. বো. '০১; কু. বো. '১৫]

মূলভাব: দর্পণে যেমন অবিকল চেহারা দেখা যায়, তেমনি সমাজের সমকালীন ঘটনা সাহিত্যে প্রকাশিত হয়।

সম্প্রসারিত ভাব : কবি-সাহিত্যিকগণ তাঁদের সাহিত্য রচনার মধ্য দিয়ে নিজ নিজ দর্শন এবং সুকুমারবৃত্তির প্রকাশ করেন। সমাজে বসবাস করা মানুষের সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্না, আশা-আকাঙ্ক্ষা প্রভৃতি সাহিত্য রচনায় প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে। তাঁরা চারপাশের জীবনকে কখনোই উপেক্ষা করেন না। তাইতো চলমান ঘটনা সাহিত্যে অনায়াসেই স্থান করে নেয়। একটি জাতির ঐতিহ্য সাহিত্যের উপকরণ বলে বিবেচিত হয়। জাতীয় ঐতিহ্য এবং গৌরবের ভিত্তির ওপরই জাতীয় সাহিত্য নির্মিত হয়। বস্তুত জাতি এবং সাহিত্য ওতপ্রোতভাবে জড়িত। যে জাতির সাহিত্য যত বেশি উন্নত সে জাতিও তত বেশি উন্নত বলে ধরে নেওয়া হয়। কোনো জাতির সাহিত্য পড়েই আমরা সে জাতি সম্পর্কে ধারণা অর্জন করি। যেমন : গ্রিক সাহিত্য পাঠ করে আমরা প্রাচীন গ্রিকদের সংস্কৃতি, জীবনযাপন ও সভ্যতা সম্পর্কে অবগত হই। ফারসি সাহিত্য পড়ে প্রাচীন পারস্যের ইতিহাস সম্বন্ধে অবহিত হই। আর বাঙালি জাতিরূপে পৃথিবীতে আমাদের পরিচিতির মূলে আমাদের বাংলাসাহিত্য রয়েছে। আমাদের হাজার বছরের সাহিত্যভান্ডারে কবিতা, গান, গল্প, উপাখ্যান ইত্যাদি সঞ্চিত হয়েছে। সাহিত্যই আমাদের পরিচয় বহন করছে। আমাদের জাতীয় উন্নতির মাপকাঠি হলো 'সাহিত্য'।

মন্তব্য: সাহিত্য পাঠ করেই পাঠকের দৃষ্টিতে সবকিছু প্রস্ফুটিত হয়। এ কারণেই সাহিত্য জাতির দর্পণস্বরূপ।

১১৫. সুজনে সুযশ গায় কুযশ ঢাকিয়া
কুজনে কুরব গায় সুরব নাশিয়া।

মূলভাব: মানুষের আচরণে তার ভালো-মন্দ উভয় বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পায়। ভালো কাজের মধ্যে ভালো মানুষের পরিচয়, আবার খারাপ লোকের আচরণে তার খারাপ দিকটা প্রকাশমান।

সম্প্রসারিত ভাব: উত্তম চরিত্রের অধিকারী মানুষের মধ্যে বিভিন্ন গুণের প্রকাশ ঘটে; পরের কুৎসিত স্বভাবকে সে গোপন করে রাখে। মন্দ চরিত্রের লোকেরা মানুষের ভালো গুণ গোপন করে খারাপ দিকটা স্পষ্ট করে তোলে। মূলত আচরণ দিয়েই মানুষকে চেনা যায়। 'সু' ও 'কু' এদের পার্থক্য চিরন্তন। একটি অপরটির বিপরীত। যা ভালো, যা সুন্দর ও কল্যাণকর তা-ই 'সু'। আর যা খারাপ ও ক্ষতিকর, অমঙ্গলজনক তা-ই 'কু'। আমাদের সমাজে এই দুই শ্রেণির লোক দেখা যায়। কুজন মানুষের কুৎসা রটনা করে বেড়ায়। আর সুজন সকলের গুণকীর্তন করে। মানুষের প্রকৃত পরিচয় প্রকাশ পায় তার চালচলন, আচার-আচরণে; তাঁর

অন্তর্নিহিত চরিত্র বৈশিষ্ট্যে। একজন সৎস্বভাবের মানুষ চারপাশের সব অসুন্দরকে তাঁর মনের মহত্ত্ব দিয়ে আবৃত করতে চান। একজন দুর্জনের মধ্যে সামান্যতম গুণ থাকলেও তিনি সেটাকেই বড়ো করে দেখেন। এটাই সৎস্বভাব মানুষের চরিত্রের মহত্ত্ব। অন্যদিকে কুজন নিজের মনের সংকীর্ণতার কারণে সৎস্বভাবের মানুষ বা সুজনের মধ্যে সুন্দর কিছু দেখতে পায় না। সুজনের সকল ভালো গুণকে সে কাল্পনিক কলঙ্কের আবরণে ঢেকে রাখে। সুজনের স্বভাব দোষকে ঢেকে রেখে গুণকে প্রকাশ করা। অন্যদিকে কুজনের অভ্যাস গুণকে ঢেকে রেখে দোষকে প্রকাশ করা আর সুজনকে হেয় করা। ভালো মানুষ কখনো খারাপ করার চিন্তা করে না; কারও অপযশও প্রচার করে না; বরং মহৎ ব্যক্তি অপরের দোষত্রুটি ঢেকে রেখে তার সুনাম করে। এ ধরনের আচরণে তাঁর মহত্ত্বের প্রকাশ ঘটে। সুজন বা ভালো মানুষ নিজের সুন্দর মনের বিবেচনায় অপরের খারাপ কাজের মধ্যেও ভালো দেখতে পায়। অন্যদিকে কুজন বা খারাপ প্রকৃতির মানুষ অপরের ভালো দেখতে পারে না। সে অপরের ভালো কাজকেও খারাপ কাজ বলে প্রচার করে। তার কানে সুন্দর শব্দ অনুরণিত হয়ে উঠলেও তার প্রশংসা করতে সে কুণ্ঠিত হয় এবং পরিবর্তে অপযশ প্রচারে তৎপর থাকে।

মন্তব্য: মানুষ নিজ নিজ স্বভাবের বৈশিষ্ট্য অনুসারে অন্যের কার্যকলাপ বিচার করে থাকে। সুজন ও কুজন উভয়ের চরিত্র ও প্রকৃতিতে রয়েছে আকাশপাতাল ব্যবধান। তাই মানুষের আচরণ থেকে তাদের পরিচয় নির্ধারণ করতে হবে এবং কুজনকে সর্বান্তঃকরণে পরিহার করতে হবে।

১১৬. সুশিক্ষিত লোক মাত্রই স্বশিক্ষিত।

[ব. বো. '১৫; চ. বো. '১৭, '১১; য. বো. '১৩, '১১, '০১; দি. বো. '১৭]

মূলভাব: কেবল প্রতিষ্ঠান থেকে অর্জিত শিক্ষাই প্রকৃত শিক্ষা নয়। বাস্তব জীবনের প্রেক্ষিতে প্রকৃতি থেকে অর্জিত শিক্ষাই প্রকৃত শিক্ষা বা সুশিক্ষা।

সম্প্রসারিত ভাব: শিক্ষা জীবনব্যাপী একটি প্রক্রিয়ার নাম। শিক্ষা মানুষের আচরণের পরিবর্তন ঘটায়। কিন্তু কেবল প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার দ্বারা তা সম্ভব হয়ে ওঠে না। এজন্য স্বীয় উদ্যোগ প্রয়োজন। স্বীয় বুদ্ধি প্রয়োগ করে প্রকৃতি থেকে শিক্ষা অর্জন করতে না পারলে কেউ শিক্ষিত হতে পারে না। প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা জ্ঞান আহরণ ও জ্ঞানচর্চার পথকে অনেক সময় সুগম করে তুললেও জ্ঞানের পূর্ণতা দেয় না। আত্মপ্রয়াসের মাধ্যমেই সত্যিকারের জ্ঞান অর্জন করা সম্ভব। এর জন্য প্রয়োজন একাগ্রতা ও প্রচুর পরিশ্রম। তাহলেই জ্ঞানের গভীরতম সমুদ্রে প্রবেশ করা সম্ভব। এ-কথা সত্য যে, আজকাল স্কুল-কলেজের শিক্ষা মূলত পরীক্ষা পাশ এবং সার্টিফিকেট লাভের শিক্ষা। বিদ্যায়তনের শিক্ষা জ্ঞানার্জনের জন্য নয়, জীবিকার্জনের জন্য। তাই এ শিক্ষা কোনোভাবেই সুশিক্ষা নয়। আর সে শিক্ষায় শিক্ষিত লোককে কোনো সুশিক্ষিত লোক বলা যাবে না। বিদ্যা অর্জনকারী লোককেই প্রচলিত ধারণায় শুধু শিক্ষিত বলা হয়। কিন্তু আসলে এটি ঠিক নয়। যেকোনো ভালো, গঠনমূলক এবং কল্যাণময় কাজে যিনি শিক্ষিত তিনিই সুশিক্ষিত এবং স্বশিক্ষিত। মহাপুরুষ হযরত মুহম্মদ (সা.) ছিলেন সুশিক্ষিত এবং স্বশিক্ষিত। শুধু মুহম্মদ (সা.)-ই নন, যুগে যুগে বহু সুশিক্ষিত ও স্বশিক্ষিত মানুষেরা পৃথিবীতে এসেছেন, যাঁরা শিক্ষা দিয়ে গেছেন মানুষকে। তাঁরা নিজেরা যেমন ছিলেন আলোকিত, তেমনি আলোকিত করে গেছেন সমাজকে, পৃথিবীকে। আমাদের দেশেও এরকম অনেক সুশিক্ষিত ও স্বশিক্ষিত লোক ছিলেন– এঁদের মধ্যে অন্যতম বিশ্বকবি রবীন্দনাথ ঠাকুর, বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলাম। প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা অর্জন করে যদি কেউ কুসংস্কারাচ্ছন্ন ও বিভিন্ন অপকর্মে লিপ্ত হয় তবে তাকে সুশিক্ষিত বলা যায় না।

মন্তব্য: সুশিক্ষিত ব্যক্তিমাত্রই আলোকিত মানুষ। তাঁরা মুক্তির আলোয় সর্বদা চারপাশ আলোকিত করে রাখেন।

১১৭. সেই ধন্য নরকুলে লোকে যারে নাহি ভুলে
মনের মন্দিরে নিত্য সেবে সর্বজন।

[য. বো. '০৬]

মূলভাব: মানুষের ঘরে জন্মালেই প্রকৃত মানুষ হওয়া যায় না। প্রকৃত মানুষ হতে চাই কঠিন অধ্যবসায়। এ সাধনায় উত্তীর্ণ মানুষই প্রকৃত মানুষ। সে ধন্য, সে আরাধ্য, পৃথিবীময় তার জয়গান, লোকের অন্তরে তার বাস, মনের মন্দিরে পূজা, তাই সে বেঁচে থাকে অনন্তকাল।

সম্প্রসারিত ভাব: যাঁরা পরোপকারে জীবনকে বিলিয়ে দিয়ে কীর্তি স্থাপন করে গেছেন তারা কীর্তিমান। তাঁরা মরেও অমর হয়ে আছেন। মানুষ মরণশীল; এটি চিরন্তন সত্য। তবুও যাঁরা কীর্তিমান তাঁরা তাদের সেবামূলক মহৎকর্মের মাধ্যমে মানবসমাজে বেঁচে থাকেন বহু যুগ ধরে। তাঁদেরকে সাধারণ মানুষেরা মনের মন্দিরে রেখে পূজা করে। মানুষ অমরত্বপ্রাপ্ত হয় তার মহৎ কর্মের মাধ্যমে। কর্ম তাকে বাঁচিয়ে রাখে সাধারণ মানুষের অন্তরে চিরদিন। অর্থাৎ যেসব মানুষ নিঃস্বার্থভাবে পরোপকারে আত্মনিয়োগ করেন, মানুষের কল্যাণে নিজেদেরকে বিলিয়ে দেন মৃত্যুর পরেও তাঁরা অমর হয়ে থাকেন মানুষের মাঝে। এভাবে কীর্তিমান ব্যক্তিত্ব তাঁদের মহৎকর্মের জন্য অমরত্ব লাভ করেন। এসব লোকের দৈনিক মৃত্যু হলেও প্রকৃতপক্ষে তাঁরা অমর। সর্বদাই তাঁরা মানবের অন্তরে বিরাজ করেন। মানুষ তাঁদেরকে শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করে এবং তাদের মৃত বলে মনে হয় না। মানুষ বেঁচে থাকে তার কর্মের মাধ্যমে, তার বয়সের মধ্যে নয়। কত কোটি কোটি মানুষ এ পৃথিবীতে এসেছে। কিন্তু তাদের মৃত্যুর পর কেউ তাদেরকে মনে রাখতে পারেনি। তারা ভেসে গিয়েছে কালস্রোতে। তবু যেসব কীর্তিমান ব্যক্তিবর্গ মানুষের সেবায় আত্মনিয়োগ করে মৃত্যুবরণ করেছেন তাঁরা অমর। তাই সক্রেটিস, প্লেটো, গ্যালিলিও প্রমুখ কীর্তিমান ব্যক্তিবর্গের মৃত্যু হয়েছে বহুদিন পূর্বে কিন্তু তাঁরা আজও চিরভাস্বর মানুষের হৃদয়ে।

মন্তব্য: কীর্তিমান ব্যক্তিগণই মানুষের মধ্যে ধন্য। সর্বজনের মনের মন্দিরে তারাই নিত্য স্মরণীয় ও বরণীয় হয়ে থাকেন।

১১৮. স্পষ্টভাষী শত্রু নির্বাক মিত্র অপেক্ষা শ্রেয়।

[সি. বো. '০২; দি. বো. '১৪]

মূলভাব: কথায় আছে 'অজাতশত্রু' অর্থাৎ যার কোনো শত্রু নেই। কিন্তু বাস্তব জীবনে অজাতশত্রু বলে কেউ নেই। শত্রু–মিত্র সবার জীবনেই আছে। মানুষ শত্রুদের এড়িয়ে চলে আর মিত্রদেরই পছন্দ করে।

সম্প্রসারিত ভাব: জীবনে চলার পথে আমাদের অনেক মানুষের সান্নিধ্যে আসতে হয়। তাদের মাঝে শত্রু–মিত্র দুই ধরনের মানুষই মেলে। শত্রু মানুষের অনিষ্টসাধন করে। আর মিত্র বন্ধুর শুভকামনায় আত্মশক্তি লাভ করে। সত্যিকারের বন্ধু সুখের দিনে যেমন পাশে থাকে তেমনি দুঃখেও মর্মযাতনা ভোগ করে। বন্ধুর ভুলত্রুটি সংশোধন করাও বন্ধুর দায়িত্ব। অপরপক্ষে শত্রু সবসময় মানুষের ক্ষতি করার চেষ্টা করে এবং ক্ষতি করতে পারলে খুশি হয়। শত্রুর বিরুদ্ধে মানুষ ষড়যন্ত্রের জাল বিস্তার করে। যে মিত্র শুধুমাত্র নির্বাক হয়ে বন্ধুর ভালো কাজের প্রশংসা করে খারাপ কাজের সমালোচনা করে না তেমন বন্ধুর চেয়ে স্পষ্টভাষী শত্রু অনেক ভালো। কারণ স্পষ্টভাষী শত্রু মানুষের ভুলত্রুটিগুলো ধরিয়ে দেয়। শত্রু সমালোচনা করে, নিন্দা করে জনসমক্ষে তাকে হেয় প্রতিপন্ন করার চেষ্টা করে। শত্রুর কথায় সে অপমানবোধ করলেও নিজেকে সংশোধন করার চেষ্টা করে। স্পষ্টভাষী শত্রু অবচেতনভাবে ব্যক্তিকে সচেতন ও জাগ্রত করে তোলে।

মন্তব্য: আপাতদৃষ্টিতে সমালোচনাকারীকে অপ্রিয় মনে হলেও জীবন গড়ার ক্ষেত্রে সে মিত্রের মতো কাজ করে। তাই স্পষ্টভাষী শত্রুই নির্বাক বন্ধুর চেয়ে উত্তম।

১১৯. স্বদেশের উপকারে নাই যার মন
কে বলে মানুষ তারে পশু সেই জন।

[সি. বো. '১৭, '১৫, '১১; ঢা. বো. '১২, '০৯;, দি. বো. '১৫; য. বো. '১৪, '১৩, '০৩; কু. বো. '১৫, '০৭; ব. বো.'০৯]

মূলভাব: জননী জন্মভূমির সাথে মানুষের রয়েছে এক অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক। স্বদেশ মানেই নিজের দেশ–মাতৃভূমি। মানবজীবনের মহৎ আদর্শ হলো তার দেশপ্রেম। যে ব্যক্তির ভেতরে দেশপ্রেমের এই শাশ্বত সত্যের উপলব্ধি নেই, তাকে মানুষ না বলে পশু বলাই শ্রেয়।

সম্প্রসারিত ভাব: মা, মাটি আর মানুষ– এ তিনটিই মানুষের পরম শ্রদ্ধার বস্তু। স্বদেশপ্রিয় মানচিত্র মানুষকে দেয় গৌরবোজ্জ্বল ঠিকানা। পতাকার রং বাড়ায় আত্মসম্মান। সুমধুর জাতীয় সংগীত বাড়ায় সঞ্জীবনী সুধা। স্বদেশের মাটির মতো এমন পবিত্র আর কিছুই নেই। এর নদী, জল, শস্যভরা প্রান্তর, নৈসর্গিক দৃশ্যাবলি মানুষকে টেনে নেয় গভীর থেকে গভীরে। পৃথিবীর অপরাপর দেশের চেয়ে এ মাতৃভূমি মানুষের কাছে প্রিয় বলে মনে হয়। নিজের দেশ গরিব হলেও তা মানুষের কাছে সবচেয়ে প্রিয়। মানুষের মনে এই ধারণা থেকে দেশপ্রেম জন্মে। দেশের প্রতি অকৃত্রিম ভালোবাসা প্রদর্শন করে, দেশের মানুষের জন্য নিজেকে উৎসর্গ করা প্রতিটি মানুষের পবিত্র দায়িত্ব। স্বদেশের ভালো–মন্দ মানুষকে অবশ্যই ভাবতে হয়। দেশের গৌরবকে সমুন্নত রাখা একজন

নাগরিকের পবিত্র কর্তব্য। সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে ধারণ এবং লালন করা একজন মানুষের প্রধান কাজ। প্রিয় স্বদেশকে ঘিরেই মানুষের অন্তরে রচিত হয় নানান স্বপ্ন। একজন সচেতন মানুষ তার জন্মভূমিকে ভালো না বেসে পারে না। যদি কেউ তার জন্মভূমিকে ভালো না বাসে তাহলে সে মানুষ নয়। তাকে পশু বলাই শ্রেয়। কারণ পশুর কোনো দেশ নেই; মানুষের আছে। একজন মানুষ যতই ধনবান, রূপবান কিংবা জ্ঞানবান হউক, তার অন্তরে যদি স্বদেশপ্রেম না থাকে, জন্মভূমির কল্যাণের জন্য যদি তার মন না থাকে, তাহলে সে নরাধম। আর এক শ্রেণির সংকীর্ণমনা লোক যারা সমাজের কথা, দেশের কথা না ভেবে নিজেদের স্বার্থ নিয়ে ব্যস্ত থাকে তারা মানুষ নামের কলঙ্ক, নরকের কীট।

মন্তব্য: আমাদের মাতৃভূমি আমাদের দিয়েছে পরম আশ্রয়। এর সুশীতল ছায়ায় আমরা লালিত হই, পূরণ করি আমাদের স্বপ্ন। এর কল্যাণের জন্য আমাদের অবশ্যই চেষ্টা করা উচিত। স্বদেশপ্রীতি যার নেই সে পশুর সমান। দেশপ্রেম না থাকলে প্রকৃত মানুষ হওয়া যায় না। তাই স্বদেশের গৌরবের জন্য প্রত্যেকেরই চেষ্টা করা উচিত।

১২০. স্বাধীনতা অর্জনের চেয়ে স্বাধীনতা রক্ষা করা কঠিন।

[রা. বো., সি. বো. '১৪, '১২, '০৭, '০৫; ব. বো. '১৭, ০৭; কু. বো. '০৮, '০২; দি. বো. '০৯; চ. বো. '১০, '০৮;ঢা. বো. '১১; য. বো. '১২, '০০]

মূলভাব: স্বাধীনতা জাতীয় জীবনের অমূল্য সম্পদ। স্বাধীনতাকে রক্ষা করার জন্য প্রতিটি নাগরিককে অতন্দ্র প্রহরীর ন্যায় সদাসতর্ক থাকতে হয়। কেননা স্বাধীনতা অর্জন করা যতটা কঠিন কাজ, তার চেয়েও বিশেষ কঠিন কাজ হলো একে রক্ষা করা।

সম্প্রসারিত ভাব: স্বাধীনতা প্রতিটি মানুষের জন্মগত অধিকার। আর মানুষমাত্রই স্বাধীনতাকামী। পরাধীন জীবন কারও কাম্য নয়। পরাধীনতার শৃঙ্খল মুক্ত করার জন্য মানুষকে দিতে হয় বুকের তাজা রক্ত। জীবনের পরিপূর্ণ আস্বাদ গ্রহণের জন্য মানুষ স্বাধীনতা চায়। স্বাধীনতা ছাড়া কেউ মানুষের অধিকার নিয়ে বাঁচতে পারে না। কিন্তু একে সহজে পাওয়া যায় না। বহু ত্যাগ–তিতিক্ষা আর রক্তের বিনিময়ে তা অর্জন করতে হয়। স্বাধীনতা অর্জনের চেয়েও কঠিন কাজ হলো বহিঃশত্রুর হাত থেকে তাকে রক্ষা করা। একটি স্বাধীন দেশে যখন পরাধীন দেশের ভাবধারা বজায় থাকে, তখন সে দেশ মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং সে দেশের অস্তিত্ব বিলুপ্তি হতে থাকে। তাই কোনো দেশের অশুভ শক্তির হাত থেকে দেশকে রক্ষা করার জন্যে নাগরিকদের সদা সচেতন থাকা প্রয়োজন। এজন্য বিদেশি ভাবধারার আমদানি বর্জন করতে হবে এবং নিজস্ব সংস্কৃতিকে পালন করে জাতিকে উন্নতির দিকে এগিয়ে নিতে হবে। এক সাগর রক্তের বিনিময়ে আমরা পেয়েছি আমাদের মহান স্বাধীনতা। এ স্বাধীনতা আমাদের জাতীয় জীবনের পবিত্র আমানত। একে রক্ষা করার দায়িত্বও আমাদের। আমাদের জাতীয় জীবনে যাতে অর্থনৈতিক মুক্তি আসে সেদিকে আমাদের লক্ষ রাখতে হবে এবং এই লক্ষ্যকে সামনে রেখে আমাদেরকে একসাথে কাজ করে যেতে হবে— ভালোবাসতে হবে দেশের মাটি ও মানুষকে। গৌরবময় মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে আমরা অর্জন করেছি আমাদের স্বাধীনতা। এ স্বাধীনতার সুফল ঘরে ঘরে পৌঁছে দেওয়া আমাদের জাতীয় কর্তব্য। আমাদের এ প্রিয় জন্মভূমি যাতে সমৃদ্ধিশালী দেশ হিসেবে পৃথিবীর বুকে মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে পারে সেদিকে আমাদের সবার মনোযোগ দিতে হবে। তাহলেই স্বাধীনতার মূল্য যথার্থ প্রতিফলিত হবে।

মন্তব্য: স্বাধীনতা রক্ষার সংগ্রাম বহুমুখী এবং জটিল। তাই স্বাধীনতা অর্জনের চেয়ে স্বাধীনতা রক্ষা অপেক্ষাকৃত কঠিন।

১২১. প্রাণ থাকলেই প্রাণী হয় কিন্তু মন না থাকলে মানুষ হয় না।

[ব. বো. '১৯; রা. বো. '০২; য. বো. '০৫; ঢা. বো., কু. বো. '১৪, '০৬; দি. বো. '১০]

মূলভাব: মানুষ সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ জীব। এই শ্রেষ্ঠত্বের কারণ হলো মানুষের সুন্দর একটা মন আছে। যা আর কোনো প্রাণীর নেই। মনই মানুষকে অন্যান্য প্রাণী থেকে আলাদা করেছে।

সম্প্রসারিত ভাব: পৃথিবীতে যত প্রকার জীব রয়েছে, তাদের প্রত্যেকেরই প্রাণ আছে। শুধু এদিক থেকে বিচার করলে মানুষ আর দশটা প্রাণীর মতোই একটা প্রাণী। তবে একটিমাত্র বৈশিষ্ট্যের কারণে সে সকল প্রাণী থেকে শ্রেষ্ঠ আর তা হলো মন। মনোজগতের বৈশিষ্ট্যের কারণেই মানুষ অন্যান্য প্রাণী থেকে আলাদা। মন আছে বলেই মানুষের মধ্যে প্রেম আছে, কল্পনা আছে, সৌন্দর্যবোধ আছে, ধর্ম আছে। পৃথিবীর সকল পাপ–পুণ্য, ভালো–মন্দ, ধর্ম–অধর্মের পার্থক্য নিরূপণে মানুষকে পরিচালিত করে তার মন। এ মন বা হৃদয় দ্বারা পরিচালিত হয়ে মানুষ সৎকাজ করে এবং শিক্ষা, সাধনা ও অনুশীলনের মাধ্যমে মানবিক গুণাবলি আয়ত্ত করে সত্যিকারের মানুষ হয়ে গড়ে ওঠে। তখন অন্যান্য প্রাণী থেকে সে আলাদা হয়ে যায়। দৈনন্দিন জীবনে দ্বন্দ্ব–সংঘাত,

হিংসা–বিদ্বেষ, লোভ–লালসা, স্বার্থচিন্তা, কুমন্ত্রণা প্রভৃতির ক্লেদাক্ত স্পর্শ থেকে নিজেকে মুক্ত রাখে। মানুষের মন বা বিবেক আছে; পশুদের তা নেই। প্রাণীর শুধু প্রাণ আছে বলেই তারা প্রাণী। কিন্তু মন এমন এক অমূল্য সম্পদ, যার প্রভাবে মানুষ প্রাণী হয়েও মানুষ নামে পরিচিত। এই সুন্দর মনের কারণেই মানুষ আজ সভ্যতার চরম শিখরে পৌঁছাতে পেরেছে। মানুষ তার মন দিয়ে সাধনা করে জীবনের বিচিত্র বিকাশ ঘটায়, যা অন্য কোনো প্রাণী পারে না। আবার কোনো প্রাণীই নিজেকে জানে না। কিন্তু মানুষ নিজেকে জানে। আর এটা সম্ভব হয় তার মনের মাধ্যমেই। মনই তার রহস্যময় আয়না, মনই তাকে বৈশিষ্ট্যমন্ডিত করেছে। তাই সকল প্রাণীর ওপরে মানুষের স্থান ও মর্যাদা। যে কেবল আকৃতি নিয়ে পশুর মতো কাজ করে, পশুসুলভ আচরণ করে; যার মধ্যে মানবতাবোধ, সত্যনিষ্ঠা, ঔদার্য, সৎবিবেচনাবোধ, বিবেকবুদ্ধি ইত্যাদি নেই তাকে সত্যিকারের মানুষ বলা চলে না। তাই মানুষ হতে হলে শুধু প্রাণ থাকলেই চলবে না; প্রাণ ও মনের যুগপৎ বৈশিষ্ট্যের মাধ্যমে মনুষ্যত্বের বিকাশ ঘটাতে হবে, মানুষ হিসেবে অর্জন করতে হবে সমস্ত গুণাবলি। মনের অস্তিত্ব আছে বলেই তাকে মানুষ নামে অভিহিত করা হয়। এই মনের অধিকারী ব্যক্তিই জগতের স্নেহ, মমতা, মায়া প্রভৃতির অধিকারী। বিবেকবুদ্ধি জাগ্রত হলেই মানুষের মনের বিস্তার ঘটে। তাই মানুষ সুন্দর ও কল্যাণের পথে চলতে চায়, অপরদিকে যার মনের প্রসার ঘটে না সে মনুষ্যত্বের অধিকারী নয়। এককথায় সকলের মনে রাখা প্রয়োজন যে, মনই মানুষকে জ্ঞানী ও সংবেদনশীল করে তোলে। তাই মানুষ হতে হলে তাকে অবশ্যই সুন্দর সুস্থ মনের অধিকারী হতে হবে। মানুষের সঙ্গে জীবজন্তুর তফাত হলো– আত্মরক্ষা, বংশরক্ষা ও খাদ্য সংগ্রহে; যা জীবজন্তুর ধর্ম। বেঁচে থাকার জন্য মানুষকেও খাদ্য সংগ্রহ করতে হয়। তার আত্মরক্ষা, বংশরক্ষার প্রয়োজনীয়তাও আছে। তাছাড়া মানুষ জ্ঞান, বুদ্ধি, বিদ্যা ও সুকোমল হৃদয়বৃত্তির অধিকারী। পরার্থে আত্মোৎসর্গ করতে পারে। এগুলো পশুর নেই। মানুষ এজন্য সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ জীব।

মন্তব্য: মানুষের বিচারবুদ্ধি ক্ষমতা, মহানুভবতা, ন্যায়পরায়ণতা ইত্যাদি গুণাবলি রয়েছে, কিন্তু পশুদের তা নেই। তাই বলা যায়, শুধু প্রাণই নয়, মন বা বিবেকই মানুষকে অন্যান্য প্রাণী থেকে আলাদা করে, মানুষ হিসেবে পৃথিবীতে আত্মপরিচয়ের মর্যাদা দিয়েছে।

১২২. ফুলের বাগান সবার মনেই আছে
ফুল ফোটাতে সবাই নাহি পারে।

মূলভাব: সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ জীব সকল মানুষ অমিত সম্ভাবনার আধার। সবার ভেতরে ন্যায়, সৌন্দর্যবোধ ও সুপ্ত প্রতিভা রয়েছে। কিন্তু প্রতিভার বিকাশ সবাই ঘটাতে পারে না। ফুলের জন্য যেমন গাছ লাগাতে হয়, গাছের যত্ন নিতে হয়; তেমনি মানুষের সুপ্ত প্রতিভার জন্যও অনুশীলন প্রয়োজন।

সম্প্রসারিত ভাব: পৃথিবীর সকল প্রাণিকুলের মধ্যে মানুষের অবস্থান ভিন্নতর ও শ্রেষ্ঠতর। ন্যায়–অন্যায় ও ভালো–মন্দ বিচার করার বোধ কেবল মানুষের মধ্যেই আছে। মানুষ বুদ্ধি–বিবেচনা, প্রেম–প্রীতি, মায়া–মমতা, ভালোবাসা, সহানুভূতি, সমবেদনা, পরোপকার ও সৌন্দর্যবোধে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করেছে স্বতন্ত্রভাবে। উনয়নের প্রতিটি পদক্ষেপে মানুষ রেখেছে বিস্ময়কর অবদান। সেই মানুষের মাঝে রয়েছে ফুলবাগানরূপ মন। বিধাতা মানুষকে বিভিন্ন গুণে বিভূষিত করে দুনিয়াতে পাঠিয়েছেন। মানুষ তার সদ্‌গুণাবলির সাহায্যে পৃথিবীকে স্বর্গসদৃশ করে তুলতে পারে। মানুষের স্বীয় গুণাবলি দিয়ে নিজের মনোরাজ্যে গড়ে তুলতে পারে ফুলের বাগান। ফুলের মতো সুন্দর হবে তার আচার–ব্যবহার। এর জন্য দরকার চেষ্টা ও পরিশ্রম। শুধু স্বপ্ন দিয়ে জীবন সুন্দর করা যায় না। ধৈর্য, শিক্ষা, মহত্ত্ব, ত্যাগ, শিক্ষা, আদর্শ– মানুষের জীবনকে সুন্দর ও মহৎ করে তোলে। গুণের আকাঙ্ক্ষা সবারই আছে। কিন্তু সব মানুষের পক্ষে সম্ভব হয় না এ গুণগুলোকে বিকশিত করার। কারণ চেষ্টার অভাব। চেষ্টা আর পরিশ্রম দিয়েই জীবনরূপ বাগানকে ফুলে ফুলে শোভিত করা যায়। কিন্তু উপযুক্ত পরিচর্যার অভাবে অনেকেই জীবনক্ষেত্রকে সুন্দর করে ফুল ফোটানোর মতো অনুকূল অবস্থায় আনতে পারে না। ফলে মনের ইচ্ছা মনেই থেকে যায়। তাই আগে প্রয়োজন মনের সৌন্দর্য। পৃথিবীর বেশিরভাগ মানুষ রিপুর তাড়নায় বিভোর হয়ে নিজের ক্ষমতা ও গুণাবলিকে ভুলে পশুর মতো জীবনযাপন করে। তারা সদ্‌গুণাবলিরও বিকাশ করে না, অনুশীলনও করে না, ফলে তাদের মনের সুকুমার বৃত্তিগুলোও বিকশিত হয়ে ওঠে না। তাদের মধ্যে মহত্ত্ব ও উদারতাও নেই। তাঁরা সুন্দর পৃথিবীতে অসুন্দরের পূজা করে। ফুলের বাগানের মতো সুন্দর মন থাকা সত্ত্বেও সমাজে তারা অসম্মানের পাত্র হয়ে থাকে। তাই ফুলের মতো সৌরভ ছড়াতে হবে তাঁর কাজ–কর্ম ও আচার–ব্যবহারের মাধ্যমে। প্রেম–প্রীতিতে বেঁধে দিতে হবে বিশ্বসংসারকে। তবেই মহৎ মানবরূপে নিজের প্রতিষ্ঠা হবে।

মন্তব্য : নিজের বিকাশ ঘটাতে হয় নিজেরই সৃষ্টিকর্মের মাঝে। তাই শুধু বাগান করে রেখে দিলেই চলবে না, সেই বাগানকে পরিচর্যার মাধ্যমে ফুল ফোটাতে হবে। ফুল ফোটাতে পারাটাই আমাদের সার্থকতা। মানুষের মনের সুকুমার বৃত্তিগুলো ফুলের মতো করেই প্রস্ফুটিত হয়। আর যে মানুষ সেটা করতে পারে না সামাজিক জাবনে তারা যোগ্যতা লাভ করতে পারে না।

১২৩. বড় যদি হতে চাও, ছোট হও তবে।

মূলভাব: প্রকৃত জ্ঞানী মানুষেরা বিনয়ী ও নিরহংকারী হয়। তাঁরা কখনো নিজেকে বড়ো বলে জাহির করে না; বরং নিজেকে সামান্য ও ক্ষুদ্র ভাবেন।

সম্প্রসারিত ভাব: পৃথিবীতে সবার ভেতরই বড়ো হওয়ার বাসনা থাকে। সবাই চায় অন্যের চেয়ে মান–সম্মান, শিক্ষা–দীক্ষায় উচ্চ স্থানের অধিকারী হতে। অনেকের ধারণা যে, যারা নিজেকে বড়ো করার জন্য সদা চেষ্টা করে থাকে তারা সহজেই বড়ো হতে পারে। তাই অনেকেই বিখ্যাত হওয়ার জন্য অনেক ভাবেই নিজেকে বড়ো বলে প্রচার করে। কিন্তু এভাবে বড়ো বা সম্মানীয় ব্যক্তি হওয়া যায় না। সংস্কৃতে একটি কথা আছে, 'শ্রদ্ধাবান লভতে জ্ঞানম্।' অর্থাৎ যাঁরা বিনীত, নম্র, ভদ্র এবং গুরুজনদের প্রতি শ্রদ্ধাশীল তাঁরাই বিদ্বান ও জ্ঞানী হন, মানুষের মতো মানুষ হন। পৃথিবী কর্মক্ষেত্র, এখানে যাঁরাই তাঁদের উন্নত চরিত্রবল ও বিনম্র ব্যবহার দ্বারা মানুষের ভালোবাসা লাভ করেছেন তাঁরাই আদর্শ স্থাপন করতে সমর্থ হয়েছেন। অর্থাৎ সমাজে ও সংসারে বড়ো হতে গেলে ছোটো হতে হবে। এখানে 'ছোটো' মানে নম্র, বিনীত, ভদ্র হওয়া, বড়োদের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হওয়াকে বোঝায়। বড়ো হওয়ার প্রথম ধাপ হলো সুশিক্ষা লাভ। সুতরাং সুশিক্ষা লাভ করার পেছনে আছে সেই মনোভাব যা বড়ো হওয়ার পূর্বতন শর্ত। সুশিক্ষিত ব্যক্তি কখনো অহংকারী ও উদ্ধত হতে পারেন না, সুশিক্ষা মানুষকে নম্র ও বিনীত হতে প্রণোদিত করে। যে বৃক্ষ ফলভারে নত, সে কেবল অপরকে দান করেই তৃপ্ত, তেমনি শিক্ষার মহান আদর্শ দ্বারা যিনি বিনম্র হয়ে সকলের ভালোবাসা ও প্রীতি আকর্ষণ করতে পারেন তিনি মহৎরূপে কীর্তি রেখে যান। সুশিক্ষিত ও ভদ্রজনের কর্মকান্ডে সমাজ ধন্য হয়, পবিত্র হয়।

মন্তব্য: আত্মপ্রচারকারী কখনো মহৎ মানুষ হতে পারে না; বরং সে বড়ো হতে গিয়ে ছোটো হয় এবং মহৎব্যক্তি সমাজ কর্তৃক নিন্দিত হন।

১২৪. বন্যেরা বনে সুন্দর, শিশুরা মাতৃকোলে।

[দি. বো. '১২]

মূলভাব: সৌন্দর্য প্রকৃতির এমনই একটি দুর্লভ গুণ যা সর্বত্র বিকশিত হয় না। প্রাকৃতিক নিয়মে যার যেখানে স্থান সেখানেই তার সৌন্দর্য যথার্থরূপে বিকশিত হয়।

সম্প্রসারিত ভাব: পৃথিবীর সবকিছুরই একটা নিজস্ব পরিবেশ আছে। এর ব্যতিক্রম ঘটলে তার সৌন্দর্য ম্লান হয়ে যায়। যেমন – বন্য মানুষের স্বভাব, চরিত্র, আচার–ব্যবহার স্বাভাবিক চরিত্র হিসেবে বনের মধ্যেই যথার্থভাবে বিকাশ লাভ করে থাকে। কিন্তু তাদের যদি সভ্যতার আলোতে আনা হয় তবে তাদের বড়ো বেমানান লাগবে। মায়ের কোলে শিশুকে যেমন সুন্দর লাগে, অন্য কারও কোলে শিশুকে তত সুন্দর লাগে না। মায়ের কোলেই শিশু সবচেয়ে বেশি নিরাপদ অনুভব করে। তেমনি বনের পশুরাজ সিংহকে খাঁচায় বন্দি করলে তার স্বাভাবিক সৌন্দর্য বিলুপ্ত হয়। বনের মুক্ত বিহঙ্গকে সোনার খাঁচায় ধরে রাখলেও অস্বাভাবিক মনে হয়। বাগানই ফুলের অপরূপ সৌন্দর্যের আধার। গৃহের ফুলদানিতে সে মানানসই নয়। সৌন্দর্য এক দুর্লভ গুণ। এর একটা নিজস্ব পরিবেশ আছে। কোনো জিনিসকে দেখতে হলে তাকে তার নিজস্ব পরিবেশ হতে দেখতে হবে। সে পরিবেশ হতে তাকে বিচ্ছিন্ন করলে তার সৌন্দর্য হ্রাস পায়। গাছের স্বাভাবিক সৌন্দর্য কোথায়? ফুলের জন্য। তাকে গাছ হতে ছিঁড়ে আনলে তার স্বাভাবিক সৌন্দর্য হ্রাস পায়। স্কুল–কলেজ ভবনের সৌন্দর্য কোথায়? ছাত্র–ছাত্রীরা যখন কলরব করে জ্ঞানসাধনায় ব্রতী হয়। বন্যদের তেমনি সুন্দর দেখায় বনে, শহর–নগরের লোকালয়ে নয়, বনেই তার সৌন্দর্য সীমাবদ্ধ।

মন্তব্য: নিজ নিজ পরিবেশেই যার যার সৌন্দর্য বিকশিত হয়। যার যেখানে পরিবেশ তাকে সেখানেই মানায়।

১২৫. স্বার্থমগ্ন যে–জন বিমুখ
বৃহৎ জগৎ হতে, সে কখনো শেখেনি বাঁচিতে।

[য. বো. '০০; রা. বো. '১০, '০৬; চ. বো. '১৪, '০৯; সি. বো. '১০; কু. বো. '১২, '০০]

মূলভাব: আত্মস্বার্থে, নিজের সুখসমৃদ্ধির কথা চিন্তা করে যে জগৎ থেকে নিজেকে গুটিয়ে রাখে পৃথিবী তাকে একদিন আস্তাকুঁড়ে নিক্ষেপ করবে। পৃথিবী তাদের কোনোদিন মনে রাখবে না। তাদের কোনো স্মৃতিচিহ্ন পৃথিবীতে থাকবে না।

সম্প্রসারিত ভাব: মানুষের রয়েছে দুটি জগৎ। একটি আত্মস্বার্থের ক্ষুদ্র পৃথিবী, অন্যটি সমগ্র মানবসমাজকে নিয়ে তার বৃহৎ বিশ্ব। এই দুই জগতে দুই ধরনের মানুষের বসবাস– অত্মস্বার্থমগ্ন, আত্মসুখপরায়ণ মানুষ ও আত্মসুখ বিসর্জন দেওয়া স্বার্থহীন মহৎ মনের মানুষ। স্বার্থপর, আত্মসুখপরায়ণ মানুষ কেবল ব্যক্তিগত চিন্তায় মগ্ন থাকে। সে ভোগসামগ্রী যত পায় তত তার পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা বেড়ে যায়। তার ব্যক্তিগত জীবনজুড়ে অর্থ–প্রতিপত্তির পাহাড়, সে আরও চায় তার জীবন যেন সুখ–শান্তি, আরাম দিয়ে ভরে থাকে। কিন্তু এই ধারণায় কেউ কখনো জীবনে সুখী হতে পারে না। বিশ্ব কল্যাণের সাধনায় আত্মনিয়োগ করলে মানুষ অনেক দূর সফলতার সাথে এগোতে পারে। তাই ব্যক্তি নিজের স্বার্থে যা করে তা নিরর্থক। কালের স্রোতে তা একদিন বিলীন হয়ে পড়ে। আর মহৎকর্ম দ্বারা মানুষ বেঁচে থাকে চিরকাল। মহৎকর্ম মানুষকে অমরত্ব দান করে। সক্রেটিস, এরিস্টটল মৃত্যুবরণ করেছেন কয়েক হাজার বছর পূর্বে; মহাকবি আলাওল, চন্ডীদাস, বিদ্যাপতির মৃত্যু অতিক্রান্ত করেছে কয়েক শতাব্দী। মাইকেল মধুসূদন দত্তের মৃত্যু অতিক্রম করেছে শতবর্ষ। কিন্তু আমরা তাদেরকে আজও শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করি, শুধু তাঁদের কর্মের জন্য। যারা কেবল ভোগের মধ্যে সুখ খোঁজে, তারা কোনোদিনই সুখী হতে পারে না। আত্মস্বার্থে বিভোর হয়ে মানুষ নিজেকে পৃথিবীর প্রবাহ থেকে বিচ্ছিন্ন করে অন্ধকার জগতে নিক্ষিপ্ত করছে। সত্যিকারের মহৎ মনের মানুষ নিজেকে কেন্দ্রবিন্দুতে আবদ্ধ রাখে না। মহৎকর্ম ও ত্যাগের মাঝে সে প্রকৃত সুখ খুঁজে পায়। মানুষের অনেক ধন–সম্পদ, টাকা–পয়সা, মান থাকতে পারে কিন্তু সেগুলো যদি সব নিজে ভোগ করে তবে তাকে কেউ মনে রাখে না।

মন্তব্য: মানুষের মনের মন্দিরে চিরকাল বেঁচে থাকতে হলে মানুষকে ভালোবাসতে হবে, মানুষের সেবা করতে হবে, মানুষের জন্য কাজ করতে হবে। আত্মকেন্দ্রিক মানুষ সমাজের বোঝা, দেশ ও জাতির কলঙ্ক।